গণিত শিক্ষণ

শ্রীলতিকা দাশগুপ্ত, এম. এ. (লণ্ডন), ডিপ্. এড্. (লণ্ডন),
এম. এ., বি. টি. (ঢাকা),
অধ্যাপিকা—ইন্স্টিটিউট অব্ এডুকেশন ফর্ উইমেন
(কলিকাতা),
পূর্বতন অধ্যাপিকা—ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ

প্রকাশক :
শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি সিটি বুক কোম্পানি
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৭

বিষয় সূচী

গণিত শিক্ষণ

প্রথম অধ্যায়

গণিত শিখবার দরকার কি ?

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে, অধিকাংশ লোকেরই তো জীবনে গণিতের বেশী প্রয়োজন হয় না। অতি সামান্য গণিত, অঙ্কশাস্ত্রের অতি সাধারণ কয়েকটি তথ্য হয়তো জীবনে কিছু কিছু কাজে লাগে। তবে এই গণিত সকলের শেখার প্রয়োজন কি ?

প্রত্যক্ষভাবে গণিতের ব্যবহার আমরা কমই দেখতে পাই একথা ঠিক। কিন্তু পরোক্ষভাবে গণিত প্রত্যেকেরই প্রয়োজনে আসে। Hogben বলেছেন যে, এই যান্ত্রিক যুগের মানুষ হচ্ছে একটি গণনার জীব ; সংখ্যা ও গণনার ভিতরেই আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি ; রেলের সময়তালিকা, বেকারসংখ্যা, জরিমানা, নানা রকমারি কর, যুদ্ধকালীন ঋণ, নানারকম খেলার নম্বর, ক্যালোরী, শিশুদের ওজন, উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, মোটরের রেকর্ড, সাইকেলের রেকর্ড, বিমানের রেকর্ড, ব্যাঙ্কের হার, সুদ, মৃত্যুহার, জন্মহার, কেনার দাম, বেচার দাম ইত্যাদি নিয়েই আমাদের জীবন কাটছে। প্রতিদিনকার ব্যবহারের প্রত্যেকটি যন্ত্রের পিছনে রয়েছে কত সূক্ষ্ম গণনা—যে গণনার একটু ভুলভ্রান্তি হলে সমস্ত যন্ত্রটি যায় বন্ধ হয়ে। একটি ব্রিজের উপর দিয়ে যখন হেঁটে যাওয়া যায় বা কোনও রকম যানবাহনে বসে যখন যাতায়াত করা যায়—আমাদের নিরাপত্তা নির্ভর করে অঙ্কের গণনার উপর। কোনও রোগের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হলে তার মূলেই প্রয়োজন হয় গণনা। অর্থশাস্ত্র, নৌশাস্ত্র, স্থাপত্য, জরিপ, ইতিহাস, ভূগোল এই সবই নির্ভর করে গণিতের উপর। ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানি তাদের প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে পরিসংখ্যানের নিয়মে যার ভিত্তিই হচ্ছে গণিত। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় বা বিলাসিতার জিনিস তৈরি করতে প্রয়োজন হয় যন্ত্রশিল্পের। যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান তখনই যথার্থ হয় যখন তার ভিত্তি হয় গণিতের উপর। এই বিদ্যুৎ, লৌহ ও বাষ্পের যুগে যে দিকেই

তাকান যায়—দেখা যায় গণিতই সব ফলাফলের যাথার্থ নির্ধারণ করছে। বিজ্ঞান কাজ আরম্ভ করে গুণজাত সম্পর্ক নিয়ে—কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয় তখনই, যখন তার ভিতর আনা হয় পরিমাণের কথা এবং পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে গণিতের কথা। গতির বিধি ও মাধ্যাকর্ষণের বিধির আবিষ্কারের ফলে নভোমণ্ডলের সমস্যা গিয়ে দাঁড়াল গণিতের সমস্যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি যে সব প্রকৃত বিজ্ঞান রয়েছে তাদের সবারই মূলে রয়েছে গণিত। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, বর্তমান সভ্যতার মূলেই রয়েছে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের মূলেই রয়েছে গণিত। আমাদের জীবনের চিন্তাধারা ভাবধারা সবই জড়িত রয়েছে বিজ্ঞানের সঙ্গে—যে বিজ্ঞানের যাথার্থ নির্ধারণ করে দেয় গণিত।

শুধু তাই নয়, গণিতের চিন্তাধারা এমন যে, প্রত্যেক মানুষের মনেই সে চিন্তাধারা রয়েছে। সেই আদিম যুগের মানুষের মনেও এই চিন্তাধারা ছিল, তবে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারার ক্রমশঃ উন্নতি হয়েছে। এটাই আশ্চর্য যে, এই চিন্তাধারার ফলে যা গণিত দাঁড়ায় তা সর্বদেশে ও সর্বকালেই এক। সেই আদিম যুগের মানুষও আমাদের মতই ঠিক করেছিল যে, ২ আর ৩এ পাঁচ হয়। এক দেশ যখন ঠিক করেছে যে ৪ × ৫ = ২০ হয়, বহু বহু বৎসর পরে অন্য এক দেশও আবিষ্কার কোরলো যে ৪ × ৫ = ২০ই হয়, আর কিছু হয় না। হিন্দুরা হয়তো বহু পূর্বে যা আবিষ্কার করেছেন ইয়োরোপিয়ানরা তার বহু পরে সেই জিনিসই আবিষ্কার করেছেন। এতেই জানা যায় যে গণিতের চিন্তাধারার রূপ সকলের ভিতরই একই রকম এবং এই চিন্তাধারা সকলের ভিতরই অল্পবিস্তর বর্তমান।

শুধু মানুষের অন্তরেই যে গণিত বর্তমান তা নয়। প্রকৃতির রাজ্যেও রয়েছে গণিত। যদি দূরবীন দিয়ে সৌর জগতের কোনও নীহারিকার দিকে তাকান যায় তবে দেখা যায় তার আকৃতি হচ্ছে spiral অর্থাৎ কুণ্ডলীর আকার, কতকটা ঘূর্ণাবর্তের মত। এই বক্ররেখাই মানুষ কিছুদিন আগে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে। সৌর জগতের গ্রহ-নক্ষত্র সব যে পথে চলেছে তা হচ্ছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ডিম্বাকৃতি রূপ (elliptic) আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরবলয় স্বরূপ (parabolic)। সুতরাং দেখা যায় যে ভগবানের রচিত জগতে গণিতের বিধির অস্তিত্ব প্রথম থেকেই ছিল। গণিতের কতকগুলি সত্য চিরন্তন, যার আদিও নেই অন্তও নেই। গণিতের ইতিহাস আর কিছুই নয়, এই সব

বিধিগুলিকে মানুষ যে ভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছে তারই একটা ইতিবৃত্ত। প্লেটো গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতির গতিবিধি লক্ষ্য করে বলেছেন যে, "God eternally geometrizes" অর্থাৎ জ্যামিতি বিশ্বস্রষ্টার শাশ্বত ব্যবস্থা। দিগন্তর ও মহাব্যোমের ধর্ম সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন যে, এ ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন, এ সৃষ্ট নয়।

পৃথিবীতে যখন জীবন শুরু হোলো তখন গণিতের ইতিহাসে আর এক আকর্ষণীয় অধ্যায় আমরা দেখি। মনুষ্যজীবনের আগেও ছিল উদ্ভিদজীবন। এই উদ্ভিদজগতে বৃক্ষের নির্দিষ্ট অংশসমূহের সু-সমাবেশ, পুষ্পের দল, পুংকেশর প্রভৃতির সংখ্যাগত সম্বন্ধের সঙ্গতি, সৌষ্ঠব, সমমাত্রা—এ সব থেকে দেখা যায় যে পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতির আকৃতি ও প্রকৃতিতে রয়েছে একটি ধারা—যা মানুষ সাধারণ নিয়ম বা সূত্রের (formula) ছাঁচে ফেলে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে।

প্রাণিজগতেও দেখা যায় জীবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গণিতের কতকগুলি ধারণার সৃষ্টি আকার নিয়ে, মাপ নিয়ে ও সংখ্যা নিয়ে। নিম্নস্তরের প্রাণীদের ভিতরও দেখা গিয়েছে যে তারা এক রকম গোণাগাঁথা (counting) করে থাকে—যাকে বলা যায় pseudo-counting অর্থাৎ ছদ্মবেশে বা কাল্পনিক গোণাগাঁথা। Magpie নামে এক রকম প্রাণী তারা পাঁচটি জিনিসের দল চেনে। শিম্পাঞ্জী জানে যে, ৪টি থেকে ৫টি বেশী। মাকড়শার জাল বুনন দেখলে মনে হয় যেন সে সুনিয়ন্ত্রিত বহুভুজ ক্ষেত্র (regular polygon) সম্বন্ধে বোঝে। মৌমাছি যখন তার মৌচাকে ষড়কোণ বিশিষ্ট কক্ষগুলি বানায় তখন কি মনে হয় না যে সে গণিতের Laws of maxima ও minima অনুসরণ করছে? পাখীদের বাসা দেখলে মনে হয় যে তারা চেষ্টা করে সুসঙ্গতির (symmetry) ও সৌসামঞ্জস্যের (similarity) জন্য।

মনুষ্যজাতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গণিতের ধারণা দ্রুত এগিয়ে চললো জ্ঞাতসারে। এটা প্রকাশ পেল কলার ভিতর দিয়ে যাকে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর সার্বজনীন ভাষা। কলার ভিতর দিয়ে জ্যামিতির প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হোলো। ব্যবসা, বাণিজ্য, যুদ্ধ, মেষপালকের জীবনের প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে গণিতের উন্নতি হতে লাগলো। ব্যবসার দরুন সংখ্যার উন্নতি হোলো। মরমীবাদের (religious mysticism) ভিতর দিয়ে যা লঙ্ঘন করা

যায় না তা লঙ্ঘন করার চেষ্টায় গণিত অগ্রসর হতে লাগলো। মরমীবাদের সঙ্গে সঙ্গে গণিতের অনেক কিছু বিস্ময় বেরিয়ে এল। মানুষ মাথার উপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল। জীবন মৃত্যু সবই তার কাছে বিস্ময়কর, সবই রহস্যময়। চারদিকে জ্যামিতির আকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য তাকে স্তম্ভিত করে দিল। তিন ও সাত এই সংখ্যাগুলিও তার কাছে রহস্যময় বলে মনে হোলো কারণ এই সংখ্যাগুলির ব্যবহার প্রতিদিনের কাজে খুবই কম আসে। এই সংখ্যার রহস্য, জ্যামিতির নানা আকারের রহস্য সে বিশ্বের রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ধরে নিল।

আদিম অধিবাসীদের মনে হোতো যে আকাশের নক্ষত্রের রহস্যের সঙ্গে তাদের অদৃষ্টের রহস্য জড়িত। এই জন্যই ব্যাবিলন দেশের মেষপালকেরা, মরুভূমির পথচারীরা নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতো ও নানারকম জল্পনা-কল্পনা ও পরীক্ষা কোরতো। এর থেকেই চেষ্টা চললো কোণ মাপার—নভোমণ্ডলের সব অদ্ভুত ব্যাপারের হিসাব রাখার চেষ্টার।

সুতরাং আকাশে, বাতাসে, প্রকৃতির রাজ্যে, ধরণীর বুকের উপর সব তাতেই রয়েছে গণিতের খেলা। গণিতের ধারা না জানলে, না বুঝলে এ বিশ্বের রহস্য সবই থেকে যাবে মূলতঃ অস্পষ্ট।

এসব ছাড়াও গণিতের চিন্তাধারার মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যা আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে বিশেষ প্রয়োজন হয়। একটি ধারা হচ্ছে কোনও একটি পরিস্থিতিতে পড়লে সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝে নেওয়া। সত্যিকারের ব্যাপারগুলো ধরে ফেলা। অনেকের মতে গণিতের যুক্তি হচ্ছে অকাট্য যুক্তি—যা দেওয়া থাকে তার থেকে ফল ও সিদ্ধান্ত আবশ্যিক ও নিশ্চিত ভাবে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ যুক্তিই করতে হয় অনিশ্চিতের উপর ভিত্তি করে। সেজন্য অনেকে বলেন গণিতের যুক্তিধারা কি আমাদের দৈনন্দিন যুক্তিধারাকে কোনও সাহায্য করে?

গণিতের নিশ্চিত যুক্তিধারা আমাদের অনিশ্চিত যুক্তিধারাকে সাহায্য করে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া গণিতের ভিতরও অনিশ্চিত যুক্তিধারার যথেষ্ট স্থান রয়েছে। যদি ঠিক ভাবে গণিত শেখান যায়, যদি শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের পর্যায়ে ফেলা যায় অর্থাৎ পরলব্ধ তৈরী জ্ঞান আহরণ না করে নিজের চেষ্টায় তাকে আবিষ্কারক হিসাবে জ্ঞান লাভ করতে দেওয়া যায় তবে তাতে অনিশ্চিত

যুক্তি অনেকই আসবে সন্দেহ নেই। সুতরাং গণিতের ভিতর দিয়ে জীবনের অনিশ্চিত যুক্তির জন্য শিক্ষা নিশ্চয়ই হতে পারে।

অনেকে বলেন যে গণিতজ্ঞ যাঁরা তাঁরা যেন জীবনের সব সমস্যাই বীজগণিতের সূত্রের ছাঁচে ঢেলে সমাধান করতে চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে অপ্রত্যাশিত ভাবে এঁরা যখন কোনও পরিস্থিতিতে পড়েন, তখন বিব্রত হয়ে পড়েন। এর জন্য গণিত বিষয়টিকে দায়ী করলে অর্থাৎ গণিত বিষয়টিরই ইহা একটি অন্তর্নিহিত দোষ বললে ভুল করা হবে। আসল কথা গণিত বিষয়টিতে এঁরা এমন লিপ্ত হয়ে যান যে বাহিরের কার্যকরী জগতের বিশেষ কিছু খোঁজ রাখেন না। গণিত বিষয়টি খুব বেশী চিন্তা সাপেক্ষ। শুধু গণিত বলে নয়, যে কোনও বিষয় নিয়ে যাঁরা গভীর চিন্তা করেন, তাঁরা সেই চিন্তায় এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে বাইরের জগতের সঙ্গে বেশী সম্পর্ক রাখতে সময় পান না। সেই জন্য নূতন কোনও পরিস্থিতিতে পড়লে নানা সমস্যা তাঁদের উপস্থিত হয়।

গণিতের দ্বারা কতকগুলি বিশেষ উপকার সাধিত হয়—যেমন স্মৃতিশক্তির চর্চা থেকে এখানে যুক্তির চর্চা বেশী করা হয়। সেজন্য তথ্য সংগ্রহের থেকে ক্ষমতা সঞ্চয় করা হয় বেশী। যে বেশী গণিতের তথ্য জানে সেই যে বড় গণিতজ্ঞ তা নয়—যে বুদ্ধি করে বিচারশক্তি খাটিয়ে গণিত ব্যবহার করে সে-ই বড় গণিতজ্ঞ। যুক্তির ক্ষমতা বাড়াতে হলে সরল যুক্তির থেকে ধীরে ধীরে জটিল যুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। গণিতে এই ভাবে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা যথেষ্ট আছে।

সঠিক চিন্তা ও সঠিক ভাবে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা বাড়াতে গণিত সাহায্য করে। গণিতের যুক্তিতে মৌলিকতা থাকা প্রয়োজন। অন্যের ধারণা পড়ে বা শুনে তা পুনরুক্তি করলেই গণিত হয় না। মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা গণিত বাড়িয়ে দেয়। গণিত মনোনিবেশের ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়। কারণ গণিতে মনোনিবেশের ক্ষমতা খুব বেশী প্রয়োজন। পূর্ণ মনোযোগ না দিলে গণিত বোঝা বা করা সম্ভব হয় না। গণিতে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় সেজন্য কল্পনা-শক্তির চর্চাও বেশী হয়। গঠনমূলক কল্পনাশক্তি বাড়াতে গণিত সত্যিই সাহায্য করে।

গণিতে আত্মবিশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজন। ঠিক ভাবে শেখালে নিজের চেষ্টায় নিজে গণিত শিখবার আগ্রহ আসে। গণিত চরিত্রগঠনেও সাহায্য করে। কারণ ধারাবাহিক ভাবে বেশ নিয়মানুসারে গোছানো ভাবে গণিতের কাজ

করতে হয়। যখনই কোনও কঠিন সমস্যার সমাধান করতে হয় তখন ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করতে হয়।

অবশ্য শিক্ষায় সংক্রামতা (transfer of training) সম্বন্ধে এখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। গণিতের যুক্তি চর্চা যে অন্যান্য বিষয়ের যুক্তিতে সাহায্য করে সে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই গণিতকে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূত করা একান্ত প্রয়োজন বলেই ধরে নেওয়া হোতো। নানারকম পরীক্ষার ফলে অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে এক বিষয়ে শিক্ষা অন্য বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে তা সত্য, কিন্তু সে প্রভাব যে খুব বেশী বা সব সময়ই বিস্তারিত হয় তা নয়। আবার সম্প্রতি পরীক্ষার ফলে অনেকে এই সিদ্ধান্তেও এসেছেন যে শিক্ষা অর্থহীন হলে সংক্রামতা বেশী হয় না তা সত্য, কিন্তু অর্থপূর্ণ শিক্ষায় সংক্রামতার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। অন্ধভাবে অর্থ না বুঝে মুখস্থ করে যে শিক্ষা সে তো প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাই নয়। সুতরাং সে শিক্ষায় সংক্রামতার প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়টি বোঝার ওপর সংক্রামতা নির্ভর করে। গণিতের ধারা যে চিন্তা করে বুঝতে চেষ্টা না করে সে তো গণিতই বোঝে না। চিন্তা করে বোঝা অর্থ হচ্ছে যে, যে নীতি অনুসরণ করে সে গণিত শিক্ষায় সফলতা লাভ করেছে সেই নীতির পূর্ণ অর্থ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা। জ্ঞাতসারে সেই নীতি যদি সে অন্য বিষয় শিক্ষায় বা ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানে নিয়োগ করে, তবে সেই ক্ষেত্রেও সফলতা লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে। পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, তুলনা, কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়, সমন্বয় ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়াগুলির নানাবিধ বিষয় শিক্ষায় এবং ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন হয়। গণিতের যুক্তিধারায় বিশেষভাবে এই ক্রিয়াগুলিরই চর্চা হয়। সুতরাং অর্থ বুঝে যদি গণিতের চর্চা করা যায় তবে সেই চর্চার ফলে অন্য বিষয় শিক্ষার বা সমস্যা সমাধানের যে সুবিধা হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং গণিত যদিও সকলের সমান প্রয়োজনে বা কাজে লাগে না—যারা তথ্যানুসন্ধানে ব্যস্ত তাদেরই বেশী লাগে, তথাপি কৃষ্টির দিক দিয়েও প্রত্যেকেরই গণিত শেখা প্রয়োজন। কারণ গণিত ব্যতীত এই বিশ্বের রহস্য, প্রকৃতির রহস্য, বিজ্ঞানের রহস্য কিছুই উপলব্ধি করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণিতে ভয় কিসের ?

জনসাধারণের অনেকের বিশ্বাস যে অনেক ছেলেমেয়ে আছে যাদের অঙ্ক কষবার ক্ষমতাই নেই। অঙ্ক বুঝবার ক্ষমতা হচ্ছে একটা বিশেষ জন্মগত ক্ষমতা, এর জন্য মনের বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা থাকা দরকার। কিন্তু যাঁরা এই বিষয়ে পরীক্ষামূলক কাজ করেছেন এবং যাঁদের সবরকম ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শিখাবার অভিজ্ঞতা আছে—তাঁরা বলেন যে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্য্যায়ের অঙ্ক কষবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। যে কোনও স্বাভাবিক মানুষের সাধারণ বুদ্ধি থাকলেই প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ের অঙ্ক কষে যেতে পারে। স্কুলে যে অঙ্ক শেখান হয় সে অঙ্কের যুক্তি যে কোনও স্বাভাবিক মানুষের বুঝবার ক্ষমতা থাকে। স্কুলের অঙ্কের সহজ যুক্তি যে বুঝতে না পারে তার পক্ষে জীবনপথের অন্য যে কোনও যুক্তি ধরতে পারা সহজ নয়। সে চিকিৎসাবিদ্ হোক্, ঐতিহাসিক, আইনজীবী, ভাষাবিদ্ বা অন্য যে কোনও কাজই সে করুক, স্কুল-গণিতের সহজ যুক্তি যদি সে না বুঝতে পারে তবে এ সবের কোনও যুক্তিই তার বোঝা সম্ভব হবে না। একটি সরল সমীকরণ থেকে অজানা জিনিসটিকে বার করে ফেলতে যে না পারে সে কি করে একজন চিকিৎসাবিদ্ হয়ে একটি রোগকে বিশ্লেষণ করে তার জটিল অস্পষ্ট লক্ষণগুলি বার করতে পারবে ? যদি সে জ্যামিতির সামান্য সরল উপপাদ্য বিশ্লেষণ করতে না পারে তবে সে কি করে আইনজীবী হয়ে দুরূহ জটিল মামলা বিশ্লেষণ করবে ? যদি সে বীজগণিতের একটি রাশির উপর সহগের (coefficient) কি প্রভাব তা না বোঝে তবে সে ঐতিহাসিক হয়ে কি করে বুঝবে যে হিটলারের প্রভাব কি ভাবে বিশ্বের উপর কাজ করেছে? যদি সে একটি সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নকে গণিতের ভাষায় গণিতের সঙ্কেতে প্রকাশ করতে না পারে তবে সে কেমন করে ভাষাবিদ্ হয়ে একটি লেখাকে ভাষান্তরিত করবে ? Laisant বলেছেন যে একটি শিশুর অঙ্ক কষবার সম্ভাব্য ক্ষমতা আছে কি-না তা জিজ্ঞাসা করা যা একটি শিশুর লেখা ও পড়ার ক্ষমতা আছে কি-না তা জিজ্ঞাসা করাও তাই।

Dewey বলেছেন যে যত লোক অঙ্ক পছন্দ করেন না অথবা মনে করেন

যে অঙ্ক কষবার ক্ষমতাই তাঁদের নেই, এই রকম ১০ ভাগের ৯ ভাগ লোকের এই বীতরাগের কারণ হচ্ছে শিক্ষাপদ্ধতির দোষ। যে ভাবে গণিত শেখান হয় তাতে মনের স্বাভাবিক গতি চলার পথে বাধা পায়। তাদের অবাধ স্বতঃস্ফূর্ত গতির পরিবর্তে জোর করে যন্ত্রচালিতের মত চলতে শেখান হয়। তার সঙ্গে না থাকে প্রাণবন্ত আগ্রহ, না থাকে উৎসাহ। ফলে না বাড়ে তাদের সত্যিকারের জ্ঞান, না বাড়ে তাদের চিন্তাশক্তি।

সাধারণতঃ কোনও বিষয় শিখতে হলে দুইভাবে শেখা যায়—এক হচ্ছে মুখস্থ করে অর্থাৎ বার বার একটা জিনিস পড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়টি মনে গেঁথে যায় ও পুনরুক্তি করতে পারা যায়। আর এক উপায় হচ্ছে বার বার পড়ে বিষয়টি পুনরুক্তি করার চেষ্টা না করে বিষয়টি সম্বন্ধে বেশী চিন্তা করা। জানা জিনিস থেকে অজানায় যাওয়া, নিজের চেষ্টায় সমস্যা সমাধান করা ও যুক্তি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা। এতে হয়তো শিক্ষার্থী অগ্রসর হবে ধীরে ধীরে কিন্তু যা সে বুঝবে তা সত্যিই বুঝবে এবং মনের উপর চিরকালের মতনই ছাপ পড়বে।

স্কুলে সাধারণতঃ যে ভাবে গণিত পড়ান হয় তাতে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করতেই উৎসাহিত হয় বেশী। যুক্তির ধার দিয়ে বেশী ঘেঁষতে চায় না। একটি নিয়ম শেখান হয় ও দিনে সেই নিয়মানুযায়ী ৫।৬টি অঙ্ক কষান হয়। কয়টি অঙ্ক ছাত্র করেছে তার উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না কেন তারা অঙ্ক শিখছে, অথবা অঙ্ক শিখবার কোনও রকম প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না। যারা একটু বুদ্ধিমান তারা যেন ধাঁধার উত্তর বার করছে এই ধরনের আনন্দ পায় ও অঙ্ক কষে যায়। কিন্তু যারা তত বুদ্ধিমান নয় তারা মোটেই উৎসাহ পায় না। গণিত দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণিতে আগ্রহ জন্মাতে হ'লে দৈনন্দিন জীবনের ভিতর দিয়েই অঙ্ক শেখাতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাহলে বুঝবে যে গণিত যন্ত্রচালনার মত কাজ নয় অথবা কতকগুলি বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে, অক্ষর নিয়ে, রেখা নিয়ে অর্থহীন খেলা নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সত্যিই এর প্রয়োজন আছে। ছোট ছেলেমেয়েরা কাজ ভালবাসে। কাজের ভিতর দিয়ে শেখালে তারা আগ্রহ করে গণিত শিখবে। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ও কাজই হচ্ছে গণিতে আগ্রহ সঞ্চার করার প্রধান উপায়।

Individual difference

যে কোনও বিষয় শেখাতে গেলে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হয়। কিন্তু গণিতে ব্যক্তিগত পার্থক্য বেশী দেখা যায়। একটি শ্রেণীকে ক্ষমতা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) অগ্রসর দল, (২) মাঝারি দল, (৩) অনগ্রসর দল। শিক্ষক একটি নিয়ম শেখালেন, অগ্রসর দল হয়তো একবারেই বুঝে নিল। মাঝারি দলের কতক হয়তো বুঝলো, বাকী যারা তারা হয়তো কিছুই বুঝলো না। শিক্ষক যদি বিবেকসম্পন্ন হন তবে হয়তো তিনি আর একদিন সেই নিয়মটি শেখাবার চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় দিন হয়তো আরও কিছু শিক্ষার্থী নিয়মটি বুঝলো, কিন্তু বাকী কয়েকজন বুঝলোই না। কিন্তু শিক্ষক আর তাদের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর পাঠ্যসূচী শেষ করতে হবে। কাজেই তিনি আর একটি নূতন নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। ফলে প্রথম নিয়মটিই যারা আয়ত্ত করতে পারেনি এ নিয়মটি তাদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে রইল। তাদের ভিতর কি শিখবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না ? ছিল ; কিন্তু সব সম্ভাবনাকেই অঙ্কুরে বিনাশ করা হোলো। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাঠ্যক্রম করা হয়েছে শিশুর উন্নতির জন্য। পাঠ্যক্রমের জন্য শিশু নয়। ছাত্রদের ক্ষমতার সত্যিকারের উপযোগী করতে হলে আমাদের পাঠ্যসূচী প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হবে। যদিও ব্যক্তিগত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় তথাপি দলগত ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীকে তিন ভাগে ভাগ করে তাদের উন্নতির ক্রমানুসারে অঙ্ক দিতে হবে।

গণিতের ধারণা করা তখনই সহজ হয় যখন ছাত্রের আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তা শেখান হয়। ছাত্র যতই দুর্বলমেধা হয় ততই তাকে মূর্ত জিনিসের উপর ভিত্তি করে শেখানোর প্রয়োজন হয়।

আসল কথা হচ্ছে কি ভাবে আমরা আরম্ভ করি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে গোড়াই হচ্ছে আসল। গোড়া যদি কাঁচা থেকে যায় তবে পরবর্তী জীবনে তা শুধরানো যায় না। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষার শেষে আমরা জোর দেব না যে কতটা সে শিখেছে তার উপর। কিন্তু তাদের ভিতর আগ্রহ সঞ্চার করতে পারা গিয়েছে কি-না সেটাই হচ্ছে আসল কথা। একবার যদি আগ্রহ সঞ্চার করে দিতে পারা যায় তবে যদিও সে প্রথমে অগ্রসর হবে ধীরে ধীরে, কিন্তু পরে সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলবে।

গণিত যে শিক্ষার্থীরাপারে না সেজন্য বিদ্যালয়ও অনেক সময় দায়ী। কারণ অনেক বিদ্যালয়েই পরীক্ষার ফলের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়। পাঠ্য-ক্রমের পাঠ্যের ভিড়ে প্রাণ অন্ত হবার যোগাড়। তার ওপর অস্বাভাবিক ভাবে পড়ানোর চেষ্টা চলে। যারা হয়তো একেবারেই অনুপযুক্ত তাদের প্রমোশন দিয়ে উপরে উঠানো হোলো, না হলে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কমে যায়। বাইরের সকলকে একটা চমক লাগানো হচ্ছে উদ্দেশ্য। পরীক্ষার উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই মনের খোরাক যা গ্রহণ করে তা হজম করে উঠতে পারে না। এতগুলি বিষয় একসঙ্গে পড়তে হয়। সবতাতেই তাড়া-হুড়ো চলে। কোনটার ছাপই মনে গেঁথে পড়ে না। কোনও বিষয়ে একটু ভাববার বা স্থির হয়ে চিন্তা করবার সময় নেই। নানা বিষয় চাপানো হয় মনের উপর, কিন্তু ভিতর থেকে যায় ফাঁপা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ফলে হয় বাঁধাধরা মানসিক বদহজম অর্থাৎ মনের খাদ্য হজম করবার শক্তির অভাব। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা গণিতে চিন্তার প্রয়োজন এবং তার জন্য সময়ের প্রয়োজন বেশী। গণিতে তাড়াহুড়ো করলে গণিত বোঝা ও গ্রহণ করা কষ্টকর।

গণিতশিক্ষা কার্যকরী করতে হলে আর একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে—সে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মনে প্রয়োজন-বোধ। শিক্ষা তখনই সহজ হয় যখন শিক্ষার্থীর মনে থাকে শিক্ষার জন্য প্রয়োজন-বোধ। মনের প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতেই গণিতের সৃষ্টি। গণিতের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে এই প্রয়োজনের তাগিদ তিন প্রকারের, যথা—(১) ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ—জীবনযাত্রার পথে প্রকৃতির রাজ্য থেকে যে সব বাধা-বিপত্তি এসে পড়ে সে সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে গিয়ে গণিতের সৃষ্টি। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ফলেই উদয় হোলো সংখ্যা, পরিমাণ ও দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা। আদিম সভ্যতার যুগেই আরম্ভ হয়েছে অঙ্ক ও জ্যামিতি। রাখাল গরু-ছাগলের হিসাব রাখবার জন্য তার ছড়িতে দাগ কেটে রাখতো। ব্যবসায়ী যখন প্রয়োজন বোধ কোরলো আঙুলের প্রতীক দিয়ে ১০,০০০ পর্যন্ত যে কোনও সংখ্যা প্রকাশ করবার উপায় বার কোরলো। ঘরবাড়ী তৈরি করতে গিয়ে মিস্ত্রী প্রায় পায়ের সমান করে একটি ছড়ি তৈরি করে নিল সব মাপবার জন্য (এর থেকেই চলে এল ফুটরুল কথাটি)। প্রাচীন মিসরে গাড়ির চাকা তৈরি করতে ৬টি সমান কাঠের বা লোহার ছড়ি চাকার ভিতরে লাগিয়ে নেওয়া হোলো চাকা শক্ত করবার জন্য এবং

অজ্ঞাতে এ ধারণা তখনই এসে গেল যে বৃত্তের পরিধি ব্যাসার্ধের ছয় গুণ। শিল্পী, ভৌগোলিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পৃথিবীর উপর যে জিনিস রয়েছে তার ছবি আঁকতে গিয়ে অনুরূপ ও সদৃশ চিত্রের বিশেষত্ব আবিষ্কার করলেন। এই ভাবে অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায় যে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে গণিতের সৃষ্টি ও উন্নতি হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় তাগিদ হচ্ছে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনের তাগিদ। প্রকৃতির তথ্য ও সামাজিক তথ্য বুঝবার ও ধারাবাহিক ভাবে পদ্ধতিবদ্ধ করার চেষ্টায় গণিতের সৃষ্টি। মনের এই তাগিদের জন্যই গত তিন-চার হাজার বছরে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের জন্য এবং গত তিন-চার শত বৎসরের ভিতর বিজ্ঞানের জন্য গণিতের এত উন্নতি হয়েছে।

(৩) ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ বা বিজ্ঞানের প্রয়োজনের তাগিদ হচ্ছে বাইরের জিনিস। এ তাগিদ আসে বাইরে থেকে। সৌন্দর্য-পিপাসার তাগিদও গণিতের উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য করেছে কিন্তু এ তাগিদ আসে মনের ভিতর থেকে। নিজের সৃষ্টিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার আগ্রহে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় আর সেই নিয়মের মূলে রয়েছে গণিত। চিত্রকর, গায়ক, ভাস্কর, স্থপতিবিদ্যায় নিপুণ প্রভৃতি শিল্পীগণ গণিতের উন্নতিতে সাহায্য করেছেন। গ্রীকদের ভিতরে দেখা যায় এই সৌন্দর্য-পিপাসার তাড়নার ফলেই গণিতের বিশেষ উন্নতি। ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদও যথেষ্ট ছিল। আর্কিমিডিস গণিতজ্ঞও ছিলেন এবং ব্যবহারিক জীবনে যন্ত্রনির্মাণকারীও ছিলেন। গণিতজ্ঞ Helmholtzএর জীবনীতে দেখা যায় যে ব্যবহারিক, বৈজ্ঞানিক ও সৌন্দর্য-পিপাসা এই সব রকম তাগিদই তাঁর ভিতরে ছিল। তিনি বলেন প্রথমে এই বিষয়টিতে তিনি একটা তাগিদ অনুভব করেন কিন্তু ক্রমশঃ সেই তাগিদ থেকে তিনি একটা তীব্র আবেগ বোধ করতে লাগলেন। প্রথম তাগিদে তিনি বোধ করতেন যে সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে ও তার জন্য পৃথিবীকে বুঝতে হবে। যত রকম ব্যাপার জগতে রয়েছে তাদের কারণ খুঁজে বার করবার জন্য একটা তাড়না তিনি অনুভব করতেন এবং যখনই কোনও সমস্যা সমাধানের কাছে প্রায় এসে পৌঁছেচেন—তখনই তাঁর মনে হয়েছে যে, এখানেই নয়, আরও অনেক আছে। এইরূপ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাতে গণিতের অনেক উন্নতি হয়েছে।

গণিতশিক্ষার প্রসঙ্গে এসব উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা বুঝতে হবে যে গণিত বিষয়টির সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই হয়েছে। শিক্ষক বা শিক্ষার্থী এটা যেন না মনে করেন যে গণিত হচ্ছে মানুষেরই তৈরী কতকগুলি অবাস্তব জিনিস,—এর সৃষ্টি হচ্ছে রহস্যময় এবং সেজন্য খুব কম মানুষই এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। গণিতের সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি তাগিদ মেটাতে। গণিতের জ্ঞান যেভাবে ধীরে ধীরে মানবজাতির মনে প্রসারলাভ করেছে—কিণ্ডারগার্টেন থেকে আরম্ভ করে স্কুল-কলেজ পর্যন্ত কতকটা সেইভাবেই গণিতের জ্ঞান ধীরে ধীরে ব্যক্তি-বিশেষের মনেও প্রসারলাভ করে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে প্রয়োজনের তাগিদে যখনই শিক্ষার্থীরা গণিতের কোনও রকম জ্ঞানের জন্য পিপাসু হবে তখনই তাদের সে জ্ঞান দিয়ে সে তাগিদ মেটাতে হবে। এ প্রয়োজনের তাগিদ ব্যবহারিক জীবনের তাগিদ হতে পারে, সেজন্য মাপা, কাঠের কাজ, শিল্প ইত্যাদির ভিতর দিয়ে শেখান যেতে পারে। এ তাগিদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পিপাসায় আসতে পারে, তখন নানারকম যান্ত্রিক বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদির ভিতর দিয়ে শেখান যেতে পারে—আবার এটা কলা সম্বন্ধীয় তাগিদ-বোধ থেকে হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে Pascalএর কথা—বারো বছরের ছেলে টালির ছাদের উপর বসে কাঠকয়লা দিয়ে এঁকে এঁকে এক সমগ্র জ্যামিতির সৃষ্টি করলো। গণনায় বিখ্যাত Bidder যদিও পরে এঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন—অনেক ছোট বয়সেই সংখ্যার নানাপ্রকার বিশেষত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। কাজেই শিক্ষার্থীর মনে একটা তীব্র প্রয়োজন-বোধ থাকা একান্তই দরকার যদি নাকি গণিত বিষয়টিতে আমরা আগ্রহ সঞ্চার করতে চাই।

সুতরাং গণিতশিক্ষাকে যদি আমরা কার্যকরী করতে চাই তবে আমাদের ৩টি বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর আগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ তার ক্ষমতা, তৃতীয়তঃ তার প্রয়োজন-বোধ।

গণিত বিষয়টি নীরস, শুষ্ক এরকম প্রবাদ বহুদিন যাবৎ চলে এসেছে। কিন্তু সত্যিকারের গণিত বিষয়টিরই যে এই দোষ তা নয়। যান্ত্রিকভাবে শেখানোর পদ্ধতির ফলে বিষয়টি সম্বন্ধে এরূপ ধারণা জন্মেছে। গণিতের আসল রূপ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না। এ বিষয়টির আমাদের জীবনে স্থান কোথায়,

ব্যক্তিগত হিসাবে ও সমাজগত হিসাবে এ বিষয়টি কি প্রয়োজনে লাগে, প্রয়োজনের তাগিদে ও কৃষ্টির উৎকর্ষের জন্য কি ভাবে বিষয়টির সৃষ্টি হয়েছে ও ক্রমোন্নতি হয়েছে—সে ইতিহাস উল্লেখ করে যদি শেখানো যায় তবে বিষয়টির প্রকৃত রূপ বোঝা যায় এবং বিষয়টিতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ বোধ না করে থাকতে পারে না!

Hogben বলেছেন যে "Mathematics is the mirror of civilization" অর্থাৎ গণিত হচ্ছে সভ্যতার দর্পণ স্বরূপ। গণিতের প্রত্যেকটি নিয়মের পিছনে তার ইতিহাস রয়েছে। সুতরাং গণিতের থেকে তার ইতিহাস বাদ দিয়ে—তার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তা বাদ দিয়ে, তার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বাদ দিয়ে, দৈনন্দিন জীবনে তার আসল স্থান বাদ দিয়ে, যদি শুধু বিমূর্ত সংখ্যা, অক্ষর ও রেখাচিত্রকেই গণিত বলে শিখান হয় তবে গণিতের আসলরূপ শিক্ষার্থীরা বুঝবে কি করে? শুধু ধাতুরূপ মুখস্থ করার ভিতর দিয়ে সংস্কৃত কাব্যরসের আস্বাদন লাভের চেষ্টা করা যেমন বৃথা, শুধু যান্ত্রিকভাবে বিমূর্ত সংখ্যা, বীজগণিতের অক্ষর ও জ্যামিতির রেখাচিত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে গণিতের আসল রূপ ও স্বাদ উপলব্ধি করার চেষ্টাও সেইরূপই বৃথা। গণিত বিষয়টি একটি অচল জিনিস নয়। এ হচ্ছে সচল, প্রাণবন্ত ও ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। গণিতের নিয়মগুলি মানুষের সৃষ্ট নিয়ম। ভগবানের সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করতে এই নিয়মগুলির সৃষ্টি হয়েছে। এই নিয়মগুলি মানুষের স্বানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণিতের ইতিহাস বাদ দিয়ে, জীবনযাত্রায় গণিতের প্রয়োগ না বুঝিয়ে গণিত শেখাতে গেলে তা অর্থহীন, বিমূর্ত ও ভীতিপ্রদ হবে সন্দেহ নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

গণিতে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাপদ্ধতি

গণিতশিক্ষায় দুই শ্রেণীর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব বেশী দেখা যায়—(১) অনুষঙ্গবাদ (association theory) আর (২) Gestalt-বাদ। অনুষঙ্গবাদের পক্ষ থেকে Thorndike উদ্দীপক (stimulus) ও তার প্রতিক্রিয়া (response)-এর উপর বেশী জোর দিয়েছেন। Thorndikeএর মতে গণিতশিক্ষায় laws of exercise and effect প্রয়োজ্য। অর্থাৎ কিছু শিখতে হলে পুনঃ পুনঃ চর্চার দরকার এবং যাতে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায় তা তাড়াতাড়ি শেখা যায় আর যাতে বিরক্তি বোধ হয় তা শিখতে দেরি লাগে। তাঁর মতে গণিতে drilling বা চর্চার যথেষ্ট প্রয়োজন। প্রত্যেকটি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার সংযোজন আলাদাভাবে করা যায় বলেই অনুষঙ্গবাদীদের মত। Thorndike নিজে কিন্তু বলেন যে গণিতের জ্ঞান হচ্ছে সুসংবদ্ধ ও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

Gestalt-বাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গণিতকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সমগ্রভাবে বুঝবার ও জানবার উপর জোর দেওয়া হোলো। এঁদের মতে শুধু নিছক চর্চাতেই শিক্ষা হয় না—পরিজ্ঞান (insight) ও বুদ্ধিরও দরকার। পদ্ধতির দিক দিয়ে নিছক চর্চা থেকে সমস্যা সমাধানের ভিতর দিয়ে চর্চা এঁরা শ্রেয়ঃ বলে মনে করেন। সমগ্র মানে নয় যে কতকগুলি অংশের সমষ্টি মাত্র। একখণ্ড খালি জমির উপর একটি বাড়ী তৈরি করবার যাবতীয় জিনিস ইট, সুরকি, চুন, বালি ইত্যাদি স্তূপাকারে থাকতে পারে কিন্তু তা হলেই তাকে বাড়ী বলা যায় না যতক্ষণ না সুসংবদ্ধ ভাবে সেগুলি বাড়ীর আকারে সাজান হয়। সেইরূপ গণিতেও এলোমেলো ও বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি সংখ্যা, অক্ষর, রেখাচিত্র নিয়ে নাড়াচাড়া বা চর্চা করলেই গণিত শেখা হয় না। এখানেও সুসংবদ্ধভাবে ব্যবস্থা করে বিষয়টিকে সমগ্রভাবে দেখা দরকার। আর সমস্ত জিনিসটিকে বুঝবার জন্য পরিজ্ঞান (insight) দরকার।

যে ভাবে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে সমগ্রভাবে বিষয়টি দেখার বা বুঝবার সুযোগ শিক্ষার্থী পায় না। জ্যামিতি আরম্ভ করা হয় সূত্র ধরে।

বিন্দু থেকে আরম্ভ করে রেখা, সমতল ক্ষেত্র ও পরে ঘনবস্তু এইভাবে শেখানো হয়। কিন্তু শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনে ঘনবস্তু নিয়েই বেশীর ভাগ নাড়াচাড়া করে, বিন্দু বা রেখার ব্যবহার খুবই কম করে। সেজন্য বিন্দু বা রেখার সূত্র দিয়ে যখন সে জ্যামিতি আরম্ভ করে তখন জ্যামিতি তার কাছে বিমূর্ত মনে হয়। বিষয়টিকে সমগ্রভাবে দেখতে হলে আরম্ভ করা উচিত ঘনবস্তু নিয়ে। পরে ঘনবস্তুর অংশ হিসেবে সমতল, সমতলের অংশ হিসেবে রেখা, ও রেখার অংশ হিসেবে বিন্দু নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে উঠ্তে পারে।

বীজগণিতেও তাই। আরম্ভ করা হয় অনুসংস্থাপন (Substitution) দিয়ে। যেমন $ab+ac+bc$ এই রাশিটিতে যদি $a=2$, $b=3$, $c=4$ বসান হয়, তবে রাশিটি কত হবে? এই ধরনের অঙ্ক দিয়ে বীজগণিত আরম্ভ করা হয়। পরে ধীরে ধীরে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করিয়ে শেষে সমীকরণ (equation) করান হয়। কিন্তু বীজগণিতের মূলকথা বা মেরুদণ্ড হচ্ছে সমীকরণ, সমীকরণের সমাধানের জন্যই বীজগণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি শেখার প্রয়োজন হয়।

সুতরাং বীজগণিতকে সমগ্রভাবে দেখে এর মূল উদ্দেশ্য ধরে শেখাতে গেলে সরল সমীকরণ দিয়ে আরম্ভ করাই উচিত। সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে যখন প্রয়োজন হবে তখন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি শেখান যেতে পারে।

অঙ্কের ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশ্ন সমাধান। প্রশ্ন সমাধানের জন্যই যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি নিয়মগুলি শিখতে হয়। সেজন্য প্রথমে শুধু বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে যোগ-বিয়োগের চর্চা না করে, প্রশ্ন সমাধানের ভিতর দিয়ে সংখ্যার যোগ-বিয়োগ চর্চা করলে ও মূর্ত জিনিস নিয়ে আরম্ভ করে ক্রমশঃ বিমূর্তে গেলে এই চর্চার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী বুঝতে পারে। যেমন ১২+৭=১৯। এই অঙ্কটি যদি এইভাবে আরম্ভ করা যায় যে—

১২জন মেয়ে+৭জন মেয়ে=১৯জন মেয়ে।

১২টি পেন্সিল+৭টি পেন্সিল=১৯টি পেন্সিল।

১২টি বই+৭টি বই=১৯টি বই।

অথবা ১২টি যে কোনও জিনিস+৭টি সেই জিনিস=১৯টি সেই জিনিস

অথবা ১২+৭=১৯

এইভাবে মূর্ত থেকে বিমূর্তে ও প্রশ্নের সমাধান থেকে নিছক চর্চায় গেলে শিক্ষার্থীরা এই চর্চার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝতে পারে। ভগ্নাংশও এভাবে বোঝান যেতে পারে, যেমন—

একটি সন্দেশের ১ পঞ্চমাংশ
\+ একটি সন্দেশের ২ পঞ্চমাংশ
একটি সন্দেশের ৩ পঞ্চমাংশ

এক গজ কাপড়ের ১ পঞ্চমাংশ
\+ এক গজ কাপড়ের ২ পঞ্চমাংশ
এক গজ কাপড়ের ৩ পঞ্চমাংশ

কোনও জিনিসের $\frac{১}{৫}$
\+ কোনও জিনিসের $\frac{২}{৫}$
কোনও জিনিসের $\frac{৩}{৫}$

অথবা $\frac{১}{৫}+\frac{২}{৫}=\frac{৩}{৫}$

এইভাবে ধীরে ধীরে মূর্ত থেকে বিমূর্তে ও প্রশ্ন সমাধান থেকে নিছক চর্চায় গেলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে যে যোগের মূলসূত্র কি পূর্ণ সংখ্যা, কি ভগ্নাংশ, সবক্ষেত্রেই এক এবং জীবনের সমস্যা সমাধানে এর প্রয়োজন আছে।

তবে কি গণিতে চর্চার কোনও স্থান নেই? আছে—চর্চা করা হবে বিষয়টি বুঝবার পর। আগে যা কিছু করানো হবে তার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। যখন নিয়মটি কি ভাবে ও কি উদ্দেশ্যে হয়েছে তা বোঝা হয়ে যাবে তখন মনের ভিতর গেঁথে ফেলবার জন্য এবং উত্তর সব সময় প্রস্তুত রাখবার জন্য চর্চার দরকার। এবং চর্চাও যা করা হবে তা এমনভাবে করতে হবে যেন তার ভিতর একটা ধারাবাহিকতা থাকে ও এক চর্চাতে অঙ্কের অন্যান্য কাজেও সহায়তা পাওয়া যায়।

অঙ্কের অর্থ বোঝা মানে সংখ্যাগুলির ও নিয়মগুলির ঠিক ধারণা ও ঠিক অর্থ বুঝে নেওয়া। সংখ্যাগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা বুঝে নেওয়া। সংখ্যাগুলি বিমূর্ত হলেও এর পিছনে যে মূর্ত সত্য রয়েছে—যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এ সবের অর্থ—এ সবের পিছনে যে সত্য রয়েছে তা বুঝতে হবে। পূর্ণ সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা, কৃত্রিম সংখ্যা, ভগ্নাংশ, দশমিক ভগ্নাংশ এ সবের

প্রত্যেকটিরই সমগ্র সংখ্যারাশির ভিতর কোথায় স্থান এবং দৈনন্দিন জীবনে এদের স্থান কোথায় তা বোঝা দরকার।

গণিতে motivation অর্থাৎ প্রেষণার খুবই দরকার। যখন শিক্ষার্থী নিজের থেকে একটি কাজ করতে চায়, যখন সে সেই কাজের ব্যবহার ও প্রয়োগ বুঝতে পারে, যখন সে দেখে যে ঐ কাজে তার নিজের আগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, যখন সে ঐ কাজের জন্য সত্যিকারের প্রয়োজন অনুভব করে এবং যখন সে নিজের থেকেই কাজটি হাতে নেয় তখনই বলবো যে তার ভিতর প্রেষণা এসেছে অথবা সে motivated হয়েছে।

যে কোনও শিক্ষার জন্যই শিক্ষার্থীর মন সে শিক্ষা পাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে কি-না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। নতুন শিক্ষার জন্য তার পূর্বের জ্ঞান যতটা থাকা দরকার তা আছে কি-না। নতুন জিনিস শিখবার জন্য কোনও আগ্রহ সে বোধ করছে কি-না অথবা নতুন জিনিস শিখবার উদ্দেশ্য বুঝছে কি-না—এসবের উপরই নির্ভর করবে যে সে প্রস্তুত হয়েছে কি-না। অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে গণিতে প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রাখা বেশী প্রয়োজন। গণিতের নিয়ম শেখার জন্য প্রস্তুত না থাকলে সে নিয়ম কখনই শিখতে পারবে না।

পরীক্ষা দ্বারা গণিতের চিন্তাধারা ও যুক্তিধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে এই চিন্তাধারা ও যুক্তিধারার মূলে রয়েছে কয়েকটি উৎপাদক। এই উৎপাদকগুলির ভিতর যেটি মূল বা কেন্দ্রীয় সেটিকে বর্ণনা করতে হলে বলতে হবে যে এ হচ্ছে একটি পরিমাণমূলক চিন্তার ক্ষমতা। সংখ্যা, প্রতীক ও জ্যামিতি সংক্রান্ত বিষয়ের সাধারণ নিয়মগুলিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতা এই চিন্তাধারায় নিহিত রয়েছে। মূর্ত থেকে বিমূর্তে যাওয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র থেকে সাধারণ নিয়ম বার করা, একটি জটিল পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে তৎসংশ্লিষ্ট সব ব্যাপার বার করা, বস্তুর ভিতরে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাদের তদনুযায়ী শ্রেণীভাগ করা, জটিল সমস্যার ভিতর পরস্পর সম্পর্ক ও নির্ভরতা খুঁজে বার করার ক্ষমতা এই চিন্তাধারারই অন্তর্গত।

গণিতের চিন্তাধারা ও যুক্তিধারার ভিতর আরও কতকগুলি প্রক্রিয়া জড়িত, যেমন—(১) শ্রেণী ভাগ করা (classification); (২) শ্রেণীর ধারণা করা ও নিরবচ্ছিন্ন হ্রাসবৃদ্ধিশীল সংখ্যার ধারণা করা (concept of variable); (৩) কোনও একটি নিয়মানুসারে কিছু সাজাবার ক্ষমতা (ordering); (৪) প্রতীক

ব্যবহারের ক্ষমতা (use of symbol); (৫) প্রতিরূপ (imagery) বা মানস দৃষ্টিতে নানারূপ প্রক্রিয়ার ক্ষমতা; (৬) অনুমান করার (inference) ক্ষমতা।

শ্রেণী ভাগ করার ব্যাপার গণিতের প্রত্যেক পর্যায়েই লাগে। সংখ্যাজ্ঞানের আরম্ভে, সমানুপাতিক আকার সব এক পর্যায়ভুক্ত করা ইত্যাদিতে শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন হয়। একটি শ্রেণী যখনই নির্দিষ্ট করা হয় যেমন নাকি স্বাভাবিক সংখ্যার শ্রেণী ১, ২, ৩ ইত্যাদি তখনই এর বাইরে অন্য সব কিছু বাদ পড়ে যায়। Prof. Hamley বলেছেন যে যখনই আমরা শ্রেণী ভাগ করি আমরা সমস্ত ক্ষেত্রটিকে দুই ভাগে ভাগ করি—এক হচ্ছে যা শ্রেণীভুক্ত, আর একটি হচ্ছে যা শ্রেণীভুক্ত নয়।

শ্রেণীর ধারণা করাও গণিতের চিন্তাধারার একটি অঙ্গ। শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সাধারণ গুণ যা রয়েছে সেই গুণগুলিকে সমন্বয় করে বার করে আনাই হচ্ছে শ্রেণীর ধারণা করা। যখন আমরা চতুর্ভুজের ধারণা করি তখন যত চতুর্ভুজ আছে তাদের প্রত্যেকের কথা যে বলি তা নয়, চতুর্ভুজের যা ধর্ম যা গুণ সেই গুণের কথা বলা হয়। এই চতুর্ভুজ শব্দটি দ্বারা একটি হ্রাসবৃদ্ধিশীল চারবাহুবিশিষ্ট চিত্রের ধারণা করা হয়। এই হ্রাসবৃদ্ধিশীল ধারণাই (concept of variable) গণিতের একটি মস্ত বড় অবদান।

গণিতে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর যে সম্বন্ধ রয়েছে তা অনুসন্ধান করা ও সম্বন্ধ অনুযায়ী নিয়ম স্থাপন করা। একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কোনও নিয়ম অনুসারে না সাজালে কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না ও কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয় না। গণনা, পরিমাপ, প্রাকৃতিক নিয়ম, শ্রেণীতত্ত্ব এই সবের ভিতরেই আসে এই নিয়মানুসারে সাজাবার কথা।

দুইটি শ্রেণীর ভিতর যে সম্বন্ধ ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট আরও দুইটি শ্রেণী বার করাও গণিতের চিন্তাধারার একটি অঙ্গ। যেমন ৮ গজ কাপড়ের দাম যদি ২০ টাকা হয় তবে ২৪ গজ কাপড়ের দাম কত হবে তা বার করতে হলে ৮ ও ২৪-এর ভিতর যে সম্বন্ধ, ২০-র সঙ্গে কোন্ সংখ্যার সেই সম্বন্ধ তা বার করতে হবে।

শিক্ষাপদ্ধতির দিক থেকে বলা যায় যে শিক্ষার্থী যখন প্রথম গণিত শিখতে শুরু করে, তখন থেকে যদি শ্রেণী ভাগ করা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি তার দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়ে চর্চা করে তবে গণিতের শিক্ষায় সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

স্ত্রী-পুরুষ ভেদে গণিতে ধীশক্তির তারতম্য

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য যে পাঠ্যক্রম করেছেন তাতে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য গণিত অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্ধারিত করেছেন। মেয়েদের জন্য গণিত অবশ্যপাঠ্য করায় চারদিক থেকে যথেষ্ট আপত্তি উঠেছে। এঁরা বলেন গণিত বিষয়টি মেয়েদের উপযোগী মোটেই নয় এবং মেয়েদের বিশেষ কোনও কাজেও আসে না। তাঁদের মতে গণিত কষবার জন্য যে বুদ্ধি বা ক্ষমতার দরকার তা ছেলেদেরই আছে, মেয়েদের নেই। মেয়েরা ভালবাসে সে সব বিষয় যার ভিতর আছে ভাবের খেলা ও কল্পনার বৈচিত্র্য। সেজন্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় তাদের প্রিয়। মেয়েরা সাধারণতঃ সৌন্দর্যপ্রিয়, সেজন্য তারা ভালবাসে সঙ্গীত, কাব্য, কলা। গণিতের মত নীরস শুষ্ক বিষয় তাদের আদৌ ভাল লাগতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সত্যিই কি গণিতে ভাবের খেলা, কল্পনার বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য বা রস বলে কিছু নেই? আর সত্যিই কি ছেলে ও মেয়েদের ভিতরে গণিতের ধীশক্তির তারতম্য রয়েছে?

গণিতের সৃষ্টির ইতিহাস পড়লে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে গণিতে ভাবের খেলা ও কল্পনার বৈচিত্র্য যথেষ্টই রয়েছে। গণিতের রহস্য মরমীবাদের রহস্যের সঙ্গে জড়িত। অসীম অনন্তের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়েই গণিতের সৃষ্টি। জন্মমৃত্যু মানুষের কাছে রহস্যময়। জ্যামিতির নিয়মানুযায়ী কতকগুলি আকৃতির বিশেষত্ব দেখে মানুষ বিস্মিত হোলো। তিন, সাত প্রভৃতি কয়েকটি সংখ্যা তার কাছে রহস্যময় বোধ হোলো। সংখ্যার রহস্য, আকৃতির রহস্য, বিশ্বের রহস্যের সঙ্গে জড়িত বলে ধরে নেওয়া হোলো। আদিম মানুষের ধারণা হোলো যে নক্ষত্রের রহস্যের সঙ্গে তার অদৃষ্টের রহস্য জড়িত। সেইজন্য ব্যাবিলন দেশের মেষপালক নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ ও তাদের অর্থ খুঁজে বার করতে মনোনিবেশ করলো। নভোমণ্ডলের রহস্য ও খেলা বুঝতে গিয়েই গণিত বিষয় সম্পর্কীয় চিন্তার শুরু হোলো। সৃষ্টির রহস্য, বৈচিত্র্য ও খেলা বুঝতে গিয়েই যখন গণিতের সৃষ্টি তখন গণিতে ভাবের খেলা বা কল্পনার বৈচিত্র্য নেই বললে ভুল হবে।

গণিতে যে কাব্যরসেরও অভাব নেই তা আমরা দেখতে পাই আমাদের বিদ্বজ্জন পূর্বপুরুষদের লেখাতে। গণিতের ফলাফল তাঁরা কবিতায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করতেন এবং রহস্যসমাকুল অস্পষ্ট কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করতেন। অঙ্কের সমস্যাগুলি মনোরম কবিত্বপূর্ণ ভাষায় আচ্ছন্ন থাকতো। ভাস্করের বিখ্যাত 'লীলাবতী' থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে—"এক ঝাঁক মৌমাছির সব উড়ে গিয়েছে, কেবল অর্ধেকের বর্গমূল এখন রয়েছে। একটি স্ত্রী মৌমাছি একটি পুরুষ মৌমাছির চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। পুরুষ মৌমাছিটি একটি পদ্মের ভিতরে ঢুকে গুন্‌গুন্ শব্দ করছে। রাত্রিবেলায় পদ্মের সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সে এই পদ্মের ভিতর বন্দী হয়েছে। কত মৌমাছি ঝাঁকে ছিল?" সুতরাং দেখা যায় যে ইচ্ছা করলেই গণিতের ভিতর কাব্যরসও উপভোগ করা যেতে পারে। একজন বিখ্যাত লেখক বলেছেন—"The true spirit of delight, the exaltation, the sense of being more than man which is the touchstone of the highest excellence, is to be found in mathematics as surely as in poetry."

গণিতের সঙ্গে যে সঙ্গীতেরও সম্বন্ধ রয়েছে তা আমরা দেখতে পাই পিথাগোরাসের আবিষ্কারের ভিতর। পিথাগোরাস আবিষ্কার করলেন যে একটি তারের দুই-তৃতীয়াংশ স্থলে ও মধ্যস্থলে একটি সুরের পঞ্চম ও সপ্তম স্বর বার করা যায়। এইরকম সমন্বয় থেকেই এসেছে harmonic proportion-এর ধারণা। পিথাগোরাস বলেন যে নভোমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহগুলির ভিতরের ব্যবধান সঙ্গীতের স্বরসঙ্গতি অনুসারে হয়। এর থেকেই এসেছে Laws of spherical harmonics অর্থাৎ গোলীয় হরাত্মকের বিধি।

গণিতে সৌন্দর্য নেই একথা বলাও ঠিক নয়। মানুষের মনের কতকগুলি পিপাসা মিটাতে গিয়েই গণিতের সৃষ্টি। এর ভিতর একটি হচ্ছে সৌন্দর্য-পিপাসা। নিজের সৃষ্টিকে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টার ফলেই হয়েছে গণিতের উন্নতি। গণিতের ফলে রয়েছে সৌসামঞ্জস্য (proportion) ও সুসঙ্গতি (symmetry)। কোনওরূপ অনাবশ্যকতা বা অতিরিক্ততার স্থান এখানে নেই। লক্ষ্যস্থলে পৌছুতে হলে ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকুই নিয়ে চলতে হয়। সুন্দর যা কিছু তারও ঠিক এই একই ব্যবস্থা। শৃঙ্খলা, ছন্দ, সামঞ্জস্য, সঙ্গতি, ঐক্য—এ সবই হচ্ছে সৌন্দর্যের অঙ্গ, আবার গণিতেরও অঙ্গ। মানব জাতির

অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলা—যাকে বিশ্বভাষা বলা যায় সেই কলার ভিতর দিয়ে গণিত নিজের রূপ প্রকাশ করবার সুযোগ পেলো। গণিত বিষয়টিকে যদি ঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের শেখান যায় তবে সৌন্দর্য উপভোগের যে আনন্দ সেইরকম আনন্দই শিক্ষার্থীরা গণিতেও উপভোগ করবে।

সুতরাং গণিতের আসল রূপ দেখলে দেখা যায় যে, গণিত সত্যিকারের নীরস শুষ্ক বিষয় নয়। গণিতের মূলেই রয়েছে ভাবের খেলা ও কল্পনার বৈচিত্র্য। গণিতে সৌন্দর্য আছে। কবিত্বও গণিতে উপভোগ করা যায়। সঙ্গীতের স্বর-সঙ্গতির নিয়ম আর গণিতের নিয়ম কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক। কিন্তু তবুও যে গণিত নীরস মনে হয় তার কারণ হচ্ছে শিক্ষাপদ্ধতির দোষ।

স্ত্রী-পুরুষ ভেদে গণিতের ধীশক্তির তারতম্য আছে কি-না তা জানতে হলে এ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক কার্য যা হয়েছে তার আলোচনা দরকার। আমেরিকার হেলেন টমসন এ বিষয়ে পরীক্ষামূলক কাজ করে যা ফল পেয়েছেন তাতে তিনি বলেন, ছেলে ও মেয়েদের ভিতর যে মনোবিজ্ঞানসম্মত পার্থক্য দেখা যায় তা যে তাদের গড় ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য অথবা মানসিক ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য তা নয়। শৈশব অবস্থা থেকে বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের উপর সমাজের প্রভাবের পার্থক্যের দরুন এই পার্থক্য ঘটে। বৌদ্ধিক জীবনে মেয়েরা কতদূর অগ্রসর হবে তা নির্ভর করে সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও সমাজের আদর্শের উপর। কোনও জন্মগত মনোবিজ্ঞানসম্মত পার্থক্যের জন্য নয়।

প্রফেসার Thorndike পরীক্ষামূলক কাজ করে ছেলে ও মেয়েদের ভিতর ক্ষমতার পার্থক্য সম্বন্ধে বলেছেন যে, এখানে বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, পার্থক্য হচ্ছে খুবই কম। ছেলে ও মেয়ের নিজ নিজ দলের ভিতরেই ব্যক্তিগত পার্থক্য এত বেশী যে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সে তুলনায় এই উভয় দলের ভিতরের পার্থক্য খুবই নগণ্য।

আমেরিকার M. W. Calkins গণিত সংক্রান্ত নিয়মগুলি ধরেই ছেলে ও মেয়েদের ভিতর পার্থক্য বার করবার জন্য পরীক্ষামূলক কাজ করেন। তাঁর মতে স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর গণিত সংক্রান্ত নিয়মগুলিতে কোনও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

ইংলণ্ডে A. E. Cameron মাধ্যমিক স্কুলের ছেলে ও মেয়েদের ভিতর গণিতের ক্ষমতার কোনও পার্থক্য আছে কি-না তা বার করতে চেষ্টা করেছিলেন।

পরীক্ষার ফলে তিনি যা বার করেছেন তা হচ্ছে গণিতের ক্ষমতায় ছেলে ও মেয়েদের ভিতর কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ পার্থক্য নেই। তবে space সম্বন্ধে তিনি বলেন দুই বা তিন dimension-এ কল্পনার ক্ষমতা মেয়েদের থেকে ছেলেদের বেশী। কিন্তু এ-ও দেখা গিয়েছে যে যদি মেয়ে ও ছেলেরা একই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাছে অঙ্ক শেখে তবে সে পার্থক্য বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু space সম্বন্ধে যদি কিছু তথ্য দেওয়া থাকে তবে যুক্তির ব্যবহার করে তার থেকে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশী।

বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতায় দেখা গিয়েছে যে যদি মূর্ত ও যান্ত্রিক ব্যাপার হয় তবে ছেলেরা বেশী ভাল পারে কিন্তু যদি এমন বিষয় হয় যে ছেলে মেয়ে উভয়েরই পরিচিত তবে দেখা যায় যে মেয়েরাই সে বিষয় বিশ্লেষণ করতে বেশী ভাল পারে।

Miss Blackwell পরীক্ষা দ্বারা বার করতে চেষ্টা করেছেন যে গণিতের ক্ষমতার মূল উৎপাদক কি কি। ছেলেদের জন্য তিনি তিনটি বিশেষ উৎপাদকের উল্লেখ করেছেন—'g', 'o', 'w', আর মেয়েদের জন্য ৪টি উৎপাদক—'g', 'o', 'w' ও 'x'। ছেলেদের জন্য যে 'g'র উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে Spearmanএর 'g', যা তিনি বর্ণনা করে বলেছেন পরিমাণমূলক চিন্তা ও অবরোহী প্রণালীতে যুক্তি করার ক্ষমতা, সংখ্যা প্রতীক ও জ্যামিতির কাজে সাধারণ নিয়মগুলিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতা, একটি জটিল ব্যাপার থেকে তার আসল রূপ বার করা ও সামান্যীকরণ করার ক্ষমতা।

'o' উৎপাদকটি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে এ হচ্ছে মানসচক্ষে প্রতিরূপ দেখা ও প্রতিরূপগুলিকে নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা।

'w' উৎপাদকটি হচ্ছে বাচনিক ক্ষমতা—বিশেষ করে শব্দের অর্থ ও ধারণার সঙ্গে জড়িত।

মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ছেলেদের 'g' ও মেয়েদের 'g' একই জিনিস। মানসচক্ষে প্রতিরূপ দেখার ক্ষমতা ছেলেদের ও মেয়েদের একই প্রকারের। তবে মেয়েদের এই ক্ষমতা ছেলেদের থেকে কম।

মেয়েদের ক্ষেত্রে বাচনিক ক্ষমতাটি হচ্ছে একটু অন্য ধরনের। মেয়েদের বেলায় দেখা যায় শব্দের ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য ও অবাধ গতি।

মেয়েদের বেলায় চতুর্থ উৎপাদক তিনি যা বার করেছেন তা তিনি বলেন খুব বেশী সঠিক হওয়ার চেষ্টা।

আমেরিকার Oldham বলেন যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণিতের ক্ষমতার তারতম্য শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর পরিচালনা ক্ষমতার তারতম্যের জন্য হয়।

এই সব পরীক্ষার সব ফলাফলই যে খুব নির্ভরযোগ্য তা নয়। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা গিয়েছে যে যেখানেই সহশিক্ষা সেখানে ছেলে ও মেয়েদের ভিতর কোনও বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। যেখানেই সহশিক্ষা সেখানেই প্রতিযোগিতার ভাব আসে এবং সেজন্য পার্থক্যও কমে আসে। আমাদের দেশে সহশিক্ষার ব্যবস্থা খুব কমই আছে। ছেলে ও মেয়েদের বিদ্যালয়ের জীবনধারা ভিন্ন প্রকারের। যে সব শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর কাছে তারা শিক্ষা পায় তাঁরাও ভিন্ন প্রকৃতির। কোনও বিষয়ে ক্ষমতা অর্জন করতে হ'লে সে বিষয়ে আগ্রহ সঞ্চার ও উপযুক্ত মনোভাব তৈরি করা প্রয়োজন। এবং তা-ও নির্ভর করে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও বাড়ীতে পিতামাতার উপর। অনেক পিতামাতারই ধারণা যে গণিত বিষয়টি মেয়েদের উপযুক্ত নয়। পিতামাতার এই মনোভাবের প্রভাব ছেলেমেয়েদের উপরও পড়ে। Physics ও mechanics এই দুইটি বিষয় পড়তে হ'লে গণিতের প্রয়োজন হয়। মেয়েদের জন্য খুব কম স্কুলেই এ বিষয় দুইটির সংস্থান আছে। ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্যও এই বিষয়টির প্রতি ছেলে-মেয়েদের মনোভাব গঠনে সাহায্য করে। আমাদের দেশের সামাজিক আদর্শ এই যে মেয়েরা বড় হয়ে সুগৃহিণী ও সুমাতা হবে। নিজের জীবিকা অর্জনের তার প্রয়োজন নেই। সেজন্য মেয়েরা গণিত বা বিজ্ঞান থেকে সাহিত্য, ইতিহাস, কলা প্রভৃতি বিষয়ে বেশী আগ্রহ বোধ করে। পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দ ঠিক করবার জন্য কিছু অঙ্ক শিক্ষার দরকার এবং তার তার বেশী অঙ্ক শিখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। সুতরাং গণিতের ভিতর অঙ্কেই তাদের আগ্রহ আমরা দেখতে পাই।

সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে গণিতে ধীশক্তির যে কোনও তারতম্য আছে তা নয়। ছেলে ও মেয়েদের ভিতর গড় ক্ষমতার বিশেষ তারতম্য নেই। যে তারতম্য দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে সমাজের প্রভাব। শৈশবাবস্থা থেকে বয়স্ক কাল অবধি সমাজ যে প্রভাব মনের উপর বিস্তার করে তারই ফলে এরূপ বীতশ্রদ্ধ ভাব আসে।

পঞ্চম অধ্যায়

গণিত শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি

গণিতের নিয়ম বিভিন্ন পদ্ধতিতে শেখান যেতে পারে যথা :—

(১) বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রণালী (Analytic & Synthetic method)

(২) আরোহী ও অবরোহী প্রণালী (Inductive & Deductive method)

(৩) আবিষ্কারকের প্রণালী (Heuristic method)

(৪) পরীক্ষাগারের প্রণালী (Laboratory method)

(৫) একরোখা যুক্তিযুক্ত প্রণালী (Dogmatic method)

(৬) বক্তৃতা প্রণালী (Lecture method)

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রণালী (Synthetic & Analytic Method)

কোনও জানা বা জ্ঞাত তথ্য দেওয়া আছে, সেই তথ্যকে ভিত্তি করে একটি অজানা সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে হবে। সংশ্লেষণ প্রণালীতে জানা তথ্যকে ভিত্তি করে অগ্রসর হতে হয়। এটা-সেটার সাহায্য নিয়ে পরখ করে চলতে হয় যতক্ষণ না অজানা সিদ্ধান্তটি প্রমাণিত হয়।

বিশ্লেষণ প্রণালীতে অজানা সিদ্ধান্তটিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় যে অজানা সিদ্ধান্তটির সত্যতা অন্য কোনও সত্যতার উপর নির্ভর করে কি-না। যদি করে তবে সেই সত্যতা আবার কোন্ সত্যতার উপর নির্ভর করে তা বার করতে হয়। এই ভাবে বিশ্লেষণ করে যেতে যেতে পৌছান যায় জানা বা জ্ঞাত তথ্যটিতে এবং দেখা যায় অজানা সিদ্ধান্তটির সত্যতা মূলতঃ সেই জানা তথ্যটির সত্যতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু জানা তথ্যটি সত্য বলেই জানা আছে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে অজানা সিদ্ধান্তটিও সত্য।

উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যেতে পারে যদি $a : b = c : d$ হয় তবে প্রমাণ করতে হবে—$ac + 2bd : bc = c^2 + 2d^2 : cd$.

সংশ্লেষণ প্রণালীতে প্রমাণ করা হবে এইভাবে :—

$a : b = c : d$

$$\therefore \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

উভয় দিকে $\frac{2d}{c}$ যোগ করলে পাওয়া যায়—

$$\frac{a}{b}+\frac{2d}{c}=\frac{c}{d}+\frac{2d}{c}$$

অথবা $\frac{ac+2bd}{bc}=\frac{c^2+2d^2}{cd}$

অথবা $ac+2bd : bc=c^2+2d^2 : cd.$

বিশ্লেষণ প্রণালীতে প্রমাণ করা হবে এইভাবে :—$a : b=c : d$

অথবা $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ দেওয়া আছে

এখন $ac+2bd : bc=c^2+2d^2 : cd$ তখনই হবে, যখন

$$\frac{ac+2bd}{bc}=\frac{c^2+2d^2}{cd}$$

অথবা $ac^2d+2bcd^2=bc^3+2bcd^2$

অথবা $ac^2d=bc^3$

অথবা $ad=bc$

অথবা $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ হয়।

কিন্তু $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ এই সত্য দেওয়া আছে। সুতরাং $ac+2bd : bc=c^2+2d^2 : cd$ তাতে সন্দেহ নেই।

আর একটি অঙ্ক :—

যদি $a : b=c : d$ হয় তবে প্রমাণ করতে হবে $a^2+ab+b^2 : a^2-ab+b^2=c^2+cd+d^2 : c^2-cd+d^2.$

সংশ্লেষণ প্রণালীতে প্রমাণ এইভাবে হবে :—

$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ অথবা $\begin{cases}\frac{a+b}{b}=\frac{c+d}{d} & \cdots (1)\\ \frac{a-b}{b}=\frac{c-d}{d} & \cdots (2)\end{cases}$

$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ অথবা $\frac{a^3}{b^3}=\frac{c^3}{d^3}$

অথবা $\frac{a^3+b^3}{b^3}=\frac{c^3+d^3}{d^3} \quad \cdots (3)$

এবং $\frac{a^3-b^3}{b^3}=\frac{c^3-d^3}{d^3} \quad \cdots (4)$

(3) ও (4) হইতে—

$$\frac{a^3+b^3}{a^3-b^3}=\frac{c^3+d^3}{c^3-d^3}$$

অথবা $\dfrac{(a+b)\ (a^2-ab+b^2)}{(a-b)\ (a^2+ab+b^2)}=\dfrac{(c+d)\ (c^2-cd+d^2)}{(c-d)\ (c^2+cd+d^2)}$

(1) এবং (2) হইতে পাওয়া যায় $\dfrac{a+b}{a-b}=\dfrac{c+d}{c-d}$

$\therefore\ \dfrac{a^2-ab+b^2}{a^2+ab+b^2}=\dfrac{c^2-cd+d^2}{c^2+cd+d^2}$

অথবা $\dfrac{a^2+ab+b^2}{a^2-ab+b^2}=\dfrac{c^2+cd+d^2}{c^2-cd+d^2}$

বিশ্লেষণ প্রণালীতে অঙ্কটি এইভাবে করা যায় :—

$\dfrac{a^2+ab+b^2}{a^2-ab+b^2}=\dfrac{c^2+cd+d^2}{c^2-cd+d^2}$ তখনই হবে

যখন $\dfrac{a^2+ab+b^2}{a^2-ab+b^2}-1=\dfrac{c^2+cd+d^2}{c^2-cd+d^2}-1$ হয়।

অথবা $\dfrac{a^2+ab+b^2-a^2+ab-b^2}{a^2-ab+b^2}=\dfrac{c^2+cd+d^2-c^2+cd-d^2}{c^2-cd+d^2}$

হয়

অথবা $\dfrac{2ab}{a^2-ab+b^2}=\dfrac{2cd}{c^2-cd+d^2}$ হয়

অথবা $abc^2-abcd+abd^2=a^2cd-abcd+b^2cd$ হয়

অথবা $abc^2-b^2cd=a^2cd-abd^2$ হয়

অথবা $bc(ac-bd)=ad(ac-bd)$ হয়

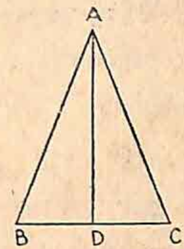
অথবা $bc=ad$ হয়

অথবা $\dfrac{c}{d}=\dfrac{a}{b}$ হয়

কিন্তু $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$ দেওয়া আছে

সেজন্য $\dfrac{a^2+ab+b^2}{a^2-ab+b^2}=\dfrac{c^2+cd+d^2}{c^2-cd+d^2}$

জ্যামিতিতেও সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রণালী অনুসরণের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন প্রমাণ করতে হবে 'যদি কোনও ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান হয় তবে তাদের বিপরীত কোণ দুইটিও পরস্পর সমান হবে।'



ABC একটি ত্রিভুজ যার AB বাহু = AC বাহু

প্রমাণ করতে হবে যে ∠ ACB = ∠ ABC।

বিশ্লেষণ প্রণালী—দুইটি কোণ সমান প্রমাণ করা কখন সম্ভব হয়?

যদি কোণ দুইটিকে, দুইটি সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ কোণ বলে প্রমাণ করা যায়।

ABC ত্রিভুজটিকে দুইটি সর্বসম ত্রিভুজে ভাগ করা যায় কি?

ধরা যাক যে A বিন্দু থেকে AD রেখা টেনে ত্রিভুজটিকে দুইটি ত্রিভুজে বিভক্ত করা হোলো। এখন কিভাবে AD রেখা টানলে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হবে?

স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে জানা যায় যে দুইটি ত্রিভুজের যদি একটির দুই বাহু অন্যটির অনুরূপ দুই বাহুর সমান হয় এবং একটির দুই বাহুর অন্তর্ভূত কোণ অপরটির অনুরূপ দুই বাহুর অন্তর্ভূত কোণের সমান হয় তবে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হয়।

এখানে ABD ও ACD ত্রিভুজ দুইটিতে AB = AC দেওয়া আছে। একই বাহু AD দুইটি ত্রিভুজেরই আছে। সেজন্য AB ও ADর অন্তর্ভূত কোণ যদি AC ও ADর অন্তর্ভূত কোণের সমান হয় তবেই ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হয়।

অর্থাৎ AD যদি BAC কোণটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তবেই ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হয়।

BAC কোণের সমদ্বিখণ্ডক হিসাবে AD টানা সম্ভব, সেজন্য ∠ ACB = ∠ ABC হওয়াও সম্ভব।

সংশ্লেষণ প্রণালী

ধরা যাক AD রেখা BAC কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে BC বাহুর সঙ্গে D বিন্দুতে মিলেছে।

এখন BAD ও CAD এই ত্রিভুজ দুইটিতে

AB = AC (দেওয়া আছে)

AD উভয়ের সাধারণ বাহু

∠BAD = ∠CAD (অঙ্কিত হয়েছে)

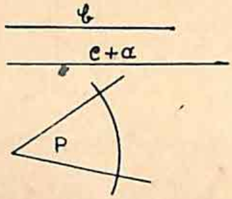
স্থতরাং স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে △BAD ও △CAD সর্বসম।

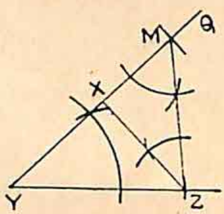
∴ ∠ACD = ∠ABD অর্থাৎ ∠ACB = ∠ABC

দ্বিতীয় উদাহরণ

কোনও ত্রিভুজের ভূমি, ভূমিসংলগ্ন একটি কোণ এবং দুইটি বাহুর সমষ্টি দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

ধরা যাক কোনও ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য b দেওয়া আছে। অন্য দুইটি বাহুর সমষ্টি c+a দেওয়া আছে। এবং P, ভূমিসংলগ্ন একটি কোণের মাপ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।





বিশ্লেষণ প্রণালী

ধরা যাক YZ = b ভূমি দেওয়াআছে। ভূমিসংলগ্ন একটি কোণ ∠P র সমান হবে সেজন্য YZএর Y বিন্দুতে ZYQ কোণটি ∠P র সমান করে আঁকা যেতে পারে।

এখন ত্রিভুজটির আর একটি শীর্ষবিন্দু X কোথায় বসান যেতে পারে?

X বিন্দু নিশ্চয়ই YQএর উপর থাকবে। দুইটি বাহুর সমষ্টি c+a দেওয়া আছে। c অথবা a, YQএর উপর থাকবে। কিন্তু কতখানি c বা কতখানি a তা জানা নেই। c+a যখন জানা আছে তখন YM = c+a কেটে নেওয়া যেতে পারে। এখন X বিন্দু এমনভাবে নিতে হবে যেন YX + XZ = c + a = YM = YX + XM হয়

অর্থাৎ XZ = XM করতে হবে।

তা কেমন করে সম্ভব হবে?

আমরা জানি যে যদি কোনও ত্রিভুজের দুইটি কোণ পরস্পর সমান হয় তবে তাদের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান হবে।

স্থতরাং MZ যোগ করে MZএর Z বিন্দুতে ∠MZX = ∠XMZ আঁকতে হবে। কারণ তা হলেই XZ = XM হবে ও XYZ ত্রিভুজটিই অভীষ্ট ত্রিভুজ হবে।

সংশ্লেষণ প্রণালী

ভূমি bর সমান করে YZ রেখাটি টেনে, YZএর Y বিন্দুতে P কোণের সমান করে QYZ কোণ আঁকতে হবে।

YQ থেকে c+aর সমান করে YM অংশ কেটে নিয়ে MZ যোগ করতে হবে। YZএর Z বিন্দুতে YMZ কোণের সমান করে MZX কোণ আঁকতে হবে। M যে পাশে আছে কোণটি যেন MZএর সেই পাশে হয়। ZX, YMকে X বিন্দুতে ছেদ করলে XYZ অভীষ্ট ত্রিভুজ হবে।

সংশ্লেষণ প্রণালীতে বেশ ছোটর ভিতর প্রমাণ দেওয়া যায়। কিন্তু দোষ হচ্ছে যে, কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করে চেষ্টা ও ভুলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। সে জন্য প্রমাণটা ঠিক বোঝা যায় না। যেমন বীজগণিতের প্রথম উদাহরণটিতে দুই দিকে $\frac{2d}{c}$ যোগ করা হোলো; কিন্তু এই $\frac{2d}{c}$ কেন এবং কোথা থেকে আনা হোলো তা থেকে যায় অস্পষ্ট। কিংবা জ্যামিতির প্রথম উদাহরণটিতে কেন AD রেখাটি BAC কোণটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে টানা হোলো তা সংশ্লেষণ প্রণালীতে বোঝা যায় না। কতকটা আন্দাজের উপর করে যেতে হয়।

কিন্তু বিশ্লেষণ প্রণালীতে করলে সবগুলি ধাপই বোঝা যায়। প্রত্যেকটি ধাপেরই একটি যুক্তি পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বোঝা যায়। সেজন্য সংশ্লেষণ প্রণালীতে আমরা প্রমাণ পাই। কিন্তু সবগুলি ধাপের ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। এখানে কতকগুলি জানা সত্যকে একত্র করে তারপর তা থেকে অজানা সত্য বার করা হয়। কিন্তু বিশ্লেষণ প্রণালীতে অজানাকে বিশ্লেষণ করে ছোট ছোট ভাগ করে সেই ভাগগুলির সত্যতা প্রমাণ করলে অজানার সত্যতা নিজ থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়। সেজন্য Young বলেছেন—"The synthetic method seeks a needle in a haystack but in the analytic method the needle seeks to get out of the haystack." অর্থাৎ সংশ্লেষণ প্রণালীতে চেষ্টা চলে একগাদা খড় থেকে একটি ছুঁচ বার করে আনবার জন্য কিন্তু বিশ্লেষণ প্রণালীতে ছুঁচ খড়ের গাদা থেকে নিজে নিজেই বেরিয়ে আসে। বিশ্লেষণ প্রণালী হচ্ছে সত্যিকারের গণিতজ্ঞের প্রণালী। কোনও বিষয়ের প্রমাণ আবিষ্কার করতে বা ভুলে গেলে আবার পুনঃ আবিষ্কারের জন্য বিশ্লেষণ প্রণালীই প্রশস্ত উপায়। কিন্তু প্রমাণটিকে সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে উপস্থিত করতে হলে সংশ্লেষণ প্রণালীই ভাল।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, শ্রেণীকক্ষে কি তবে শুধু বিশ্লেষণ প্রণালীই ব্যবহার করা ভাল না সংশ্লেষণ প্রণালীরও কোন স্থান আছে। তার উত্তরে বলা যায় শ্রেণীকক্ষে উভয়েরই স্থান আছে। বিশ্লেষণ প্রণালীতে প্রমাণের প্রত্যেকটি ধাপ বুঝে নেওয়ার পর সংশ্লেষণ প্রণালীতে সেই প্রমাণ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে ও তাতে সুবিধাই হবে।

আরোহী ও অবরোহী প্রণালী (Inductive & Deductive Method)

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রণালীকে আরোহী প্রণালী বলে। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তগুলি সাধারণতঃ মূর্ত জিনিস ঘিরে হয়, তার পর মূর্ত থেকে বিমূর্ত সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়। কিন্তু অবরোহী প্রণালীতে একটি সাধারণ তথ্যকে স্বীকার করে নিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রের সত্যতা প্রমাণ করা হয়। অভিজ্ঞতা থেকে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সে সবই প্রায় আরোহী প্রণালী অবলম্বনেই হয়। কোনও এক শ্রেণী ভুক্ত এক বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর সম্পর্কে যা নির্ণীত হয় তা সমস্ত শ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজ্য বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। আরোহী প্রণালী দ্বারা যে অনুমান করা হয় তা হচ্ছে পরীক্ষাপ্রসূত অনুমান। এইরূপ যুক্তি দ্বারা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সে সব যে একেবারে অকাট্য তা নয়—তবে সম্ভাব্যতা যথেষ্ট নির্দেশ করে। সুতরাং গণিতের তথ্য আবিষ্কারের পথ দেখিয়ে দেবার পক্ষে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী সন্দেহ নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে প্রথম n স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত তা বার করতে হলে দেখা যায়—

$n=1$ ধরলে যোগফল হয় $1=1\frac{(1+1)}{2}$

$n=2$ ” $1+2=3=2\frac{(2+1)}{2}$

$n=3$ ” $1+2+3=6=3\frac{(3+1)}{2}$

$n=4$ ” $1+2+3+4=10=4\frac{(4+1)}{2}$

$n=5$ ” $1+2+3+4+5=15=5\frac{(5+1)}{2}$

সুতরাং প্রথম n সংখ্যার যোগফল $= n\frac{(n+1)}{2}$

আবার জ্যামিতিতেও দেখা যায়—

একটি ত্রিভুজের অন্তঃকোণগুলির সমষ্টি $= 2$ সমকোণ
$= 6 - 4$ সমকোণ
$= 2 \times 3 - 4$ সমকোণ

একটি কুব্জ চতুর্ভুজের অন্তঃকোণের সমষ্টি $= 4$ সমকোণ
$= 8 - 4$ সমকোণ
$= 2 \times 4 - 4$ সমকোণ

একটি কুব্জ পঞ্চভুজের অন্তঃকোণের সমষ্টি $= 6$ সমকোণ
$= 10 - 4$ সমকোণ
$= 2 \times 5 - 4$ সমকোণ

একটি কুব্জ ষড়ভুজের অন্তঃকোণের সমষ্টি $= 8$ সমকোণ
$= 12 - 4$ সমকোণ
$= 2 \times 6 - 4$ সমকোণ

একটি কুব্জ সপ্তভুজের অন্তঃকোণের সমষ্টি $= 10$ সমকোণ
$= 14 - 4$ সমকোণ
$= 2 \times 7 - 4$ সমকোণ

একটি কুব্জ অষ্টভুজের অন্তঃকোণের সমষ্টি $= 12$ সমকোণ
$= 16 - 4$ সমকোণ
$= 2 \times 8 - 4$ সমকোণ

সুতরাং n বাহুবিশিষ্ট কুব্জ ঋজুরেখ ক্ষেত্রের অন্তঃকোণের সমষ্টি $= 2n - 4$ সমকোণ।

এইভাবে আরোহী প্রণালীতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

Deductive method অবরোহী প্রণালী অনুসারে বীজগণিতের উদাহরণটি প্রমাণ করা যায় এইভাবে। ধরা যাক :—

$s = n$ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল

অথবা $s = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots\cdots + n \cdots\cdots(1)$

আবার বিপরীত দিক থেকে যোগ করে এলে

$$s = n + (n-1) + (n-2) + (n-3) + \cdots\cdots + 1 \quad \cdots\cdots (2)$$

(1) ও (2) যোগ করলে পাওয়া যায়

$$2s = (n+1) + (n+1) + (n+1) + \cdots\cdots + (n+1)$$
$$= n(n+1)$$
$$\therefore \quad s = \tfrac{1}{2}n(n+1)$$

জ্যামিতির উদাহরণটি অবরোহী প্রণালী অনুসারে প্রমাণ করা যায় এইভাবে—একটি n বাহুবিশিষ্ট কুব্জ ঋজুরেখ ক্ষেত্রের ভিতরে একটি কেন্দ্রবিন্দু নিয়ে, সেই বিন্দুর সঙ্গে সরল রেখা দ্বারা শীর্ষবিন্দুগুলি যোগ করলে n সংখ্যক ত্রিভুজ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ত্রিভুজের অন্তঃকোণের সমষ্টি 2 সমকোণ। সুতরাং n সংখ্যক ত্রিভুজের অন্তঃকোণের সমষ্টি 2n সমকোণ। কিন্তু ঋজুরেখ ক্ষেত্রটির কেন্দ্রস্থিত কোণগুলির সমষ্টি 4 সমকোণ।

সেজন্য ঋজুরেখ ক্ষেত্রটির অন্তঃকোণের সমষ্টি হবে (2n − 4) সমকোণ।

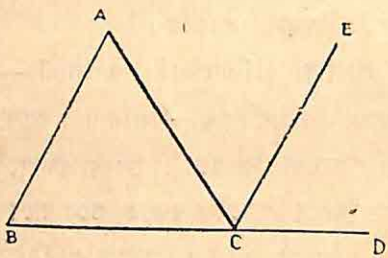
গণিতের নিয়ম তৈরি করার পদ্ধতি হচ্ছে আরোহী প্রণালী। শিক্ষার্থীর পক্ষে আরোহী প্রণালীতে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ। এখন প্রশ্ন এই, আরোহী প্রণালীতে এবং আরোহী প্রণালীর যুক্তি দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তকে সর্বসময়ে সর্বক্ষেত্রে সত্য বলে মেনে নেওয়া ঠিক কি-না। কিন্তু গণিতের এই একটা মস্ত বড় মহিমা যে আরোহী প্রণালীর যুক্তির সম্ভাব্যতা থেকে অবরোহী প্রণালীর যুক্তির নিশ্চয়তাতে চলে যাওয়া যায়। সুতরাং যদিও গণিত আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে অবরোহী প্রণালীর যুক্তিধারার উপরই প্রতিষ্ঠিত তথাপি আরোহী প্রণালীর যুক্তিধারারও যথেষ্ট স্থান গণিতে আছে। স্কুলের শ্রেণীকক্ষে এই দুই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবার কিছু নেই, কিন্তু শ্রেণীতে আরোহী প্রণালীর যুক্তিধারার ব্যবহারের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। সাধারণতঃ শ্রেণীতে শিক্ষক একটি উপপাদ্য উল্লেখ করেন। তারপর তার অবরোহী প্রণালীর যুক্তি অনুসারে একটি প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেন। পরে কতকগুলি সমস্যামূলক প্রশ্নের সমাধানের জন্য সেই উপপাদ্যটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত পদ্ধতি হবে প্রথমে কতকগুলি সমস্যা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা, হাতে কলমে পরীক্ষা করে সেই সমস্যাগুলির সমাধান করতে গিয়ে তারা উপপাদ্যটি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারবে।

ক্রমে ক্রমে শিক্ষার্থী নিজেই উপপাদ্যটি উল্লেখ করবে এবং উপপাদ্যটির একটি অকাট্য প্রমাণের জন্য উৎসুক হবে। শিক্ষার্থী এখন এই প্রমাণের জন্য প্রস্তুত, এবং প্রমাণ বার করবার জন্য ব্যগ্র। সুতরাং এই সময় যদি তাকে প্রমাণ বুঝানো যায় তবে সে তা বুঝতে পারবে ও উৎসাহিত হবে। এখন এই বিষয়টি বুঝে নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সে সমর্থ হবে। একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি যে দুই সমকোণের সমান তা প্রমাণ করবার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে ত্রিভুজ আঁকতে বলা যেতে পারে। তারপর প্রত্যেককে নিজ নিজ ত্রিভুজের তিনটি কোণই মেপে যোগফল বার করতে বলা যেতে পারে। সঠিক মাপতে পারলে সবাই দেখবে যে প্রত্যেকের ত্রিভুজেরই তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান। সুতরাং আরোহী প্রণালীতে এইভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, প্রত্যেক ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কি অকাট্য বলে মেনে নেওয়া যায়? অর্থাৎ কি করে বলা যায় যে, কোনও দিন এমন কোনও ত্রিভুজ পাওয়া যাবে না যার অন্তঃকোণের সমষ্টি দুই সমকোণের বেশী বা কম হবে? এই জন্য প্রয়োজন অবরোহী প্রণালী অবলম্বনে প্রমাণ। এখন সমান্তরাল রেখার ধর্মের সত্যতা মেনে নিয়ে প্রমাণ করা যায় যে যেখানেই যে ত্রিভুজ থাকুক না কেন, তাদের অন্তঃকোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। সুতরাং গণিতের অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে অবরোহী প্রণালীর যুক্তিধারার ওপর তা প্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

আবিষ্কারকের প্রণালী (Heuristic method)—Heuristic কথাটি এসেছে গ্রীক্ শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে—'আমি বার করেছি'। এই প্রণালীর মূল কথা হচ্ছে, শিক্ষার্থীর মনোভাব হবে যে সে আবিষ্কারকের স্থান নিয়েছে। সে যে শুধু চুপ করে বসে নীরবে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে যাবে তা নয়। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী উপস্থিত থাকবেন এবং মৃদু হাস্যে বা মিষ্ট কথায় প্রশ্নের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারের সাহায্য করবেন। শেষ পর্যন্ত যখন আবিষ্কার হয়ে যাবে, শিক্ষার্থীর মনোভাব হবে যে সে নিজেই আবিষ্কার করেছে। শিক্ষক আবিষ্কারের জন্য প্রশ্নের ভেতর দিয়ে নানারকম ইঙ্গিত দেবেন। পাঠ্য পুস্তকেও ইঙ্গিত থাকবে। কিন্তু ইঙ্গিতগুলো এমন হবে যেন শিক্ষার্থীর সাধ্যের ও আয়ত্তের ভেতর হয়। এই পদ্ধতি এক একজন এক এক ভাবে ব্যবহার

করেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশেষভাবে পাঠ্য পুস্তক রচনা হতে পারে যাতে প্রয়োজনমত নির্দেশ দেওয়া থাকবে। শিক্ষক সেই নির্দেশ পাঠ করে যাবেন আবৃত্তি পদ্ধতিতে। ব্যক্তিগত ভাবে এই শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে আবার শ্রেণীগত ভাবেও সব শিক্ষার্থী মিলে আবিষ্কারকের কাজ করতে পারে।

প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলেই যে আবিষ্কারকের প্রণালী অনুসরণ করা হয় তা নয়। বিশ্লেষণ প্রণালীতে ও প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়েই অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু দুইএর ভেতর পার্থক্য এই যে আবিষ্কারকের প্রণালীতে শিক্ষকের ইঙ্গিত পেলেও শিক্ষার্থীকে নিজে থেকে অগ্রসর হবার অবকাশ বেশী দিতে হয়। বিশ্লেষণ প্রণালীতে বিশ্লেষণ করাটাই উদ্দেশ্য—পথচালনার ভার ও বিশ্লেষণের ভার শিক্ষকও নিতে পারেন। কিন্তু আবিষ্কারকের প্রণালীতে শিক্ষক উপযুক্ত প্রশ্ন দ্বারা পথচালনায় সাহায্য করতে পারেন কিন্তু পথ খুঁজে বার করবে শিক্ষার্থী নিজে। একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল। আরোহী প্রণালীতে প্রত্যেকে একটি করে ত্রিভুজ এঁকে শিক্ষার্থীরা এই ধারণায় আসতে পারে যে, একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। কিন্তু এই ধারণার যাথার্থ্য নির্ধারণের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করতে পারেন :—



শিক্ষকের প্রশ্ন	শিক্ষার্থীর উত্তর
১। কি প্রমাণ করতে হবে?	১। ABC ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।
২। কোণ তিনটির নাম কি?	২। ABC, BCA, CAB।

৩। দুইএর অধিক কোণের সমষ্টি কখন দুই সমকোণ হয় ?

৩। যখন কোণ কয়টিএ কত্রে একটি সরল কোণের সৃষ্টি করে অথবা একটি সরল কোণের সমান হয়।

৪। তা হ'লে এখানে কি প্রমাণ করতে পারলে যথেষ্ট হবে ?

৪। $\angle ABC + \angle BCA + \angle CAB$ = এক সরল কোণ।

৫। ABC একটি ত্রিভুজ। এখানে এক সরল কোণ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে ?

৫। ABC ত্রিভুজের যে-কোনও একটি বাহু বর্ধিত করলে এক সরল কোণ পাওয়া যেতে পারে। যেমন BC বাহু যদি D পর্যন্ত বাড়ানো যায় তবেই এক সরল কোণ পাওয়া যাবে।

৬। BC বাহু D পর্যন্ত বাড়ালে কোন্ কোন্ কোণ মিলে এক সরল কোণ হবে ?

৬। $\angle BCA + \angle ACD$ = এক সরল কোণ।

৭। তা হ'লে এখন কি প্রমাণ করা দরকার ?

৭। $\angle ABC + \angle BCA + \angle CAB = \angle BCA + \angle ACD$ অথবা $\angle ABC + \angle CAB = \angle ACD$।

৮। একদিকে দুইটি কোণ ও আর একদিকে একটি কোণ—এই দুই দুইদিক সমান দেখাতে হ'লে কি করলে সুবিধা হবে ?

৮। একদিকের একটি কোণকে দু'ভাগে এমন ভাবে ভাগ করে নিলে যে এই দুই ভাগ অন্য দিকের দুই ভাগের সমান হয়।

৯। কিভাবে তা করা যাবে ?

৯। ধরা যাক্ যে CE একটি রেখা টানা হ'ল, সুতরাং এখন দেখাতে হবে $\angle ABC + \angle CAB = \angle ACE + \angle ECD$।

১০। কিভাবে CE টানলে এরূপ সম্ভব হতে পারে ?

১০। আমরা জানি যে যদি একটি রেখা দুইটি রেখাকে ছেদ করে ও রেখা দুইটি সমান্তরাল হয় তবে একান্তর কোণ ও অনুরূপ কোণ সমান হয়।

১১। দুইটি সমান্তরাল রেখা ও একটি ছেদক কি করে এখানে পাওয়া যাবে ?	১১। CE যদি BA রেখার সঙ্গে সমান্তরাল টানা যায় তবে $\angle ACE = \angle BAC$ ও $\angle ECD = \angle ABC$ হয়।

এই প্রণালীর সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। সুবিধার দিক থেকে বলা যায় যে শিক্ষার্থীরা নিজেরা চিন্তা করতে শেখে। শুধু পরের মুখে তথ্য শোনে না। একটি বক্তৃতা শুনলে সেই বক্তৃতার সব কিছু ভাল করে ধরা বা বোঝা যায় না। কিন্তু আবিষ্কারকের প্রণালীতে শিখালে শিক্ষার্থীরা বিষয়টির প্রত্যেকটি অংশ ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। শিক্ষকের সাহায্যে বিষয়টি তারা নিজেরাই বিশ্লেষণ করে নিয়ে প্রমাণের উপায় খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। গণিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দিক থেকে আগ্রহ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই উপায়ে শিখলে তারা আগ্রহ বোধ করে এবং শিখবার জন্য উৎসুক হয়। শিক্ষকের সব সময় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। শিক্ষার্থীরা সব সময় সতর্ক থাকে। শ্রেণীতেই প্রায় সব কাজ হয়ে যায়, বাড়ীর জন্য বেশী কাজ থাকে না।

এই প্রণালীর অসুবিধাও আছে। এইভাবে সমস্ত বিষয়টি পুনঃ আবিষ্কার করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। তথ্য শুনে লিখতে এত বেশী সময় লাগে না। অবশ্য এও ঠিক যে, প্রথম দিক দিয়েই সময় বেশী লাগে, তারপর শিক্ষার্থী দ্রুত এগিয়ে চলে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষার্থীকে চিন্তা করে সমস্যা সমাধান করতে বলেন। এর পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য রয়েছে তা বুঝতে না পেরে শিক্ষার্থী হয়তো মনে করে যে শিক্ষক নিতান্ত নির্দয়। তাকে একটুও সাহায্য করছেন না। তা ছাড়া এও আশা করা যায় না যে সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীরা এক একজন দ্বিতীয় Euclid হয়ে বসবে। কিন্তু ঠিক এরকম আশা সত্যিকারের করা হয় না। শিক্ষার্থীর ক্ষমতানুযায়ী বিষয়টিকে কতকগুলি সহজ সরল পর্যায়ে ভাগ করে তার কাছে ধরা হয়, কাজেই সাধারণ মেধার ছাত্র হলেও সে আগ্রহের সঙ্গে কাজটি করে। অনেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা কষ্টকর। কারণ কোনও একটি বিশেষ পাঠ্য পুস্তক অনুসরণ করলে চলে না। সর্বদাই তাঁকে উপায় উদ্ভাবন করতে হয় যে, কি করে শিক্ষার্থীদের চালাবেন। অনেক শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষক বলেছেন যে যারা ক্ষীণ-মেধাসম্পন্ন, এই প্রণালীতে পড়ালে তারাও যথেষ্ট লাভবান হয়।

আবিষ্কারকের প্রণালীতে পড়াতে হলে ধীরে ধীরে শিক্ষকের আগে নিজের এই পদ্ধতি আয়ত্তে আনতে হবে। এই পদ্ধতি মানে নয় যে পুস্তকহীন শিক্ষা। অন্ততঃ গোড়ায় শিক্ষক বই ব্যবহার কখনই ছাড়বেন না। শিক্ষকের নিজের মনে এই আবিষ্কারকের ভাব জাগাতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন গভীর ভাবে ও বিশদভাবে বিষয়টি পাঠ করা। শ্রেণীতে একখানা ভাল পাঠ্য বই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেরই আবিষ্কারের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে। কোনও একটি বিষয় শিক্ষক শ্রেণীর সামনে তুলে ধরবেন। কিন্তু ঠিক সোজাসুজি শেখাতে আরম্ভ করবেন না, সমস্যারূপেই তা তুলে ধরবেন। শিক্ষার্থীরা যতটা সম্ভব উত্তর ও সমাধানের সামগ্রী যোগাতে চেষ্টা করবে। যা তারা পারবে না, শিক্ষক সেখানে সাহায্য করবেন। পাঠের শেষে তারা বইখানি মিলিয়ে দেখবে ও শ্রেণীতে যা শেষ হয়নি তা শেষ করবে।

পরীক্ষাগারের নিয়ম (Laboratory Method) :—বর্তমানে শিক্ষা-পদ্ধতি শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আগে শিক্ষা-পদ্ধতিতে জোর দেওয়া হতো যুক্তির ওপর। কিন্তু বর্তমানে ধারণা হচ্ছে যে, কোনও শিক্ষা যুক্তিপূর্ণ হয় না যদি নাকি তা শিশুর মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে না হয়। গণিত শিক্ষা নির্ভর করে শিশুর ক্ষমতা ও প্রয়োজনবোধের ওপর। শিক্ষা ব্যাপারে শিশুর আগ্রহ হচ্ছে গোড়ার কথা। শিক্ষা-পদ্ধতি এমন করতে হবে যাতে শিশু বিষয়টিতে আগ্রহ বোধ করে। আগ্রহ বোধ করলে সে স্বচ্ছন্দে আনন্দের সঙ্গে শিখবে। পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এই স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ উপভোগ করে এবং সেইজন্য এই পদ্ধতিতে গণিত শেখালে গণিত তাদের কাছে সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য হবে ও বিষয়টি তারা গ্রহণ করতে পারবে।

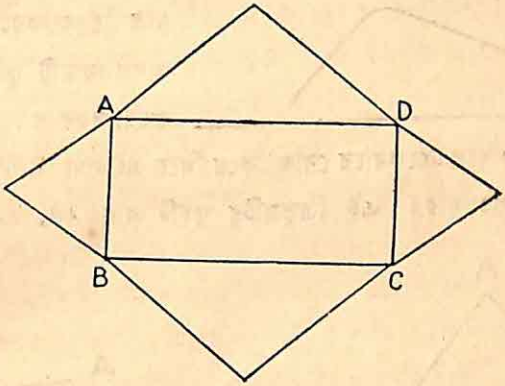
শিশুদের প্রকৃতি হচ্ছে যে তারা কিছু করতে ভালবাসে, তাদের ক্ষমতা খাটাতে ভালবাসে। যে জিনিস প্রয়োজনে লাগে বা ব্যবহারে লাগে তাতে বয়স্কদের আগ্রহ বেশী থাকে। কিন্তু শিশু বা কিশোররা প্রয়োজনীয়তার ধার ধারে না। খেলা তাদের কি কাজে আসবে তা তারা কখনও প্রশ্ন করে না। তাদের উৎসাহ হচ্ছে শুধু কাজ করায় আর সাফল্যের সঙ্গে করায়। গণিত পছন্দ করা না করা নির্ভর করে যে গণিত তাদের করতে দেওয়া হয়েছে তা পারা না পারার ওপর।

গোড়ার দিকে বিমূর্তভাবে অঙ্ক করানোর বিরুদ্ধে যথেষ্ট মতবাদ রয়েছে। কতকগুলি সূত্র ইত্যাদির ব্যবহার, যুক্তি দিয়ে প্রমাণের ওপর জোর দেওয়া, এ সবের অর্থ গোড়ায় তারা বোঝে না। বিমূর্তভাবে অঙ্ক তখনই করানো হবে যখন নাকি তারা এতে উৎসাহ বোধ করবে। সেজন্য সর্বদেশই এখন একমত যে, গোড়ায় বিমূর্ত গণিতের পরিবর্তে মূর্ত গণিত শেখানো হবে এবং যাতে তারা আগ্রহ বোধ করে সেরকম কাজের ভেতর দিয়ে শেখাতে হবে।

পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে আর একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সে হচ্ছে গণিতের বিভিন্ন শাখার ভেতর একটি সংযোগ স্থাপন। সাধারণতঃ অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি এমনভাবে শেখান হয় যেন এসব একটি থেকে আর একটি একেবারে পৃথক। বিভিন্ন শাখার ভেতরে যে সংযোগ রয়েছে তা বোঝা দরকার। সুতরাং পরীক্ষামূলক কাজের ভেতর দিয়ে যদি গণিত শেখা যায়, তবে এই সংযোগ ভালভাবে বোঝা যায়। তা ছাড়া পরীক্ষামূলক কাজের ভেতর দিয়েই গণিতের সৃষ্টি, সুতরাং পরীক্ষামূলক কাজের ভেতর দিয়েই গণিত শিক্ষা স্বাভাবিক হয়।

এই পদ্ধতি অনুসারে কয়েকটি জিনিসের ওপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন যতটা সম্ভব মূর্ত জিনিস নিয়ে আরম্ভ করতে হবে এবং পরস্পর সম্পর্ক রেখে গণিতের বিভিন্ন অংশ পড়াতে হবে। কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ প্রস্তাব বা প্রতিজ্ঞা স্বীকার করে নিয়ে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ যেসব জিনিস স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে সে সবের প্রমাণের জন্য বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই। নানাভাবে প্রমাণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরিজ্ঞান দিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং নানাভাবে মেপেও পরীক্ষার চেষ্টা চলতে পারে। রেখাচিত্রের ভেতর দিয়ে অনেক কিছু শেখা বা বোঝা যেতে পারে। প্রত্যেকে কতকটা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে পারে—ইচ্ছা করলে দলগতভাবেও করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন ও পরিচালনা করবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, দুই বাহু ও তাদের অন্তর্ভূত কোণের মাপ দেওয়া থাকলে যে ত্রিভুজটি আঁকা যায় তার পরীক্ষা স্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে একটি সমস্যা ধরা যেতে পারে। একটি খাম দেওয়া আছে। ঠিক একই মাপের আরও ২৫।৩০ খানা খাম বানাতে হবে। তার এক উপায় হচ্ছে খামের ফ্ল্যাপগুলি সব খুলে নিয়ে খোলা অবস্থায় কাগজের ওপর ফেলে এঁকে কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়া।

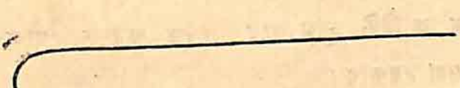
কিন্তু শিক্ষার্থীদের বলা যেতে পারে যে ঐ ভাবে না করে তাদের কয়েকটি মাপ দেওয়া হবে সেই অনুসারে তারা নক্শাটি আঁকবে। আয়তক্ষেত্রটির



চারি বাহুর মাপ দেওয়া হলে তারা আয়তক্ষেত্রটি আঁকতে পারে। তারপর আয়তক্ষেত্রটির সংলগ্ন ত্রিভুজের একটি বাহুর মাপ ও সেই বাহু ও তৎসংলগ্ন আয়তক্ষেত্রটির বাহুর অন্তর্ভূ্ত কোণের মাপ দেওয়া গেলে, তারা অনায়াসেই সেই ত্রিভুজটি এঁকে ফেলতে পারবে। এইভাবে ফ্ল্যাপের চারটি ত্রিভুজই আঁকা হয়ে যাবে। পরে শিক্ষার্থীরা কেটে নিয়ে পর পর ফেলে মিলিয়ে দেখবে যে তাদের নক্শাগুলি সব সমান হয়েছে। সুতরাং তারা এই ধারণা পাবে যে দুই বাহু ও তার অন্তর্ভূ্ত কোণ দেওয়া থাকলে একই মাপের ত্রিভুজ আমরা যে-কোনও স্থানে আঁকতে পারি।

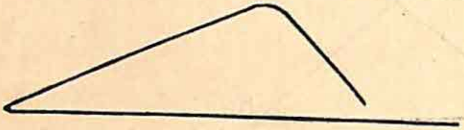
ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান। ইহা পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেকে ত্রিভুজ এঁকে মেপে দেখতে পারে। তারপর তিনটি কোণা কেটে পাশাপাশি রেখে দেখতে পারে যে কোণা তিনটি পাশাপাশি রাখলে একটি সরল কোণের সৃষ্টি করে।

ত্রিভুজের দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু থেকে বড় পরীক্ষা করার জন্য একটি চুলের কাঁটা নেওয়া যেতে পারে। কাঁটাটির দুই বাহুই সমান। একটি বাহুকে

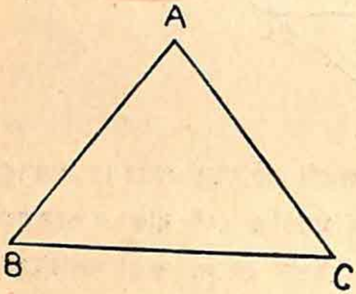


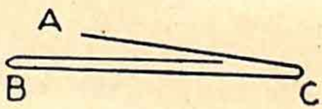
স্থির রেখে আর একটি বাহুকে বাঁকা করে নিয়ে একটি ত্রিভুজ তৈরির চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু দেখা যাবে যে ত্রিভুজ তৈরি করা যায় না।

স্থির বাহুটির শেষ সীমা খানিকটা বাদ পড়ে যায়। অর্থাৎ একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু একত্রে তৃতীয় বাহুর সমান হতে পারে না। একটি বাহুকে ভূমি ধরে ত্রিভুজ করতে গেলে কাঁটার অপর বাহুটি ভূমির থেকে বড় হওয়া দরকার।



কাঁটাটিকে খুলে একেবারে সোজা করে নিয়ে এই লম্বা কাঁটাটি দিয়ে একটি ত্রিভুজ তৈরি করা যায়। এই ত্রিভুজটির দুইটি বাহু AB, AC আবার বাঁকা

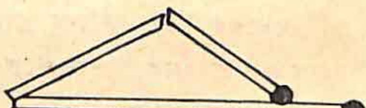




করে নিয়ে BCর ওপর ফেলতে চেষ্টা করলে দেখা যায় এই দুই বাহু একত্রে BC থেকে অনেক বড় হয়ে যায়।

দুইটি দিয়াশলাই কাঠি নিয়েও পরীক্ষা করা যায়। দেখে নিতে হবে যেন কাঠি দুইটি সমান হয়। একটিকে ত্রিভুজের ভূমি হিসেবে রেখে আর অন্যটিকে





মাঝখানে আধভাঙ্গা করে নিয়ে একটি ত্রিভুজের আকারে আগের কাঠিটির ওপর বসাতে চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে ভূমির খানিকটা বাদ পড়ে যায়। দ্বিতীয় কাঠিটি যদি প্রথম কাঠি থেকে ছোট নেওয়া যায় তা হলে ভূমির আরও বেশী অংশ বাদ থেকে যায়। প্রথম কাঠিটি ভূমি করে ত্রিভুজ করতে গেলে দ্বিতীয় কাঠিটি প্রথমটি থেকে বড় হওয়া দরকার।

একরোখা যুক্তিযুক্ত প্রণালী (The dogmatic method)—বিশ্লেষণ বা যুক্তির ওপর খুব জোর না দিয়ে ব্যক্তিগত প্রবল বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি

করে যে পদ্ধতি তাকেই বলে dogmatic method। এঁদের মতে কঠোরতা এবং চরম যাথার্থ্যই হচ্ছে গণিত শিক্ষার একমাত্র বিশেষত্ব। এই লক্ষ্য থেকে একটু সরে গেলেই গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গণিতের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতে হলে পুনঃ পুনঃ চর্চার দরকার এবং শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলে মডেল ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ নাড়াচাড়া করে দেখা দরকার।

কিন্তু এ ধারণাও অনেকে সমর্থন করেন না যে শুধু বার বার একটি জিনিস পড়লেই সে বিষয় ভাল বোঝা যায়। নিজস্ব চিন্তা ছাড়া কোনও জিনিসই তলিয়ে বোঝা যায় না।

সঠিক ও যথার্থ চিন্তাই গণিত শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে এ বিষয়ে বেশী গোঁড়ামি ভাল নয়। এত চরম কঠোরতার ওপর জোর দেওয়া উচিত নয় যাতে বিষয়টি শিক্ষার্থীর কাছে অবোধ্য হয়ে ওঠে। যে মডেল শিক্ষার্থী বোঝে না, সে রকম মডেল নাড়াচাড়া করায় তার বিচারশক্তি বাড়ে না কিংবা সঠিক চিন্তাও সে করতে শেখে না। সে শুধু অঙ্কের লিখিত ধারণা পুনরুক্তি করে। এইভাবে শেখার চেষ্টায় সে ধীরে ধীরে গণিতে আগ্রহ হারায় এবং গণিত সম্বন্ধে তার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যে সব শিক্ষার্থীর সত্যিকারের গণিতের ক্ষমতা নাই কিন্তু স্মরণশক্তি প্রখর থাকে তাদের গণিতজ্ঞ বলে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইউক্লিডের জ্যামিতির ভেতর এই গোঁড়ামির ভাব দেখা যায়। বিন্দু, রেখা প্রভৃতির সূত্র দিয়ে আরম্ভ করে, কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধকে স্বীকার করে নিয়ে অবরোহী প্রণালীতে জ্যামিতির উপপাদ্যগুলি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। ভুল-ভ্রান্তির ভেতর দিয়ে পরীক্ষা করে লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টার অবকাশ এখানে নেই। গাণিতিক সঠিকতার ওপর সর্বদাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যারা শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে চান তাঁদের মতে শিক্ষার্থী এই বয়সে অত সঠিকতার মূল্য বোঝে না। এই সময় সঠিকতার ওপর বেশী জোর দিলে মনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করা হবে। ফলে এই হবে যে শিক্ষার্থীর মনে বিষয়টিতে আগ্রহের পরিবর্তে বিতৃষ্ণাই জন্মাবে।

বক্তৃতা পদ্ধতি—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বক্তৃতা পদ্ধতি খুব ফলপ্রসূ নয়। অনেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী আছেন যাঁরা কলেজের বক্তৃতার মতন নিজের মনে পড়িয়ে যান। কোনও প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করেন না যে শিক্ষার্থীরা সত্যিই

মন দিচ্ছে কিনা। নিজের মনে বোর্ডে বীজগণিত, জ্যামিতি, অঙ্ক প্রভৃতি কষে যান, শিক্ষার্থীরা চুপ করে বসে দেখে ও শোনে। উচ্চশিক্ষার কালে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা চুপ করে একভাবে বসে অতক্ষণ শুনতে পারে না। তাদের মনোযোগ চলে যায়। অবশ্য এই পদ্ধতির সুবিধাও আছে। অল্প সময়ে অনেকখানি পড়ানো যায়। শ্রেণীতে যদি শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশীও হয় তাতে কিছু অসুবিধা হয় না। বিষয়টি বেশ ধারাবাহিকভাবে শেখানো যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে এই নিয়ম অনুসারে পড়ানো সুবিধাজনক। শিক্ষক কিছু বলে যান আর শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করে। এই রকম তথ্যসংগ্রহ সত্যিকারের গণিত শিক্ষা নয়। গণিতে যদি কোনও জায়গায় শিক্ষার্থী ঠেকে যায় ও না বোঝে—তবে তার পরের বিষয়টি তার পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে সময় ধারাবাহিক-ভাবে সব বুঝতে পারে না।

অঙ্ক

অঙ্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য

গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে অঙ্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধেও তা-ই প্রয়োজ্য। কারণ অঙ্ক গণিতেরই একটি অংশ। কতকগুলি চিন্তার ধারা, তাতে দক্ষতা ও তার ব্যবহার এই হচ্ছে অঙ্ক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ করে ব্যবসায়ক্ষেত্রে কতকগুলি মানসিক ক্রিয়ায় দক্ষতা থাকা চাই। অঙ্কের গোড়ার এবং প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এই দক্ষতা-অর্জনে সাহায্য করা। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। সব বিষয়েই আন্দাজ করতে হয়, তুলনা করতে হয়। সংখ্যা নিয়ে সহজ, জটিল ইত্যাদি সব রকম কারবারই করতে হয়। অঙ্ক এ সব ব্যাপারে প্রধান সহায়ক। বয়স্করা সংখ্যা নিয়ে যা কারবার করেন তার শতকরা ৯০ ভাগ হচ্ছে চারটি মূল ক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত—যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ। এর সঙ্গে যদি সরল ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশ এই দুটি যোগ করা যায় তবে বলা যেতে পারে যে শতকরা ৯৫ ভাগ কাজ এই ৬টিকে অবলম্বন করেই চলে। সুতরাং চর্চার দ্বারা এই ক্রিয়াগুলিকে আয়ত্তে আনাই হচ্ছে বিদ্যালয়ে অঙ্ক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুসারে এই চর্চা কতকগুলি সমস্যামূলক অঙ্কের সমাধানের ভেতর দিয়েও হতে পারে।

কৃষ্টির দিক দিয়ে অঙ্ক অনেক সাহায্য করে। যা চরম ও পরম সত্য তার সঙ্গে অঙ্ক যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়। বিশ্লেষণমূলক যুক্তিতেও অঙ্ক সাহায্য করে আর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য কতকগুলি অভ্যাস গঠনে সাহায্য করে। Lindquist বলেন যে প্রত্যেকেরই তো অঙ্কের ওপর দখল থাকা দরকার। সুদক্ষ যান্ত্রিক, আধুনিক কৃষক, নানারকম পেশাদার লোক, ব্যবসায়ী, সুদক্ষ গৃহকর্ত্রী ইত্যাদি সকলেরই অঙ্ক জানা দরকার। অবশ্য তাই বলে এ কথার অর্থ নয় যে অঙ্ক জানলে তবেই গৃহকর্ত্রী খুব সুস্বাদু রান্না করতে পারবেন। তবে এটা ঠিক যে তিনি ব্যয়-বরাদ্দ, রান্নার উপকরণ ইত্যাদি হিসাব মত করতে পারবেন। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে যে অঙ্কের প্রয়োজন এবং

সেজন্য পাঠ্যক্রমে যে তার স্থান দেওয়া দরকার সে কথা এখন সকলেই বোঝেন। কিন্তু খুব যত্ন সহকারে যদি পাঠ্যক্রম নির্বাচন করা যায় তবে অঙ্কের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক কর্মপ্রবাহেরও কিছু ধারণা পেতে পারে। সাধারণতঃ সমস্যা সব দেখা হয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, সৌন্দর্য, কলা ইত্যাদির দিক থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সব সমস্যা পরিমাণের দিক থেকেও দেখা দরকার।

অঙ্ক মানসিক শৃঙ্খলা আনতে সাহায্য করে—এ বিষয়ে অনেকেই একমত। তাঁদের বিশ্বাস যে অঙ্ক বিচারের ক্ষমতা, যুক্তির ক্ষমতা, মনোনিবেশ ও বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতায় সাহায্য করে।

এই আলোচনা থেকেই বেরিয়ে আসে যে শিক্ষয়িত্রী যখন অঙ্ক শিক্ষা দেবেন তখন তিনি কি উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা দেবেন। প্রথম হচ্ছে যে তিনি গণিতের ধারায় চিন্তা করতে শেখাবেন। তারপর সঠিক গণনা যাতে করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য দেবেন। এ জগতের যে একটা পরিমাণের দিক আছে সেদিকে তার আগ্রহ জন্মাতে চেষ্টা করবেন। অঙ্কের কতকগুলি কার্যকরী প্রয়োগ কি ভাবে করা যায় সে বিষয়ে ধারণা দেবেন। তারপর ভবিষ্যতে যাতে সে গণিত সম্বন্ধে আরও জানতে চায় সে রকম ভাবে তাকে তৈরি করে দেবেন। সুতরাং বিদ্যালয়ে অঙ্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য যে শুধু কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করা, নিয়ম আয়ত্ত করা বা মনের শৃঙ্খলায় সাহায্য করা তা নয়। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনে বিষয়টি সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার করে দেওয়া যাতে সে এই বিষয়টি সম্বন্ধে আরও জানবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অঙ্ক শিক্ষা

বিদ্যালয়ে আসার বহু আগে থেকেই শিশুর অঙ্কের জ্ঞান আরম্ভ হয়। একটি সন্দেশের থেকে ভেঙ্গে যদি এক টুকরো আর কাউকে দেওয়া যায় তবে সে কেঁদে গড়াগড়ি দেবে, ঐ ভাঙ্গা সন্দেশ সে নেবে না—অর্থাৎ তার জ্ঞান হয়েছে যে আস্ত সন্দেশটি ভাঙ্গা সন্দেশের থেকে বেশী। এই যে বেশী, কম, বড়, ছোট, ভারী, হালকা, এইসব ধারণা নিয়েই তো অঙ্কের কাজ, এ সব ধারণা সে কোনও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বা মা-বাবার কাছে পায়নি, সে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছে। সুতরাং জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শেখাটাই হচ্ছে শিখবার স্বাভাবিক উপায়।

অঙ্কের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে অঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে মনুষ্য-সমাজের প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে। দাগ কেটে হিসাব রাখা, হিসাব মিলানো, তুলনা করা, একই প্রকার জিনিসকে দলভুক্ত করা, গোণা-গাঁথা—এই সবই মানুষের কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। আদিম মানুষ যে অঙ্কের কিছু আবিষ্কার করেছে তা নয়, তারা অঙ্কের ভেতর দিয়েই জীবন যাপন করেছে।

ঐতিহাসিক যুগেও আমরা দেখি মানবের সেবাতেই অঙ্কের সৃষ্টি। জিনিসের পরিমাণ বুঝবার জন্য এককের প্রয়োজনীয়তা মানুষ বোধ করলো—তখন এক খণ্ড পাথর বা একটি পাত্রে জল ভরে তাকেই একক বলে ধরে নিল। দৈর্ঘ্য মাপের প্রয়োজন তাই শরীরের একটি অংশকে একক বলে মেনে নিল। প্রয়োজনের তাগিদে ভগ্নাংশের সৃষ্টি হোলো—শূন্যের ধারণা আনতে হোলো, মনুষ্য-সমাজের প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে গিয়েই এ সবের সৃষ্টি। স্বর্ণখনির আবিষ্কারের মত যে এ আবিষ্কার তা নয়। ক্রমে ক্রমে এর বিকাশ হয়েছে—উদ্ভব হয়েছে।

অঙ্ক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। জ্যোতি-বিদ্যা আরম্ভ হয় ব্যাবিলন দেশে। অঙ্কের সাহায্য না পেলে মেসোপটে-মিয়ার নক্ষত্র-দর্শকেরা উদাসভাবে নির্বোধের মত নভোমণ্ডলের দিকে হতবাক্ হয়ে তাকিয়েই থাক্‌তো—আর মেষপালকই থেকে যেতো। জরিপ আরম্ভ হয়েছে মিসর দেশে। অঙ্কের সাহায্য না পেলে নীল নদের দেশের কৃষকেরা প্রতি বৎসর তাদের কৃষিক্ষেত্রের সীমা হারাতো আর লুঠতরাজ, যুদ্ধ ইত্যাদি করে তাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা কোরতো। ধর্মমন্দির সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে নানাপ্রকার সংখ্যারাশির সৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যার সাহায্যেই হিসাব লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। পঞ্জিকার সৃষ্টি হয়েছে। টাকা, পয়সা, মুদ্রা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। অঙ্কের সাহায্যেই কর ধার্য করা সম্ভব হয়েছে ও দেশে সুশাসনের ব্যবস্থা করা গিয়েছে। জিনিসের সঙ্গে জিনিস বিনিময়ের পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন সম্ভব হয়েছে। সুতরাং সমাজের উন্নতির গোড়ায় ও সংস্করণের মূলেই রয়েছে অঙ্ক। আর বর্তমানে অঙ্ক আরও বেশী সমাজ-সংস্করণে সাহায্য করেছে।

অঙ্ক যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানও সেরকম অঙ্কের ওপর আবার প্রভাব খাটিয়েছে। অঙ্ক বলতে

আমরা এর তুরকম অর্থ বুঝি—এক হচ্ছে কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, আর এক হচ্ছে একটি সংগঠিত জিনিস যার অবয়ব হচ্ছে কতকগুলি পদ, প্রতিজ্ঞা ও যুক্তি। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অঙ্ক বলতে নিয়মের সমষ্টিই বুঝায়। কিন্তু গ্রীক রোমানদের সমাজে যখন কায়িক পরিশ্রমকে একটু হীন চক্ষে দেখা হোতো এবং বৌদ্ধিক, কলা, বা অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র শুধু দার্শনিকদের একচেটিয়া ছিল—তখন দার্শনিকরা সংখ্যা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। সংখ্যাকে কেন্দ্র করে কৃষ্টিগত অনেক চর্চা হয়েছে এবং সংখ্যার রহস্য চিন্তাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এঁদের মতে সংখ্যার লক্ষ্য শুধু সমাজ-সেবা নয়—এর লক্ষ্য আরও উচ্চতর। শূন্যের অর্থ বার করা, শূন্যকে সংখ্যার পর্যায়ে স্থান দেওয়া হিন্দু দার্শনিকদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। গ্রীকরাও চেষ্টা করে পারেননি। ধর্ম ও দর্শনের ভেতর দিয়ে এই শূন্যের আবিষ্কারের ফলে হিন্দুরা জগতে অমর হয়ে থাকবেন সন্দেহ নেই।

সুতরাং দেখা যায় অঙ্ক যেমন সমাজের সেবায় সাহায্য করেছে, সমাজও যুগে যুগে অঙ্ককে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে অঙ্ক অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সেজন্য অঙ্ক শিক্ষা যদি কার্যকরী করতে হয় তবে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শেখাতে হবে। সমাজে যে কর্মপ্রবাহ রয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শেখাতে হবে। শিক্ষার্থী যেন বুঝতে পারে যে অঙ্কশিক্ষা জীবনের থেকে আলাদা কিছু নয়। সমাজের জীবনপ্রবাহের ভেতরেই আছে অঙ্কশিক্ষা।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে অঙ্কশিক্ষা কার্যকরী করতে হলে তিনটি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে—(১) শিক্ষার্থীর আগ্রহ, (২) শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, (৩) শিক্ষার্থীর প্রয়োজন-বোধ।

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায় কাজে। কাজ করতে সে ভালবাসে। কাজেই সে আনন্দ পায়। তার ভেতর রয়েছে অতিরিক্ত উদ্যম সেজন্য সে চায় অফুরন্ত দৈহিক কাজ। সুতরাং কাজের ভেতর দিয়ে শেখালে সে অঙ্কে আগ্রহ বোধ করবে—শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী ইঙ্গিতে শিক্ষার্থীকে নতুন কর্মক্ষেত্র দেখিয়ে দেবেন যার ভেতর দিয়ে সে অর্জন করতে পারবে অঙ্কের জ্ঞান। মনঃপ্রাণ দিয়ে যেন কাজ করে সে ভাবে উৎসাহ দেবেন। এইভাবে কাজ করলে সে সেই কাজের উদ্দেশ্যে বুঝবে—

তার প্রয়োজনীয়তা বুঝবে ও তার ব্যবহারিক মূল্য বুঝতে পারবে। কাজেই অঙ্ক তার কাছে গতানুগতিক কাজ বলে মনে হবে না। জ্যামিতি বা অঙ্ক তার কাছে নীরস শুষ্ক বলে মনে হবে না। কারণ সে বুঝবে যে ব্যবহারিক পরিস্থিতিতে এই অঙ্ক তাকে কিভাবে সাহায্য করবে। নিজে পরীক্ষা করে সে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করবে কাজেই সে জ্ঞান তার কাছে মূর্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং শিক্ষার্থীর চারদিকে যে কর্মপ্রবাহ রয়েছে তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, জীবন্ত সত্য অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী তার জ্ঞানলাভ করবে—আর শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তাকে পরিচালক হিসাবে সর্বদাই সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এগিয়ে চলবে। সবাই সমান গতিতে চলবে তা আশা করা যায় না। কেউ তাড়াতাড়ি এগোবে, কেউ ধীরে ধীরে—প্রত্যেককে তার ক্ষমতা অনুযায়ী চলবার জন্য সুযোগ দিতে হবে।

সংখ্যাজ্ঞান

অঙ্কের কোনও বিষয়ের ধারণা দিতে হলে বা কোনও নতুন নিয়ম শেখাতে হলে ৪টি ধাপের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।—

(১) দৈনন্দিন জীবনের কাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের ভেতর দিয়ে,

(২) মূর্ত (concrete) জিনিস নাড়াচাড়া করে,

(৩) শুধু বিমূর্ত (abstract) সংখ্যা নিয়েই চর্চা,

(৪) নিয়ম খাটিয়ে সমস্যামূলক অঙ্কের সমাধান ও চর্চা।

অঙ্কের মূলে রয়েছে সংখ্যা। এই সংখ্যাজ্ঞান যদি ঠিকমত না হয় তবে অঙ্কের গোড়া থেকে যায় কাঁচা। প্রত্যেকটি সংখ্যার পেছনে যে জীবন্ত সত্য রয়েছে তা যেন শিশু বুঝতে পারে। সে যেন না মনে করে যে সংখ্যা হচ্ছে কতকগুলি অর্থহীন শব্দ। যে সব কাজের ভেতর দিয়ে সংখ্যাজ্ঞান হতে পারে তা হচ্ছে—

(১) বইএর পৃষ্ঠা দেখা, গোণা ও বার করা,

(২) ঘড়ি যখন বাজবে তার টং টং শব্দ গোণা,

(৩) বাড়ীর নম্বর বা গাড়ীর নম্বর পড়া,

(৪) ক্যালেণ্ডার পড়া ও ক্যালেণ্ডার তৈরি,

(৫) সপ্তাহে দিনের সংখ্যা ও নাম পড়া,

(৬) শ্রেণীতে কতজন শিশু উপস্থিত বা অনুপস্থিত তা গুণে বলা,

(৭) শেল্‌ফে বই সাজানো থাকলে তা গোণা অথবা লাইব্রেরীর বই গুণে বার করে দেওয়া ও তুলে রাখা,

(৮) ক্লাসে পেন্সিল, খাতা, কাঁচি, তুলি, রং ইত্যাদি গুণে দেওয়া ও তোলা,

(৯) ঘড়ির ওপর যে সংখ্যা থাকে তা গোণা,

(১০) ক্লাস ঘরের দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক ইত্যাদি গোণা,

(১১) ক্লাসে ছেলেদের সংখ্যা গোণা ও বাড়ীতে পরিবারের লোক গোণা,

(১২) সময় বলা,

(১৩) বয়স নিয়ে আলোচনা,

(১৪) জন্মদিনের তারিখ আলোচনা,

(১৫) কে কোন্ সারিতে কতজনের পরে বসে তা গুণে বলা,

(১৬) দোকানঘর করে তার জিনিসের ও দামের আলোচনা,

(১৭) রুলার ও গজকাঠির সংখ্যা গোণা,

(১৮) পয়সা, আনি, দুআনি, টাকা ইত্যাদি দিয়ে খেলা,

(১৯) অর্গ্যান, পিয়ানো বা হার্মনিয়ামের সাদা ও কালো চাবি গোণা,

(২০) সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের স্থানের মান ঠিক করা,

(২১) ওজন—কে কতটা বেড়েছে বা কমেছে,

(২২) প্রত্যেকের উচ্চতা মাপা,

(২৩) টিফিনের সময় ক'জন বসেছে—ক'খানা প্লেট লাগবে ইত্যাদি গোণা,

(২৪) বাগানে গাছ লাগালে বা বীজ লাগালে ক'টা লাগানো হোলো তাই গোণা,

(২৫) কোনও নিমন্ত্রণে কতজন আসবে, কি কি খাওয়া হবে, কতটা করে জিনিস লাগবে এই সব গোণা,

(২৬) গল্প ও ছড়া—৩ ভালুকের গল্প, ৫ কাঠবিড়াল, ৭ হাঁস ইত্যাদির গল্প,

(২৭) নানা রকম খেলা—যথা dominoর বিন্দু গোণা ; বল লাফানো গোণা ; দড়ি লাফানো ; slideএ চড়া ; seesawতে কতজন উঠেছে ; দোলনায় কতবার দোল খেয়েছে ; বৃত্ত করে খেলা, খেলার দলের সংখ্যা, তেঁতুল বিচির ব্যাগ দিয়ে খেলা, মেঝেতে দাগ কেটে তার ওপর গুটি বা ব্যাগ ছুড়ে খেলা ; quoits দিয়ে খেলা ; তাসের খেলা ; skittle খেলা ইত্যাদি।

অভিজ্ঞতা দুই রকম হয়।—এক হচ্ছে সত্যিকারের জীবনের অভিজ্ঞতা—এর আগে যার উল্লেখ করা হয়েছে ; আর এক হচ্ছে সত্যিকারের অভিজ্ঞতা নকল করে কল্পনা করে খেলা—যেমন দোকান দোকান খেলা, খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান ইত্যাদি। পুতুল নিয়ে নানা রকম খেলা—পুতুলের সংসার, পুতুলের হাট, ফুলের দোকান, ফলের দোকান, মুদী দোকান, পোস্ট অফিস, পুতুলের লণ্ড্রী, খেলনার দোকান, বাস্, ট্রাম, ট্রেন ইত্যাদি কল্পনা করে খেলা।

এইভাবে বিভিন্ন একক নিয়ে খেলার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন এককের সঙ্গে পরিচয়ও হবে আবার সংখ্যাজ্ঞানও হবে। যেমন দোকান দোকান খেলার ভেতর দিয়ে টাকা, আনা, পয়সা ইত্যাদি ব্যবহার, কাগজ দিয়ে রিবন বা ফিতে তৈরি করে সেই ফিতে হাত হিসেবে মেপে বা গজকাঠি দিয়ে মেপে বিক্রি করা—জলের মধ্যে একটু সাদা রং মিশিয়ে দুধের রং করে তারপর পোয়া ওজন দিয়ে এক পোয়া, দুই পোয়া করে মাপা, ছোট ছোট খেলার দাঁড়িপাল্লা নিয়ে এক পোয়া, দুই পোয়া করে জিনিস মাপা, ঘড়িতে এক, দুই করে মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি গোনা।

এইভাবে জীবনের সত্যিকারের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই হোক্ বা সত্যিকারের অভিজ্ঞতার নকল করেই হোক্, কাজের ভেতর দিয়ে সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হবে।

তারপর মূর্ত জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া ও চর্চা করে সংখ্যাজ্ঞান দৃঢ় হবে।

অঙ্কের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে বহুদিন পর্যন্ত মানুষ কাঠির সাহায্যে সংখ্যা হিসাব করতো। শিশুদের চর্চার জন্যও যদি কাঠির টুকরো ব্যবহার করা যায় তবে তারা ভাল বুঝতে পারবে। তারপর তেঁতুল বিচি, নানারকম ছবি যেমন ৭টি ফুল আঁকা আর লেখা '৭', মাটির খেলনা ইত্যাদি মূর্ত জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করলে সংখ্যাজ্ঞান ক্রমশ স্পষ্ট হবে।

মূর্ত জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়ার পর বিমূর্ত সংখ্যা লেখা ও পড়ার ব্যবস্থা করা হবে। '৩', '৭', '২' ইত্যাদি সংখ্যা লেখা ও কার্ডে আঁকা ছবি একসঙ্গে দেখলে মূর্ত ও বিমূর্ত সংখ্যার ভেতর সংযোগ স্থাপন হবে ও ধীরে ধীরে শিশু মূর্ত ছেড়ে বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে উৎসাহ পাবে। তখন '৬', '৭' ইত্যাদি সংখ্যা তার কাছে অর্থহীন সংখ্যা বলে মনে হবে না। সে বুঝবে যে এর পেছনে কি সত্যি রয়েছে।

লেখার বিষয় বলা যায় যে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন আর শিশুদের ঐ সংখ্যাগুলি লিখতে না বলে বলবেন ছবি আঁকতে। ছবি আঁকতে বললে তারা বেশী উৎসাহ পায়। Sand-paperএ সংখ্যাগুলি কেটে তার ওপর হাত বুলাতেও বলতে পারেন। পুরাতন যুগে যখন লিখবার মত কাগজ, শ্লেট বা কোনও সরঞ্জাম ছিল না, তখন মানুষ বালুর ওপর আঙ্গুল চালিয়েই এই সংখ্যা লিখে আঁক কষতো। তারপর ধীরে ধীরে মোমের ফলকের আবিষ্কার হলো। মোমের ফলকের ওপর লেখা বহুদিন চলেছিল। শেষে মধ্যযুগের শেষভাগে বালি ও মোমের ফলকের পরিবর্তে আবিষ্কৃত হলো শ্লেট। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কাগজের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বালি ও মোমের ফলক লুপ্ত হলো। কাগজের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কের গোনা-গাঁথার কাজ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। সুতরাং বালির ওপর লেখা আরম্ভ করলে তা কিছু অস্বাভাবিক হবে না। বরং শিশুরা আনন্দই বোধ করবে।

আঙ্গুলে গোনা অভ্যেস প্রায় প্রত্যেকেরই দেখতে পাওয়া যায়। এই অভ্যেস বহু প্রথমে মানুষ আরম্ভ করেছিল সেই সময় যখন লিখবার জন্য কোনও জিনিস পাওয়া যেত না। আঙ্গুল দিয়ে সংখ্যা উপস্থাপিত করা হতো। বাঁ হাতের ছোট আঙ্গুল থেকে গোনা আরম্ভ হোতো। দৈনন্দিন ব্যবহার্যের জন্য বাঁ হাতই যথেষ্ট ছিল। সেজন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দেখা যায় আঙ্গুলের প্রতীক দিয়ে বড় বড় সংখ্যার নির্দেশ। দুইটি আঙ্গুল বন্ধ করে আর ৩টি আঙ্গুল খোলা রাখলে সে একটি সংখ্যা নির্দেশ করবে এইরূপ। আঙ্গুলের সংখ্যা-সংকেত থেকে আরম্ভ হলো আঙ্গুলেই গোনার কাজ। শেষ পর্যন্ত আঙ্গুল দিয়ে ছোটখাট গুণের কাজ পর্যন্ত সমাধা করা হোতো—যেমন ৭×৮ তার জন্য বলা হোতো এক হাতের ২টি আঙ্গুল তুলতে হবে ও অন্য হাতের ৩টি আঙ্গুল তুলতে হবে $\begin{pmatrix}\text{কারণ ৫+২=৭}\\ \text{ও ৫+৩=৮}\end{pmatrix}$। তারপর দুহাতের তোলা আঙ্গুল কয়টি যোগ করতে হবে। অর্থাৎ ২+৩=৫; আর যাদের তোলা হয়নি তাদের গুণ করতে হবে, যেমন ৩×২=৬; ৫ হচ্ছে দশক অর্থাৎ ৫ দশ অথবা ৫০, আর ৬ হচ্ছে একক। সুতরাং গুণফল হোলো ৫০+৬=৫৬। ৮×৯ বার করতে হলে $\begin{pmatrix}\text{৫+৩=৮}\\ \text{৫+৪=৯}\end{pmatrix}$ সেজন্য এক হাতে ৩টি আঙ্গুল ও অন্য হাতে ৪টি আঙ্গুল তুলতে হবে। সুতরাং হবে ৩+৪=৭ দশ আর এক

হাতের ২ আঙ্গুল অন্য হাতের ১ আঙ্গুল ২×১ গুণ করলে হবে ২। সুতরাং উত্তর হবে ৭ দশ ২ অথবা ৭২।

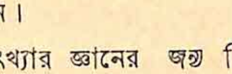
কাজেই দেখা যায় যে আঙ্গুলে গোনার ভেতর দিয়েই গোনা বিষয়টির উন্নতি হয়েছে। সুতরাং আঙ্গুলে অল্প-স্বল্প গোনা কিছু অস্বাভাবিক বা অন্যায়ও নয়। তবে দেখতে হবে যে মূর্ত থেকে বিমূর্তে ধীরে ধীরে নেওয়াই হচ্ছে সংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য। কাজেই আঙ্গুল সহায়ক থাকবে সব সময় কিন্তু আঙ্গুলের সাহায্য না নিয়েও যেন তারা গুনে যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সংখ্যার ক্রমিক অর্থ আছে—যেমন দুই এর পর তিন, তিন এর পর চার, চার এর পর পাঁচ ইত্যাদি। কিন্তু তা ছাড়া এর দলগত অর্থও আছে। অর্থাৎ আমরা সংখ্যাগুলিকে দুই দুই করে, বা তিন তিন করে, বা পাঁচ পাঁচ করে দেখতে পারি। সেজন্য আমরা দেখি জোড়া হিসাবে গোনার প্রথা রয়েছে যাতে দুটি করে দল করা হয়। আবার ১ গণ্ডা, ২ গণ্ডা ইত্যাদি হিসাবের গোনার প্রথা রয়েছে যাতে চারটি করে অথবা পাঁচটি করে একসঙ্গে ধরে গোনা হয়। তারপর দশটি করে ও কুড়িটি করে গোনার রীতিও রয়েছে। আমাদের বর্তমান সংখ্যারাশি দশমিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক কুড়ি, দুই কুড়ি হিসাবে গোনার রীতিও আছে।

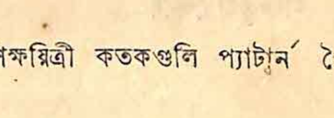
সংখ্যার একটি অনুপাত অর্থও আছে, যেমন ৩=১০−৭=২+১=৬এর ১/২=৩×১। এই অনুপাত অর্থ বুঝবার জন্য চাই চর্চা। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে শিক্ষার্থীদের অনুপাত অর্থ বুঝতে সাহায্য করবেন।

সংখ্যার জ্ঞানের জন্য বিন্দু দিয়ে শিক্ষয়িত্রী কতকগুলি প্যাটার্ন তৈরি করতে পারেন। যেমন—

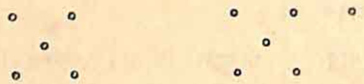
দুই দুই করে



তিন তিন করে



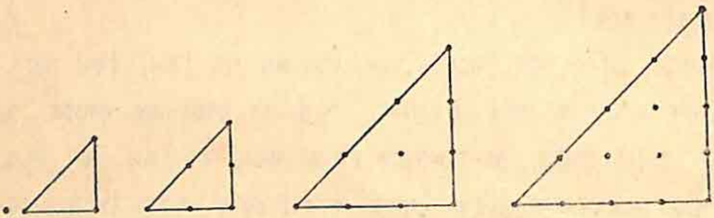
পাঁচ পাঁচ করে



গ্রীকরা আবার সংখ্যাকে জ্যামিতির আকারে সাজিয়ে প্যাটার্ন করতে ভালবাসতেন। যেমন—

(ক)

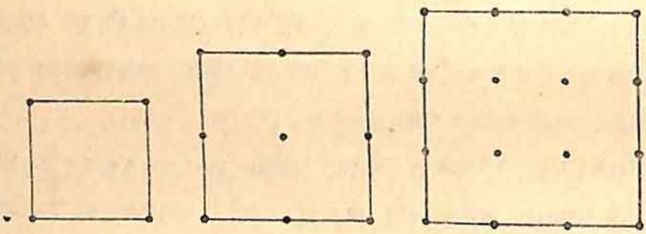
ত্রিকোণাকার প্যাটার্ন



১, ৩,
৬,১০,
১৫,২১.

(খ)

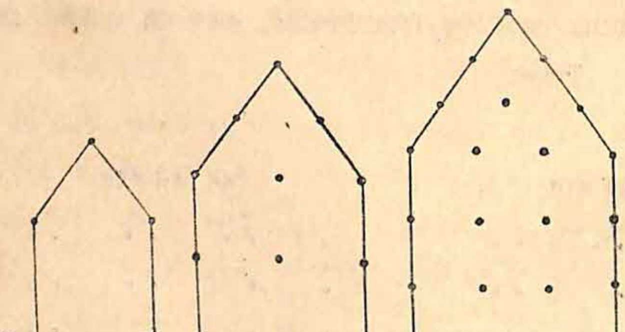
বর্গ সংখ্যা দ্বারা চতুর্ভুজ ক্ষেত্র



১, ৪, ৯,
১৬ … …

(গ)

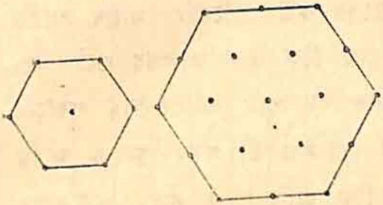
পঞ্চভুজ ক্ষেত্র



১, ৫, ১২,
২২, ৩৫ ….

(ঘ)

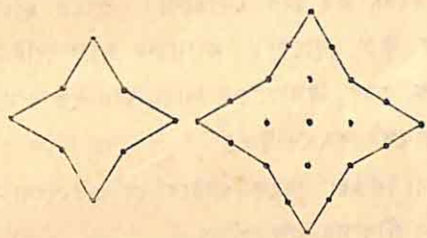
ষড়ভুজ ক্ষেত্র



১, ৭, ১৯, ৩৭ ... ...

(ঙ)

তারকাকৃতি ক্ষেত্র



১, ৮, ২১, ৪০ ... ...

এই সব সংখ্যারাশির প্রকৃতি, গণনা ইত্যাদি নির্ধারণ করতে আমরা এখন নানা উপায় উদ্ভাবন করেছি। গ্রীকরা কিন্তু জ্যামিতির আকারে সাজিয়েই গোনা-গাঁথার কাজ করতেন।

এই গোনা ব্যাপারটি কি করে আরম্ভ হোলো সেই সম্বন্ধে একটু ইতিহাস শিশুদের কাছে গল্প করলে তারা উৎসাহিত হবে ও আনন্দ পাবে। যখন মানুষের ভেড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদি সংখ্যায় বাড়তে লাগলো তখন তাদের হিসাব রাখবার জন্য তার ছড়িতে সে গুনে গুনে দাগ কেটে রাখতো। আর দাগ ধরে ধরে সেই ভেড়া ছাগল আবার মিলিয়ে নিত। যখন সংখ্যায় খুব বেশী হয়ে উঠতো, তখন আর এক দুই করে গোনার ধৈর্য থাকতো না। পাঁচ পাঁচ করে, দশ দশ করে, বা কুড়ি ধরে গুনতো। তাতে সময় সংক্ষেপ হোতো ও সহজ হোতো।

তারপর যখন মানুষ বীজ বুনতে শিখলো আর যখন দেখলো যে তাদের পালিত জন্তুরা বৎসরের একটা বিশেষ ঋতুতে বাচ্চা প্রসব করে, তখন তারা এই ঋতু লক্ষ্য করে তার হিসাব রাখতে আরম্ভ কোরলো। সে লক্ষ্য কোরলো

এক পূর্ণিমার পর থেকে আর এক পূর্ণিমা পর্যন্ত চাঁদ একটু দেরিতে ওঠে ও একটু দেরিতে অস্ত যায় তখন সে চাঁদ ধরে ৩০ দিন করে একত্রে হিসাব করতে লাগলো আর এইভাবে মাসের সৃষ্টি হোলো। মানুষ আরও লক্ষ্য করলো যে আকাশের তারাপুঞ্জ রোজ ঠিক এক জায়গায় ওঠে না, একটু একটু করে সরে যায়। আবার অনেক দিন পরে তাদের সেই পুরানো জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। তখন তারা এই মধ্যবর্তী সময় গুনতে আরম্ভ করে দেখলো যে এর ভেতর প্রায় ৩৬৫ দিন অতিবাহিত হয়। এই ভাবে ৩৬৫ দিন ধরে ধরে তারা বৎসর ঠিক কোরলো।

এক শীতকাল থেকে আর এক শীতকালের ভেতর কয় পূর্ণিমা যায় তাই গুনে গুনে তারা ১২ মাসে এক বৎসর হয় ঠিক কোরলো। সূর্যের ছায়া দেখেও দিন গুনে গুনে বছর ঠিক করা হোতো। মধ্যাহ্নের ছায়া যেদিন সবচেয়ে ছোট হয়, তারপর থেকে ৩৬৫ দিন গুনে তারা বার কোরলো যে ৩৬৫ দিন পর আবার মধ্যাহ্নের ছায়া সেইরকম ছোট হয়।

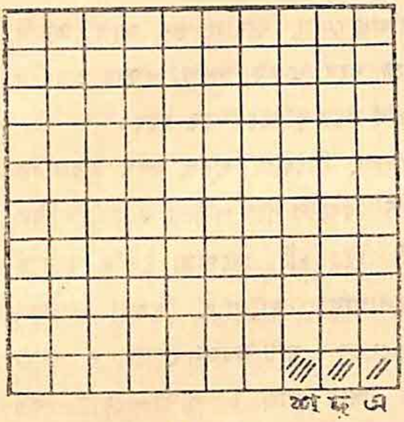
এইভাবে একটু গল্প করে বললে শিশুরা বুঝতে পারবে যে এই সংখ্যাগুলি বিমূর্ত কিছু নয়; এই সংখ্যাগুলি জীবনের সঙ্গে জড়িত।

সংখ্যাজ্ঞানের পর সংখ্যার মান নির্ণয় একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। বিদ্যালয়ে শিশুরা যখন প্রথম আসে তখন তাদের ১, ২ লিখিতে দিলে দেখা যায় যে তারা পর পর ক্রমিকভাবে হয়তো ১০০ পর্যন্ত লিখে যাবে। কিন্তু মাঝখান থেকে যদি বলা যায় ৩৭ লিখতে তবে হয়তো লিখবে ৭৩। কারণ ৭ এর অর্থ কি বা ৩ এর অর্থ কি তা তারা স্পষ্ট বোঝে না। তারা যখন পড়ে তখন এইভাবে পড়ে—৩ এর পিঠে ৭ সাঁইত্রিশ। কাজেই কার পিঠে কি তা যদি একবার ভুল হয়ে যায় তবে সবই গোলমাল হয়। সেইজন্য একক, দশক জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যেক সংখ্যার মান প্রথম থেকেই ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

একক দশকের ব্যবহার অর্থাৎ সংখ্যাগুলির একটি স্থানীয় মান দেওয়া সেটা হিন্দুদের দ্বারাই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। গণিতে হিন্দুদের এ মস্ত বড় অবদান সন্দেহ নেই।

প্রথমে বোর্ডে ছক কেটে খোপের ভেতর বাঁশের ছড়ি দুইটি, তিনটি বা চারটি এইরকম করে বসিয়ে তাঁরা গুনতেন। দুই একক, তিন দশক, চার

শতক ইত্যাদি। অর্থাৎ নীচের খোপে ছড়িগুলি নির্দেশ করছে ৪৩২।



যদি কোনও ঘরে কোনও ছড়ি না থাকতো তবে বোঝা যেতো যে সেটা হচ্ছে '০'।

গুনবার জন্য বাঁশের ছড়ির ব্যবহারের কথা জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি সব দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। ইউরোপে একরকম টেবিল ব্যবহার হোতো যাকে বলা হোতো ধুলোর টেবিল। শোনা যায় যে এই টেবিলের ওপরের ধুলো নীল আর সবুজ হোতো। কেউ কেউ বলেন জোড়সংখ্যার জন্য নীল ধুলো ব্যবহার করা হতো।

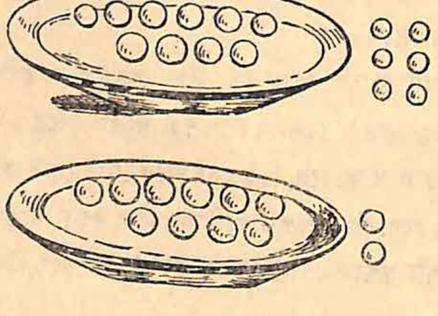
ক্রমে ক্রমে ঘরের এই রেখাগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া হোলো। তাঁরা মনে মনে ঠিক করে নিলেন যে ঘর কাটবার দরকার নেই। প্রথম ডানদিকের সংখ্যাকে একক ও তার বাঁদিকের সংখ্যাকে দশক ও তার বাঁদিকের সংখ্যাকে শতক ধরা যাবে। কিন্তু মুশ্‌কিল হোলো '০' নিয়ে। আগে ঘরে কিছু না থাকলে বোঝা যেত যে '০' আছে কিন্তু এখন ঘর না থাকলে তো তা বোঝানো সহজ হয় না। সেইজন্য হিন্দুরা শূন্যের আবিষ্কার করলেন অর্থাৎ যেখানে কিছু নেই। এখন এই শূন্য কিভাবে লেখা যাবে সে বিষয় নিয়ে নানারকম গবেষণা চলতে লাগলো। প্রথমে ঠিক হোলো একটি বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করা যাবে। কিন্তু তাতে মুশ্‌কিল হোলো যে অনেক সময় অনেকে বিন্দুটি মুছে ফেলে নানারকম গোলমালের সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে লাগলো। তখন শূন্যের জন্য নানারকম আকৃতি দেওয়ার পর ঠিক হোলো '০'—এই আকারে শূন্য প্রকাশ করা যাবে।

এই ইতিহাস বলবার কারণ হচ্ছে যে ঠিক যেভাবে মানুষের মনে একক দশকের ধারণা এসেছে—আর যেভাবে বাঁশের ছড়ি দিয়ে মানুষ একক দশকের ধারণা ধীরে ধীরে লাভ করেছে, ঠিক সেইভাবে ছোট ছোট কাঠি নিয়ে এক একটি কাঠিকে একক ধরে, আর দশটি কাঠিকে একত্র করে নিয়ে বেঁধে দশক বলে ধরে নিয়ে আর দশটি দশকের আঁটি একত্র করে শতক বলে ঠিক করে নিয়ে,

এইভাবে একক দশকের জ্ঞান দিলে দেখা যায় যে, সহজে শিশুরা জিনিসটা বোঝে। তারপর এই জ্ঞান সুদৃঢ় করবার জন্য যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি পদ্ধতি যখন শেখানো হবে, তখন প্রতি পদে পদে একক, দশক, শতক প্রভৃতির ভেতর পার্থক্য পুনঃ পুনঃ আলোচনা করে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

সংখ্যাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই আসবে যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ ইত্যাদির কথা। আগে যা বলা হয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় হবে দৈনন্দিন কাজের ভেতর দিয়ে। মীরা কাল মাটি দিয়ে ৪টি রসগোল্লা তৈরি করেছে আর আজ ৬টি করেছে—মোট কয়টি রসগোল্লা হোলো? শিশুরা এতক্ষণ ১০ জন ক্লাসে ছিল– আরও ৫ জন এসেছে—মোট কয়জন হোলো? কাল সে একখানা বইএর ৯ পাতা পড়েছে আর আজ ৮ পাতা—মোট কয় পাতা পড়া হোলো? এইভাবে সে দেখবে যে সব সময়ই দুইটি সংখ্যার একত্র করার প্রশ্ন আসে। তখন সে বুঝতে পারে যে ৪ + ৫ = ৯ অথবা ৬ + ৭ = ১৩, এগুলোর পেছনে সত্য রয়েছে। এই সংযোগ জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করে। এ যে শুধু বৌদ্ধিক জ্ঞান প্রকাশ করে তা নয়—এ এই গভীর সত্য প্রকাশ করে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন-বোধ থাকলে শিশুরা এতে উৎসাহ ও আগ্রহ বোধ করবে।

সুতরাং কাজের ভেতর দিয়ে যোগ বিয়োগের ধারণা দিতে হবে। কৌশলী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নানারকম কাজের পরিকল্পনা করবেন। যেমন শিশুকে মাটি দিয়ে সন্দেশ তৈরি করতে বলা যেতে পারে। যেই সে দশটি শেষ করবে—তখন সেই সন্দেশগুলিকে একটি থালাতে তুলে রাখতে বলা হবে। ধরা যাক্ প্রথম দিন শিশুটি ১৬টি সন্দেশ তৈরি করেছে আর দ্বিতীয় দিন ১২টি—মোট কত হোলো? দেখা যায় জিনিসগুলি দাঁড়ায় এইরূপ—



২ দশ আর ৮

অর্থাৎ ২৮

দুই থালায় ২ দশ আর খুচরো ৮টি। যদি তৃতীয় দিনে সে আবার ১৫টি করে, তবে খুচরোগুলো একসঙ্গে করে দেখা যায় ১২টি হয় অর্থাৎ একদশ হয়ে আরও ২টি বেশী। সেজন্য ১০টি আবার একটি থালায়, রেখে আর ২টি খুচরো রাখা হোলো; সুতরাং মোট ৪টি দশের থালা আর খুচরো ২ এইভাবে যোগ করে ৪ দশ আর ২ অর্থাৎ ৪২ হয়। এইভাবে যোগ করলে তারা একক দশকের ধারণাও ঠিকমত পাবে।

কাজের ভেতর দিয়ে যোগ বিয়োগের মর্ম উপলব্ধি করার পর কতকগুলি মূর্ত জিনিস দিয়ে চর্চা করতে দেওয়া যেতে পারে। কারণ গণিতে চর্চার খুবই দরকার। তেঁতুল বিচি, কাঠির আঁটি, কড়ি, ছবি, বলফ্রেম প্রভৃতি দিয়ে চর্চা করা দরকার।

Abacus বা বলফ্রেমের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সবাই পরিচিত। সাধারণতঃ abacus কিনে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শিশুরা ইচ্ছে করলেই শিক্ষয়িত্রীর পরিচালনায় নিজেরা মাটি দিয়ে বল তৈরি করে শুকিয়ে একটু রং দিয়ে তারপর ফ্রেমে তার এঁটে সেই তারের ভেতর বলগুলি ঢুকিয়ে দিতে পারে। অবশ্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সাহায্য করতে হবে।

এইভাবে দোকান দোকান খেলা, বাস্ ট্রাম খেলা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে মূর্ত জিনিস নিয়ে যথেষ্ট নাড়াচাড়ার পরে বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে যোগের অভ্যাস করতে হবে।

আগেই বলেছি চর্চা জিনিস অঙ্কে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু সেই চর্চাও যাতে সংক্ষেপে করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তার জন্য কতকগুলি নিয়ম শিখতে হবে। চর্চার নিয়মগুলিও শিশু কেন করছে কি ভাবে হচ্ছে তা তার বুঝতে হবে। না বুঝে যন্ত্রচালিতের মত নিয়মগুলি যেন না করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

নিয়ম আলোচনা করার আগে আর একটি কথা বলা দরকার যে অঙ্কে ২ সংখ্যার ভেতর যে বন্ধন তা চর্চার ফলে এমন করতে হবে যেন ফল সব সময় মাথায় তৈরী থাকে। যে মুহূর্তে কেউ জিজ্ঞাসা করবে ৫+৬= কত হয় সেই মুহূর্তে সে একটুও দ্বিধা না করে উত্তর দেবে যে ১১ হয়। এতে হাতে গোনা বা লেখার কোন প্রয়োজন হবে না। এই বন্ধনগুলি দৃঢ় করবার জন্য প্রতিদিন সকালে স্কুলে অঙ্কের ঘণ্টার প্রথমে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট করে রোজ মৌখিক অঙ্ক করতে হবে।

তারপর একটু বড় বড় যোগের কথা, যেমন :—

(ক)	(খ)
৩৬	৩৬
২৫	২৫
৬৮	৬৮
১২৯	১২৯

সাধারণতঃ যেভাবে যোগ করা হয় সে (ক)এ দেখান হয়েছে। এই ভাবে করে যাওয়া হয়—৬ আর ৫এ এগারো আর ৮এ উনিশ; উনিশের ৯ বসলো আর হাতে ১ রইলো। ৩ আর ১ চার আর ২ ছয় আর ছয় =বারো। কিন্তু এই যে এককের ঘরে বলা হোলো ৬ আর ৫এ এগারো আর দশকের ঘরেও বলা হোলো ৩ আর ২এ পাঁচ তবে একক আর দশকের মধ্যে পার্থক্য কি রইলো? সেজন্য ওভাবে না বলে শিশু বলবে ৫ আর ৬এ এগারো, এগারো অর্থাৎ এক দশ আর এক। এক দশের জন্য ৫ এর ওপর একটি চিহ্ন দিলাম (খ) কারণ দশক দশকের ঘরে যোগ হবে। আর ১ একক রইলো। এই ১ একক আর ৮ একক এই মোট হোলো ৯ একক। যে এক দশক হাতে রইলো সেই এক দশক দশকের ঘরে যোগ করে পাওয়া যায় ৩ দশক আর ১ দশক=৪ দশক আর ২ দশক=৬ দশক আর ৬ দশক=১২ দশক। এর ভেতরে দশ দশকে ১ শত। সুতরাং ৬ এর ওপর ১ শতকের জন্য একটি চিহ্ন দেওয়া গেল। দশকের ঘরে নামলো ২ দশক। শতকের ঘরে আর কিছু নেই সুতরাং শুধু ১ শতক নামলো। এইভাবে উত্তর হোলো ১২৯। এইভাবে করলে একক দশকের চর্চাও হবে আর শিশুদের যোগের ধারণাও হবে স্পষ্ট।

ঠিক এই পদ্ধতি আমরা ভাস্করাচার্যের "লীলাবতী"তেও দেখি। "লীলাবতী"র প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে ভাস্কর লিখছেন—হে বুদ্ধিমতী লীলাবতী! যোগ অঙ্কে যদি তুমি সুপটু হও তবে আমাকে বল—২, ৫, ৩২, ১৯৩, ১৮, ১০ এবং ১০০ যোগ করলে কত হয়? এর ওপর একটি মন্তব্যে যে নিয়ম দেওয়া আছে তা এইরূপ :—

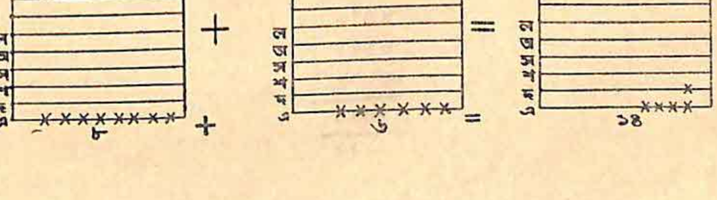
এককদের যোগফল—২, ৫, ২, ৩, ৮, ০, ০ =	২০
দশকদের যোগফল—৩, ৯, ১, ১, ০ =	১৪
শতকদের যোগফল—১, ০, ০, ১ =	২
সবগুলির যোগফল =	৩৬০

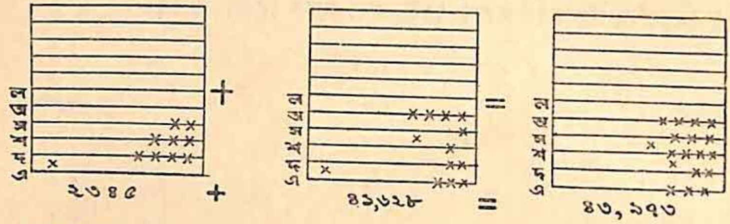
এই নিয়মটির উদাহরণ স্বরূপ একটি কষা অঙ্কও দেওয়া আছে—

```
 ৯২৭৯
  ৩৮৯
  ৪৭৯
─────
   ২৭
   ২২
    ৯
   ৯
─────
১০১৪৭
```


অর্থাৎ হাতে রাখার এবং সেটা বহন করে নিয়ে যাওয়ার যে নিয়ম, এখানে সে নিয়ম নেই। সেটা এসেছে পরে। কাজেই গোড়াতে শিশুদের শেখাবার জন্য আমরা এই নিয়ম ব্যবহার করতে পারি আর পরে যখন তারা নিয়মটি বুঝে ফেলবে তখন ধাপের সংখ্যা কমিয়ে এক ধাপেই সংখ্যা বহন করে নিয়ে অঙ্ক করা যাবে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে এক দশক বা এক শতক বা এক সহস্র হলেই একটি দাগ দেওয়ার যে অভ্যাস তাও ধীরে ধীরে তুলে দিতে হবে। এভাবে করানো হবে গোড়ায় যোগের ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য। যোগ প্রক্রিয়াটি যখন তাদের আয়ত্তে এসে যাবে তখন তারা একসঙ্গে ২+৩+৫+৭+৮+৯=২ আর ৩এ ৫; ৫ আর ৫এ ১০; ১০ আর ৭এ ১৭; ১৭ আর ৮এ ২৫; ও ২৫ আর ৯এ ৩৪— এইভাবে গুনে যাবে। তবে গোড়াতেই একেবারে এভাবে শেখানো ঠিক নয়।

বলক্রেমের সাহায্যে যোগফল বহুদিন চলে এসেছে। প্রাচ্য প্রতীচ্য সব দেশেই বলক্রেমের ব্যবহার ছিল। কি ভাবে বলক্রেম ব্যবহার করে যোগ করা হোতো তার একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—





২৩৪৫+৪১,৬২৮

একেবারে নীচের লাইনটি হচ্ছে এককের লাইন। ৫এর থেকে কম হলে অর্থাৎ ৪, ৩, ২ বা ১ হলে এই লাইনটির ওপর ততটা '×' চিহ্ন দিতে হবে। কিন্তু '৫' হলে একক ও দশকের লাইনের মাঝের জায়গায় চিহ্নটি বসাতে হবে। এইভাবে ৯ পর্যন্ত আমরা এখানে বসাতে পারি। কিন্তু দশ হয়ে গেলেই তাদের পরিবর্তে দশকের লাইনের ওপর ও রকম একটি চিহ্ন দিতে হবে। এই চিহ্ন ব্যবহারের আগে একটি কাঠের তক্তার উপর বালি ছড়িয়ে তারপর একটি সরু কাঠের stylusএর মত নিয়ে একক দশকের দাগ কাটা হতো। আর এই খোপের ভেতর '×' এই চিহ্ন না দিয়ে হয়তো '||||' এই রকম দাগ কেটে নিত অথবা বাঁশের ছড়ির টুকরো গুনে গুনে যার যার খোপে ফেলে দিত তারপর ঠিক একই উপায়ে যোগ করা হোতো। সেজন্য মধ্যযুগে ইউরোপে যখনই ব্যবসায়ীরা বিচারকের কাছে অর্থবিষয়ক কোনও ব্যাপার আনতেন তখনই এরকম একটি Checkered বোর্ড অর্থাৎ কোঠা আঁকা বোর্ড সামনে রেখে তবে হিসাব করতেন। সেই থেকেই নাম হয়েছে 'Court of the Exchequer'.

ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অফিসে দেখা যায় যে কি ভাবে ওপর থেকে নীচ অবধি চোখ একবার বুলিয়ে নিয়েই অনেকে যোগফল চট্ করে লিখে দেন। আবার কেউ হয়তো সামান্য ৮ আর ৬ যোগ করতে গেলেও হাতে না গুনে পারেন না। সুতরাং দ্রুত গণনার অভ্যাসও করতে হবে। দ্রুত গণনার জন্য চর্চার দরকার এবং একটি নিয়ম অনুসরণ করা দরকার, যেমন—

```
 ৫৯৬৮
 ৪৩৭৬
 ৮৬৫৪
 ৪৬৭৮
──────
২৩৬৭৬
──────
  ২২২
```

প্রথমে এককের সারি যোগ করার সময় মনে মনে বলতে হবে এভাবে নীচ থেকে যোগ করে গেলে পাওয়া যায়—৮, ১২, ১৮, ২৬। ২৬ এর ৬ নামবে আর ২ দশ হাতে রইলো। আবার দ্বিতীয় সারি যোগ করার সময় বলতে হবে—৯, ১৪, ২১, ২৭। ২৭ এর ৭ নামলো আর ২ শত হাতে রইলো। তারপর তৃতীয় সারি হবে—৮, ১৪, ১৭, ২৬। ২৬ এর ৬ নামলো ও ২ হাতে রইলো। শেষের লাইন যোগ করে হোলো—৬, ১৪, ১৮, ২৩। নীচে হাতের সংখ্যাগুলি লিখে রাখলে পরে মিলাতে সুবিধা হয়।

এইভাবে অভ্যেস হয়ে গেলে পর ২ সারি একসঙ্গে করে যোগ করার অভ্যেস করতে হবে। যেমন—

৫৯৬৮
৪৩৭৬
৮৬৫৪
৪১৭৮
———
২৭৬
———
২৩১
———
২৩১৭৬

এখানে ৭৮ আর ৫৪ যোগ করতে হলে ৭৮+৫০ করলে পাওয়া যায় ১২৮+৪=১৩২, আবার ১৩২+৭৬=১৩২+৭০+৬=২০২+৬=২০৮, ২০৮+৬৮=২০৮+৬০+৮=২৬৮+৮=২৭৬। নীচে লেখা হোলো ২৭৬।

এখন বাকী ২ সারি যোগ করে পাওয়া যায় যে ৪৬+৮৬=৪৬+৮০+৬=১২৬+৬=১৩২, ১৩২+৪৩= ৩২+৪০+৩=১৭২+৩=১৭৫, ১৭৫+৫৯=১৭৫+৫০+৯=২২৫+৯=২৩৪ আর হাতের ২=২৩৪+২=২৩৬।

এই সব মিলে হোলো ২৩৬৭৬।

এইভাবে বড় বড় যোগেরও অভ্যাস করতে হবে। কিন্তু সব সময়েই শিশুদের বয়সের কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমেই যদি এরকম বড় বড় অঙ্ক দেওয়া যায় তাদের পক্ষে কষ্টকর হবে, তারা ভুল করবে ও নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

একটু বড় যোগ যখন তারা করতে পারবে, যখন যোগ অঙ্ক তাদের বেশ দখলে এসে যাবে, তখন সেই যোগ অঙ্ক মেলাবার নিয়মও তাদের শেখানো হবে। নিয়মটির নাম হচ্ছে ৯ বাদ দেওয়া।

যেমন—

৫৯৬৮	১
৪৩৭৬	২
৮৬৫৪	৫
৪৬৭৮	৭
২৩৬৭৬	৬

এ অঙ্কটি ঠিক হয়েছে কি-না দেখতে হলে পাশাপাশি এক এক লাইনে সংখ্যা পর পর যোগ দিতে হবে, আর যখনই যোগফল ৯ এর বেশী হবে তখনই যোগফল থেকে ৯ বাদ দিতে হবে। যেমন প্রথম লাইনে ৫+৯=১৪ ; ৯ বাদ দিলে থাকে ৫। আবার ৫+৬=১১ ; ৯ বাদ দিলে থাকে ২ ; আবার ২+৮=১০ ; ৯ বাদ দিলে থাকে ১। এইভাবে সব লাইনগুলির সংখ্যা যোগ করে ও ৯ বাদ দিয়ে পর পর পাওয়া যায় ১, ২, ৫, ৭। এখন আবার ১+২+৫+৭ পর পর যোগ করতে হবে ও ৯ এর বেশী হলে ৯ বাদ দিতে হবে। যথা—১+২=৩ ; ৩+৫=৮ ; ৮+৭=১৫ ; এখন ১৫ থেকে ৯ বাদ দিলে থাকে ৬ ; আবার নীচে যোগফল ২৩৬৭৬ থেকেও ঠিক পর পর যোগ করে ৯ বাদ দিয়ে যেতে হবে। যেমন—২+৩=৫ ; ৫+৬=১১ ; ১১ থেকে ৯ বাদ দিলে থাকে ২ ; ২+৭=৯ ; ৯ থেকে ৯ বাদ দিলে থাকে '০'। কাজেই বাকী রইল '৬' ; এই সংখ্যা ও আগের যোগফলের সংখ্যা অর্থাৎ ১+২+৫+৭ থেকে ৯ বাদ দিয়ে যদি উভয়ে এক হয়, তবে যোগফল ঠিক আছে বলে ধরে নিতে হবে।

অবশ্য যোগ অঙ্ক একটু আয়ত্তে না আসলে এর মর্ম শিশুরা বুঝবেও না, বা এতে উৎসাহ পাবে না। কিন্তু এই নিয়ম যদি বুঝতে পারে তবে তারা উৎসাহে অঙ্ক করবে। অন্ততঃ উত্তর ঠিক হয়েছে কি-না তা মেলাবার জন্যও উৎসাহে অঙ্ক কষবে।

যোগের নিয়মের চর্চার পরে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে সমস্যামূলক প্রশ্নের ভেতর দিয়ে যোগের চর্চা করা হবে।

বিয়োগ

দৈনন্দিন কাজের নানা সমস্যার সমাধানের ভেতর দিয়েই বিয়োগ অঙ্কের সঙ্গে পরিচয় হবে।

মায়ার হাতে ৬টি পেন্সিল রয়েছে। তার থেকে ৪টি ৪ জনকে দিতে বলা হোলো। মায়ার কাছে আর কটি পেন্সিল রইলো? স্বপ্না গল্প করছে যে তার বয়স ৫ বৎসর আর তার দাদার বয়স ৮ বৎসর। তার দাদা তার থেকে কয় বৎসরের বড়? অরুণের খেলার দোকানে ১৬ গজ ফিতে সে কিনে রেখেছিল। তার থেকে ৭ গজ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আর কত গজ ফিতে তার দোকানে আছে? চুক্তি হয়েছে যে প্রত্যেকে ১০ বার দোলনায় দোলা খাবে। মণি ৬ বার দোলা খেয়েছে। আর কতবার দোলা খেলে তার দান ফুরোবে? এই রকম নানা প্রকার কাজ ও সমস্যা সমাধানে শিশু দেখবে যে বিয়োগের প্রয়োজন হয়।

কাজের ভেতর দিয়ে পরিচয়ের পর মূর্ত জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে বিয়োগের চর্চা করবে। দোকান দোকান খেলা, তেঁতুল বিচি, ছোট ছোট কাঠি ও নানারকম খেলার জিনিস নিয়ে খেলার ভেতর দিয়ে তারা ছোট ছোট বিয়োগ করবে।

তারপর বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে যখন বিয়োগ করবে তখন আবার কতকগুলি নিয়মে চর্চা করবে, যাতে সময় সংক্ষেপে ও সহজে অঙ্কগুলি হয়ে যায়। বিয়োগ সাধারণতঃ তিন ভাবে করা হয়—

(১) Borrowing method অথবা decomposition method—অর্থাৎ ধার করা বা ভেঙে নেওয়ার প্রণালী। যেমন—

$$\begin{array}{r} ৪৬৩২ \\ ২৬৫৮ \\ \hline ১৯৭৪ \end{array}$$

এখানে ২এর থেকে ৮ যায় না। সেইজন্য ৩ দশকের থেকে ১ দশক ভেঙে নিয়ে ২এর সঙ্গে যোগ দিয়ে হোলো ১২। আর ১২র থেকে ৮ বাদ দিলে হোলো ৪, এখন ৩ দশকের জায়গায় রইলো ২ দশক। এখন ২ দশক

থেকে ৫ দশক যায় না, সেজন্য শতকের ঘরের ৬ শতক থেকে ১ শতক অর্থাৎ ১০ দশক ভেঙে নেওয়া হোলো। ১০ দশক আর ২ দশক এই হোলো ১২ দশক; ১২ দশক থেকে ৫ দশক গেলে রইলো ৭ দশক। আবার শতকের ঘরে ৬ শতক থেকে ১ শতক নিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে ৫ শতক; ৫ শতক থেকে ৬ শতক নেওয়া যায় না সেজন্য সহস্রের ঘর থেকে ১ সহস্র অর্থাৎ ১০ শতক ভেঙে নেওয়া হোলো। ১০ শতক আর ৫ শতক এই হোলো ১৫ শতক। এই ১৫ শতক থেকে ৬ শতক গেলে রইলো ৯ শতক। আবার ৪ সহস্র থেকে ১ সহস্র নিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেজন্য ওখানে রয়েছে ৩ সহস্র। এখন ৩ সহস্র থেকে ২ সহস্র নিলে থাকবে ১ সহস্র।

(২) আর একটি নিয়ম হচ্ছে—২এর থেকে ৮ যায় না, সেজন্য ২এর সঙ্গে ১০ যোগ করা যাক্। ফলে ১২ হয়। এখন ১২ থেকে ৮ গেলে থাকে ৪। যার থেকে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ বিয়োজনের সঙ্গে যখন ১০ যোগ দেওয়া হোলো, তখন যা বাদ দিতে হবে অর্থাৎ বিয়োজ্যের সঙ্গেও ১০ যোগ দেওয়া দরকার। সেজন্য ১ দশক নীচে দশকের ঘরে অর্থাৎ ৫ দশকের সঙ্গে যোগ করে নিতে হবে। অর্থাৎ ৫ দশক ছিল এখন আর ১ দশক যোগ করে দিলে হবে ৬ দশক। ওপরে ৩ দশক থেকে ৬ দশক যায় না। সেজন্য ওপরে ১ শত বা ১০ দশক যোগ করা হোলো, সেজন্য ওপরে হোলো ১৩ দশক। ১৩ দশক থেকে ৬ দশক গেলে থাকে ৭ দশক। আবার ওপরে অর্থাৎ বিয়োজনের সঙ্গে ১ শত বা ১০ দশক যোগ করা হয়েছে, সেজন্য বিয়োজ্যতেও ১ শত যোগ করা হবে। নীচে ৬ শতক ও ১ শতক এই মিলে হোলো ৭ শতক। ওপরে ৬ শতক থেকে ৭ শতক নেওয়া যায় না। সেজন্য ১ সহস্র বা ১০ শত ওপরে যোগ দেওয়া হোলো। আবার বিয়োজ্যতেও ১ সহস্র যোগ দেওয়া হোলো। তাহলে ওপরে হোলো ১০+৬=১৬ শতক। ১৬ শতক থেকে ৭ শতক গেলে থাকে ৯ শতক। বিয়োজনে ১ সহস্র যোগ হয়েছে বলে বিয়োজ্যতেও সহস্রের ঘরে ১ সহস্র যোগ দিতে হবে। কাজেই ৪এর থেকে ৩ গেলে থাকে ১। একে ইংরেজীতে বলে Equal addition method বা সমান যোগ পদ্ধতি।

(৩) আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে Shopping method বা দোকানদারের পদ্ধতি। যেমন—

৬৭৫৪
২৩৪১
৮৪১৩

এখানে ৪ থেকে ১ গেলে কত হয় তা না বলে বলা হয় ১ আর কত হলে ৪ হবে। দোকানদার সাধারণতঃ এইভাবেই হিসাব করে। তিন আনার জিনিস কিনে যদি ১ টাকা দেওয়া যায় তবে ফেরত দেবার সময় সে হিসাব করে এইভাবে—৩ আনা আর কত হলে ১ টাকা হবে।

এই সব পদ্ধতির ওপর অনেক পরীক্ষামূলক কাজ হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যে সব পরীক্ষা হয়েছে তার থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সমান যোগ পদ্ধতিটি এই সবের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী। এতে অঙ্ক হয় তাড়াতাড়ি আর ভুলও হয় কম।

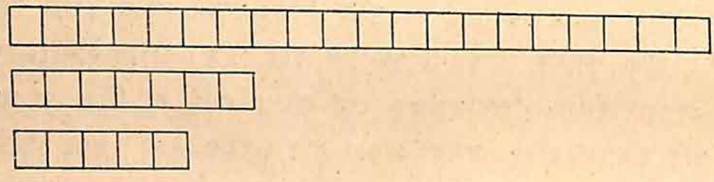
Borrowing method বা decomposition method অর্থাৎ ধার করার পদ্ধতিতে তাঁদের আপত্তি এই কারণে যে শিশুদের মনে ধার শোধ ইত্যাদি ধারণাগুলি না দেওয়াই ভাল। এই শব্দগুলির ব্যবহারই শিশুদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে এও দেখা গিয়েছে যে প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ Borrowing method-এর যুক্তি শিশুরা যেমন সহজে বোঝে দ্বিতীয় পদ্ধতির যুক্তি তাদের বোঝানো মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে। বিয়োজনে যে সংখ্যা যোগ দেওয়া হোলো বিয়োজ্যতেও সেই সংখ্যা যোগ না দিলে যে অঙ্কটি ঠিক থাকবে না এ ধারণা তাদের দেওয়া সত্যিই সহজ নয়। প্রথম পদ্ধতিতে যে 'ধার' শব্দ ব্যবহার করা হয় ঐ 'ধার' শব্দটি ব্যবহার না করলেও চলে। ধার না বলে বলা যেতে পারে যে আমরা ৩ দশক থেকে ১ দশক ভেঙে নিয়ে এলাম। ভেঙে নিয়ে আসা বলাটা কিছু অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এই যুক্তি শিশুরা সহজেই বোঝে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই বলেন যে এই পদ্ধতিতে শেখালে ভাল ফলই পাওয়া যায়। নিয়মের যুক্তি বোঝে বলে শিশুরা এতে আগ্রহ পায় এবং সেজন্য অঙ্কে ভুলও কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সমান সমান যোগ পদ্ধতির যুক্তি শিশুরা বুঝতে পারে না—কারণ বোঝানো কঠিন এবং যুক্তি না বোঝার জন্য তারা যান্ত্রিকভাবে কাজ করে যায় কাজেই আগ্রহও বোধ করে না। সম্প্রতি আমেরিকাতে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, ধার করার পদ্ধতিতে বিয়োগ করলে অঙ্ক তাড়াতাড়ি হয় ও ভুলও হয় কম।

বিয়োগের নিয়ম বুঝলে পরে যখন একটু বড় বড় বিয়োগ করতে শিখবে তখন বিয়োগ কি করে মেলাতে হয় যে ঠিক হয়েছে কি-না সেই নিয়মও শিখিয়ে দিতে হবে। যোগে যে ৯ বাদ দেওয়া পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছে, বিয়োগের বেলায়ও তাই হবে। যেমন—

৪৬৩২	৬
২৬৫৮	৩
১৯৭৪	৩

প্রথম লাইনে সংখ্যাগুলি পর পর যোগ করে ৯ বাদ দিয়ে গেলে দেখা যায় ৪+৬=১০, তার থেকে ৯ বাদ দিলে থাকে ১; ১+৩=৪; ৪+২= ৬। দ্বিতীয় লাইনে ২+৬=৮; ৮+৫=১৩; ১৩ এর থেকে ৯ বাদ দিলে থাকে ১৩−৯=৪; ৪+৮=১২; ১২−৯=৩। বিয়োগফলেও ১+৯= ১০; ১০−৯=১; ১+৭=৮; ৮+৪=১২; ১২−৯=৩।

এখন ৬এর থেকে ৩ বাদ দিলে ৩ হয়, সুতরাং বোঝা গেল বিয়োগটি কষা ঠিক হয়েছে।



যোগ বিয়োগের চর্চার জন্য একখানি Pasteboard সরু করে কেটে তাতে ২০টি সমান খোপ করে একটি কালো ও একটি লাল এইভাবে পর পর রং করে নেওয়া যেতে পারে। আরও ছোট ছোট টুকরো—কোনটিতে ৭টি খোপ, কোনওটিতে ৫টি বা ৪টি বা ৬টি এই রকম কতকগুলি টুকরো করে বড়টির তলায় ৫টি ও ২টির টুকরো পাশাপাশি বসিয়ে মিলিয়ে দেখা যায় গুনে যে ৫+২=৭ হয়। এইভাবে খেলাচ্ছলে শিশুরা যোগ বিয়োগের চর্চা করতে পারে।

যোগ বিয়োগ শেখার সঙ্গে সঙ্গে মিশ্র যোগ বিয়োগ অর্থাৎ টাকা, আনা, পয়সা; গজ, ফুট, ইঞ্চি; সের, ছটাক, পোয়া ইত্যাদির যোগ বিয়োগও করানো উচিত। তাহলে তারা যোগ বিয়োগ শেখার প্রয়োজন আরও ভাল করে

বুঝতে পারবে। কিন্তু এখনই এসবের প্রতীক বা সংকেত (symbol) শিখবার দরকার নেই। তারা এই সব অঙ্ক করবে এইভাবে—

যোগ

টা.	আ.	প.
৫	৬	৩
৬´	৭	২´
৯´	৮´	১
৬	৯´	২´
২৮	০	০

বিয়োগ

গ.	ফু.	ই.
৫	২	৬
৩	১	৭
২	০	১১

এতদিন তারা খেলার ছলে শিখেছে যে ৪ পয়সায় ১ আনা, ১৬ আনায় ১ টাকা; ১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট, ৩ ফুটে ১ গজ ইত্যাদি। কাজেই তারা যোগ করবে এইভাবে—৩ আর ২এ ৫ পয়সা অর্থাৎ ১ আনা ১ পয়সা; ১ আনার জন্য ২এর পাশে একটি টিক দেবে। আর ১+১=২; ২+২=৪ পয়সা=১ আনা, ১ আনার জন্য একটি টিক পড়লো, নীচে ০ বসলো। এই ২ আনা এখন আনার ঘরে যোগ হবে। ৬+২=৮; ৮+৭=১৫; ১৫+৮=২৩ আনা= ১ টা. ৭ আ.। টাকার জন্য ৮এর পাশে একটি টিক বসবে; ৭ আ.+৯ আ.=১৬ আনা=১ টাকা। টাকার জন্য ১টি টিক বসবে। আনার ঘরে নীচে '০' বসলো।

এখন ২ টাকা টাকার ঘরে যোগ হবে। সুতরাং ৫+২=৭; ৭+৬= ১৩=১ দশ ৩, দশ এর জন্য একটি টিক পড়লো; ৩ আর ৯এ ১২, ১২এর ১ দশের জন্য টিক ও ২ হাতে রইলো; ২+৬=৮; ৮ নামলো আর দশকের ঘরে ২ নামলো। এইভাবে উত্তর হোলো ২৮ টাকা।

বিয়োগের অঙ্কটিতে ৬ ইঞ্চি থেকে ৭ ইঞ্চি যায় না সেজন্য ২ ফুট থেকে ১ ফুট ভেঙে ১২ ইঞ্চি করে নেওয়া হোলো; ১২ ইঞ্চি+৬ ইঞ্চি=১৮ ইঞ্চি। ১৮ ইঞ্চি থেকে ৭ ইঞ্চি গেলে থাকে ১১ ইঞ্চি। পরে ফুটের ঘরে ১ ফুট থেকে ১ ফুট গেলে থাকে ০ ফুট; ৫ গজ থেকে ৩ গজ গেলে থাকে ২ গজ।

———

গুণ

শিশুরা নানারকম খেলা ও কাজের ভেতর দিয়ে গুণের নিয়ম আয়ত্ত করতে পারে। ট্রাম-বাস্ খেলার ভেতর দিয়ে—যেমন ৫ পয়সা করে টিকিট ৪ জনের কিনতে হবে—কত পয়সা লাগবে? দেখবে যে ৫ চারবার যোগ করতে হয়। দোকান দোকান খেলার সময় ৪ পয়সা করে ১ গজ রিবন, ৮ গজের দাম কত হবে? দেখবে ৪ আটবার যোগ করতে হয়। আবার হয়তো ৬ পয়সা করে প্রত্যেকে চাঁদা দিয়ে হিসাব করবে যে ২০ জন কত চাঁদা তুলতে পারবে—তখন দেখবে যে ৬ কুড়িবার যোগ করতে হবে। এত বড় বড় লম্বা যোগ না করে সংক্ষেপে যাতে হিসাব করা যায় সেজন্য তারা গুণ শিখবে। শিশুরা দেখবে যে একটি সংখ্যা বার বার যোগ করবার সমস্যা প্রায়ই আসে। সেজন্য তারা নীচের মত একটি চার্ট বা নামতা তৈরি করবে।

১	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	২	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০
৩	৩	৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	২৪	২৭	৩০
৪	৪	৮	১২	১৬	২০	২৪	২৮	৩২	৩৬	৪০
৫										
৬										
৭										
৮										
৯										
১০	১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০	১০০

এ নামতা তারা তৈরি করবে নিজেরা বার বার একটি সংখ্যা যোগ করে। যেমন—

২ দুইবার যোগ করে হয় ৪
২ তিনবার „ „ „ ৬
২ চারবার „ „ „ ৮ ইত্যাদি

এইভাবে ১০ ঘর পর্যন্ত নামতা তারা নিজেরা তৈরি করবে। তৈরি করবার পর বার বার চর্চা করে সেই নামতা মুখস্থ করবে। মোট কথা, পরের তৈরী ধারাপাত মুখস্থ না করে তারা তাদের নিজের তৈরী ধারাপাত মুখস্থ করবে।

৩×৪=১২ হয় বা ৫×৭=৩৫ হয়। এইসব বন্ধনগুলি বার বার চর্চা করে দৃঢ় করতে হবে—যেন যখনই কেউ কোন বন্ধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, যেমন ৯×৮ কত হয়, তখনই সে সঙ্গে সঙ্গে যেন উত্তর দিতে পারে ৯×৮= ৭২ হয়। এগুলি তার মাথায় যেন সর্বদাই তৈরী থাকে।

গুণ জিনিসটি অনেকদিন পর্যন্ত সকলের কাছে কষ্টকর ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। ৫×৫এর বেশী নামতা অনেকদিন পর্যন্ত লোকের জানা ছিল না।

ষোড়শ শতাব্দীর পাঠ্য পুস্তকে ৭×৮ এই গুণের নিয়ম দেওয়া আছে এইভাবে—

৭ ৩	৯ ১	৭ ৩	৮ ২
×	×	×	×
৮ ২	৮ ২	৯ ১	৪ ৬
৫ ৬	৭ ২	৬ ৩	৩ ২
			(২+১)

সংখ্যা দুইটি পর পর লিখে তাদের পাশে ১০ থেকে সেই সংখ্যা বাদ দিলে যা থাকে তাই লিখতে হবে। প্রথমটিতে তা হচ্ছে ৩ আর ২। ৩ কে ২ দিয়ে গুণ করলে ৬ হয়, তাই বসবে এককের ঘরে। আর ৭ থেকে ২ বাদ দিলে ৫ হয় আর ৮ থেকে ৩ বাদ দিলে ৫ হয়, এই ৫ বসবে দশকের ঘরে। এই × চিহ্নটিই ক্রমশ গুণের চিহ্নে পরিণত হয়েছে।

৯×৮ এর বেলায় ১×২=২ আর ৯−২=৮−১=৭

৭×৯ „ „ ৩×১=৩ আর ৭−১=৯−৩=৬

৮×৪ „ „ ২×৬=১২ এখানে ১২এর দুই নামলো আর ৮−৬=৪−২=২ তার সঙ্গে আগের ১ দশ যোগ হোলো। কি করে এই নিয়মটিতে গুণ করা যায় তা বীজগণিতের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। a কে b দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধরা যাক্ $x=10-a$

$y=10-b$

তাহলে $\begin{matrix} a & & x \\ & \times & \\ b & & y \end{matrix}$ তে

$$ab=(10-x)(10-y)=100-10x-10y+xy$$
$$=10\{(10-x)-y\}+xy$$
$$=10(a-y)+xy$$

এখানে xy সংখ্যাটি এককের ঘরে আর $a-y$ সংখ্যাটি দশকের ঘরে বসবে। যদি xy সংখ্যা দুইটির গুণফলে কোনও দশক থাকে তবে সেই দশকের ঘরের সংখ্যাটিও দশকের ঘরে যোগ হবে।

মিসর দেশে পূরণের নামতার বহুদিন প্রচলন ছিল না। কোনও সংখ্যাকে কোনও সংখ্যা দিয়ে পূরণ করতে হলে তারা পর পর দ্বিগুণ করে যেত।

এ নিয়ম বুঝতে হলে একটি সংখ্যাকে ২এর স্কেলে কি করে প্রকাশ করতে হয় তা বুঝতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে ৪৭ × ১৬৩।

৪৭ কে ২এর স্কেলে প্রকাশ করা মানে ৪৭ কে পর পর ২ দিয়ে ভাগ করে যাওয়া, যেমন—

২	৪৭				
২	২৩	অবশিষ্ট	১	...	(ক)
২	১১ ...	"	১	...	(খ)
২	৫ ...	"	১	...	(গ)
২	২ ...	"	১	...	(ঘ)
	১ ...	"	০	...	(ঙ)

(ক)	এর লাইন মানে	২	হিসাবে	২৩ দল	ও	১	অবশিষ্ট	
(খ)	... ...	$২^{২}$	"	১১	"	১	"	(২ হিসাবে)
(গ)	... ...	$২^{৩}$	"	৫	"	১	"	($২^{২}$ ")
(ঘ)	... ...	$২^{৪}$	"	২	"	১	"	($২^{৩}$ ")
(ঙ)	... ...	$২^{৫}$	"	১	"	০	"	($২^{৪}$ ")

অর্থাৎ $৪৭=১\times২^{৫}+০\times২^{৪}+১\times২^{৩}+১\times২^{২}+১\times২+১\cdots$ (চ)

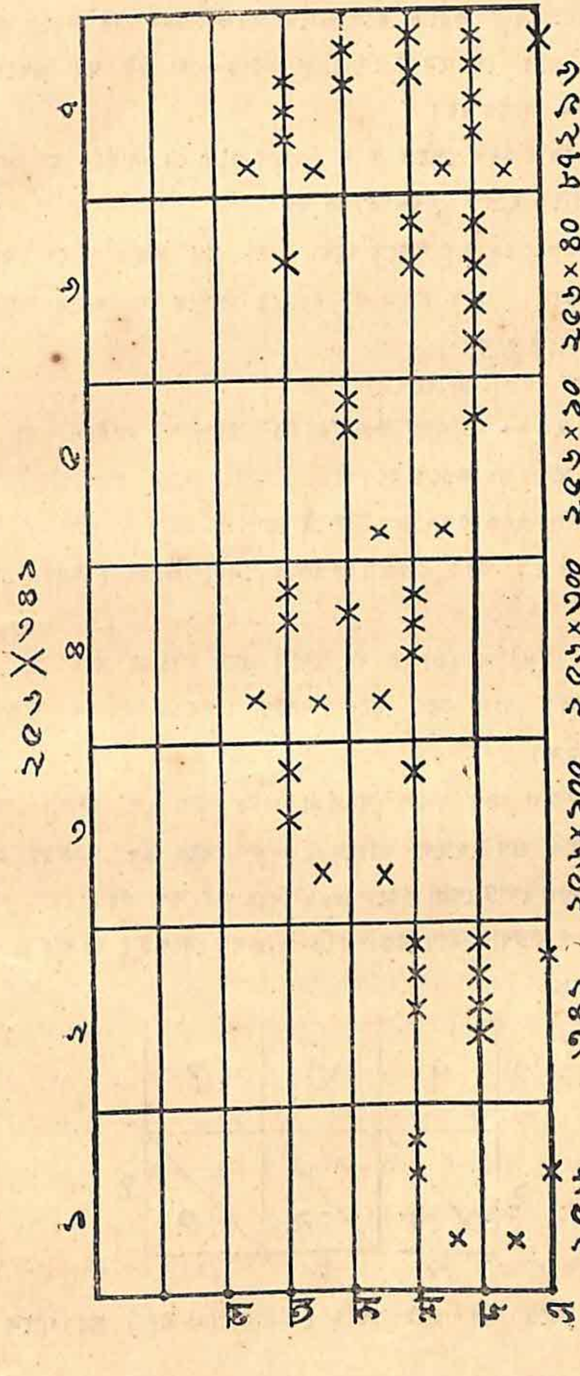
সুতরাং ৪৭ × ১৬৩ হবে—

$১৬৩\times২^{৫}+১৬৩\times২^{৩}+১৬৩\times২^{২}+১৬৩\times২+১৬৩\times১$। দুই সারিতে গুণফলটি এইভাবে বার করা যায়—

৪৭	১৬৩ =	১৬৩ × ১
২৩	৩২৬ =	১৬৩ × ২
১১	৬৫২ =	১৬৩×২^{২}
৫	১৩০৪ =	১৬৩×২^{৩}
২	~~২৬০৮~~ =	১৬৩×২^{৪}
১	৫২১৬ =	১৬৩×২^{৫}
	৭৬৬১ উত্তর।	

যখন বাঁ সারিতে জোড় সংখ্যা তখন তার ঠিক পাশের সংখ্যাটি কেটে দেওয়া হয়েছে—কারণ অবশিষ্ট তখন '০' থাকে। আর 'চ' এর লাইনেও দেখা যায় যে $২^{৪}$ এর গুণনীয় হচ্ছে '০'।

রোমানরা abacus বা বলফ্রেম ব্যবহার করে গুণ করতেন। তার নমুনা দেওয়া গেল। যেমন—২৫৬ × ৩৪১


২৫৬ X ৩৪১
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
২৫৬
৩৪১
২৫৬×১০০
২৫৬×৩০০
২৫৬×১০
২৫৬×৪০
৮৭২৯৬

২৫৬×৩৪১ বার করতে হলে আগে ২৫৬×১০০ বার করা যাক্। তার মানে (১)এর ঘরে যেখানে '×' চিহ্ন আছে—তা দুই ঘর ওপরে উঠিয়ে দেওয়া। যেমন (৩)এর ঘর।

এখন ২৫৬×৩০০ পেতে হলে (৩)এর ঘরে যে লাইনে যা আছে তার ৩গুণ করে বসাতে হবে। যেমন (৪)এর ঘর।

তারপর ২৫৬×৪০ বার করতে হবে। তা বার করার আগে ২৫৬×১০ বার করতে হবে। তার মানে (১)এর যে লাইনে যা আছে তাকে ১ ঘর ওপরে উঠিয়ে দিতে হবে।

(৫)এর ঘরে ২৫৬×১০ দেখানো গেল।

এখন ২৫৬×৪০ পাবার জন্য (৫)এর প্রত্যেক লাইনে বা ঘরে যা যেখানে আছে তা ৪গুণ করতে হবে।

(৬)এর খোপে ২৫৬×৪০ দেখানো হোলো।

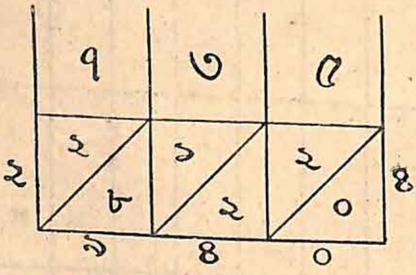
এখন ২৫৬×১ আর করবার দরকার নেই, কারণ (১)এর কোঠাতেই আছে।

এখন (১), (৪) ও (৬)এর ঘর যোগ করে (৭)এর ঘরে রাখা হোলো। (৭)এর ঘরে সব যোগ করে রেখে পাওয়া গেল ৮৭২৯৬। সুতরাং ২৫৬ ×৩৪১=৮৭,২৯৬।

এভাবে করলে গুণ মানে যে পুনঃ পুনঃ যোগ সে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখানে গুণ হোলো প্রথমে ৩০০, পরে ৪০ ও পরে ১ দিয়ে। এই তিনটি গুণফল মোট যোগ করলে ৩৪১ দিয়ে গুণ করা হয়।

মধ্যযুগে গুণ করবার আর এক পদ্ধতি প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। যেমন—

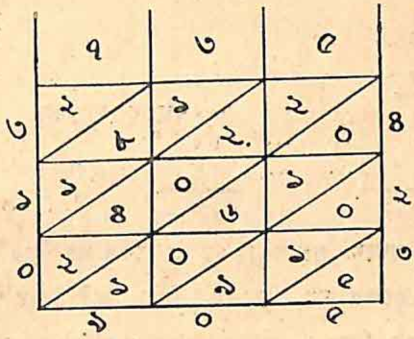
৭৩৫×৪



প্রত্যেকটি ঘরে গুণ করে কর্ণের (diagonal-এর) দুই পাশে গুণফল

লিখে শেষে কোনাকুনি ভাবে প্রত্যেক কর্ণের এক পাশের সংখ্যাগুলি যোগ করা।

১৩৫×৪২৩



সব কর্ণের এক পাশের সংখ্যা যোগ করে দেখা যাবে যোগফল হয় ৩১০৯০৫। হিন্দুরাও এইভাবে গুণ করতেন দেখা যায়।

বর্তমান যুগে যে ভাবে গুণ করা হয় তা হচ্ছে—

৫৬৭
৭৮৩
১৭০১
৪৫৩৬×
৩৯৬৯×
৪৪৩৯৬১ ... (১)

কিন্তু এখানে '×' এই চিহ্নটি যে দেওয়া হয় এর অর্থ কি—অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তা বুঝিয়ে বলতে পারে না। তারা বলে যে এটা নিয়ম। না বুঝে যন্ত্রের মত করার জন্যই তারা উৎসাহ পায় না এবং অঙ্কে ভুলও করে। নিয়ম এমনভাবেই আয়ত্ত করতে হবে যাতে যন্ত্রের মত অঙ্ক কষে যেতে পারে। কিন্তু নিয়মের অর্থ বুঝে, উদ্দেশ্য বুঝে তারপর যন্ত্রের মত করবে।

৫৬৭ কে ৭৮৩ দিয়ে গুণ করা মানে ৫৬৭ সংখ্যাটি ৭৮৩বার যোগ করা। ৭৮৩বার যোগ একবারে না করে প্রথমে ৭০০বার, তারপর ৮০বার ও তারপর ৩বার যোগ করে তিনটি যোগফল একসঙ্গে যোগ করে দেওয়া যেতে পারে। এবং আগে তারা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে কোনও সংখ্যাকে ১০বার যোগ অথবা ১০ দিয়ে গুণ করতে হলে সংখ্যাটির পাশে একটি শূন্য বসিয়ে দিলেই হয়। আর ১০০বার যোগ করলে সংখ্যাটির

পাশে দুইটি শূন্য বসিয়ে দিলেই হয়। কাজেই ১০০ দিয়ে গুণ আর কিছুই না। ৭ দিয়ে গুণ করে গুণফলের ডাইনে ২টি '০' বসিয়ে দেওয়া। সুতরাং অঙ্কটি দাঁড়ায় এই রকম—

৫৬৭		
৭৮৩		
৩৯৬৯০০	... ...	৭০০বারের যোগফল
৪৫৩৬০	... ...	৮০ " "
১৭০১	... ...	৩ "
৪৪৩৯৬১		৭৮৩ " " ... (২)

আগের নিয়মে প্রথমে গুণ করা হয় এককের ঘর দিয়ে। তারপর দশকের ঘর ও তারপর শতকের ঘর দিয়ে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রথমে গুণ করা হয় শতকের ঘর দিয়ে। তারপর দশক ও তারপর এককের ঘর দিয়ে। আমরা যখন বলি ৭৮৩বার যোগ তখন ৩বার, ৮০বার ও ৭০০বার এইভাবে ঠিক ভাবি না, কিন্তু ভাবি ৭০০, ৮০ ও ৩বার এইভাবে। সেজন্য দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই হচ্ছে স্বাভাবিক পদ্ধতি।

বর্তমানে আবার অন্য এক পদ্ধতিও দেখা যায়। সে হচ্ছে এইরূপ :—

৫৬৭	
৭৮৩	
৩৯৬৯	
৪৫৩৬	
১৭০১	
৪৪৩৯৬১	... (৩)

এ হচ্ছে প্রথম পদ্ধতিটির ঠিক উল্টো। আগে 'শ'এর ঘর থেকে গুণ আরম্ভ করা, তারপর দশকের ঘর, তারপর এককের ঘর দিয়ে। প্রথম পদ্ধতিতে ডানদিক থেকে বাঁদিকে গুণফল লিখে যাওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে বাঁদিক থেকে ডানদিকে গুণফল লিখে যাওয়া হয়। পাশ্চাত্যে অধিকাংশ দেশেই এই তৃতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথম ও তৃতীয় এই দুই পদ্ধতির ভেতর কোন্‌টি বেশী ফলপ্রদ সে সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক কাজও যথেষ্ট হয়েছে। দেখা গিয়েছে (৩)এর পদ্ধতিতে করলে ভুলও কম হয় ও তাড়াতাড়িও হয়। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বাঁদিক থেকে আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ মনে করা হয়। কারণ প্রথম যখন অঙ্ক আরম্ভ করা হয় তখন মস্তিষ্ক সতেজ থাকে ও ভুল কম হয়। ক্রমশ করতে করতে ক্লান্তি এসে যায়

ও ভুল হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এককের ঘরে যদি ভুল হয় তবে সে ভুল তত মারাত্মক হয় না। কিন্তু যদি উর্ধ্বের দিকে অর্থাৎ শতক, সহস্র, লক্ষ ইত্যাদির ঘরে ভুল হয়, তবে সে ভুল খুবই মারাত্মক হয়। সেজন্য মাথা যখন ঠাণ্ডা ও সতেজ থাকে তখনই উর্ধ্বের দিকের গুণ করে ধীরে ধীরে নীচের দিকের গুণে যাওয়া ভাল। তাছাড়া যদি কেউ গুণফল কত হবে তার একটা কাছাকাছি মাপ চায়, বাঁদিক থেকে করলে তা দেওয়া সহজ হয়।

মানসিক গুণ—অভ্যেস করলে মনে মনে গুণ করা ক্রমশ সহজ হয়ে ওঠে। তাছাড়া কতকগুলি সহজ উপায়ও আছে। যেমন ৫ দিয়ে গুণ করতে হলে সংখ্যাটির শেষে '০' জুড়ে দিয়ে তাকে ২ দিয়ে ভাগ করলেই হয়। শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ৫ দিয়ে গুণ মানে ১০ দিয়ে গুণ দিয়ে ভাগ-ফলকে ২ দিয়ে ভাগ দিলেই ৫ দিয়ে গুণ করার কাজ হয়। সেইরকম ২৫ দিয়ে গুণ করতে হলে সংখ্যাটির শেষে '০০' জুড়ে দিয়ে তাকে ৪ দিয়ে ভাগ দিলেই হয়। আবার ১২৫ দিয়ে গুণ করতে হলে সংখ্যাটির শেষে '০০০' জুড়ে দিয়ে ৮ দিয়ে ভাগ করলেই হয়। যদি ৭৫ দিয়ে গুণ করতে হয় তবে ৩০০ দিয়ে গুণ করে ৪ দিয়ে ভাগ করলেই হয়। যদি ৩৫ দিয়ে গুণ করতে হয় তবে ৭০ দিয়ে গুণ করে ২ দিয়ে ভাগ করলেই হয়। যদি ৯৯ দিয়ে গুণ করতে হয় তবে ১০০ দিয়ে গুণ করে আসল সংখ্যাটি একবার বিয়োগ দিলেই হয়। শিক্ষার্থী বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিক গুণগুলি অভ্যেস করতে পারে। এতে অঙ্ক করবার অনেক সুবিধা হয়।

মনে মনে যোগ করে গুণ করার অভ্যাসও করা যেতে পারে। যেমন—৩৪৫×২৩ গুণ করতে হলে এভাবে করা যায়—

৩০০×২০ = ৬০০০
৩০০× ৩ = ৯০০
৬৯০০
৪০×২০ = ৮০০
৭৭০০
৪০× ৩ = ১২০
৭৮২০
৫×২০ = ১০০
৭৯২০
৫× ৩ = ১৫
৭৯৩৫

প্রত্যেক বারই যোগ করে যা হচ্ছে সেটা মনে মনে ঠিক রাখতে হবে। তার পরের গুণফল আবার আগের যোগফলের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। গুণের অর্থ যদি একবার শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তবে এভাবে গুণ করা কখনই কঠিন হবে না। এইরূপ মানসিক গুণ শিক্ষার্থীদের উন্নতি অনুসারে প্রতিদিন শ্রেণীতে অন্তত ৫।৭ মিনিটের জন্য চর্চা করানো উচিত।

গুণ অঙ্ক শিখলে আবার গুণ অঙ্ক ঠিক হয়েছে কি-না তা মেলানোও দরকার। গুণ অঙ্কও যোগ বিয়োগের মত ৯ বাদ দিয়ে মেলানো যায়। যেমন:—

```
  ৩৫৭ ··· (ক)
 ×৭৫ ··· (খ)
 ———————
 ২৪৯৯০
  ১৭৮৫
 ———————
 ২৬৭৭৫ ··· (গ)
```

(ক) থেকে ৯ বাদ দিয়ে গেলে থাকে ৬

(খ) " " " " " " ৩

(ক)×(খ) এর অবশিষ্ট গুণ দিলে হয় ৬×৩ =১৮ আবার ১+৮=৯ তার থেকে ৯ বাদ দিলে হয় '০'।

(গ) এর থেকেও ক্রমান্বয়ে ৯ বাদ দিলে থাকে '০'। সুতরাং বোঝা যায় যে গুণটি ঠিক হয়েছে।

গুণের সময়ও একক, দশক জ্ঞান বার বার ভাল করে দিতে হবে। সহজ থেকে ক্রমশ জটিলে যেতে হবে। প্রথমে দিতে হবে ৩×৪ এই ধরনের গুণ।

```
(১)   দ   এ
      ৩   ২
          ৪
    ————————
     ১২   ৮
```

২ একক ৪ বার গুণ করলে ৮ একক হয়। ৩ দশক ৪ বার গুণ করলে ১২ দশক হয়।

```
(২)   দ   এ
      ৬   ৩
          ৪
    ————————
         ১২
        ২৪
    ————————
        ২৫২
```

৩ একক ৪ বার নিলে ১ দশক ও ২ একক হয়। ৬ দশক ৪ বার নিলে ২৪ দশক হয়। সুতরাং দুইটি যোগ করলে হয় ২৫ দশক আর ২।

এইভাবে কতকগুলি অঙ্ক করলে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে যে কেন আমরা এককের ঘরে গুণ করে যে দশক পাওয়া যায় তা দশকের ঘরের গুণফলের সঙ্গে যোগ করি।

সমস্যামূলক প্রশ্নের ভেতর দিয়ে শেষে গুণের চর্চা চলবে। আর সে প্রশ্নও এমনভাবে করা হবে যেন তাতে দৈনন্দিন জীবনের সংযোগ থাকে।

ভাগ

গুণ যেমন পুনঃ পুনঃ যোগ, ভাগও সেইরকম পুনঃ পুনঃ বিয়োগ। নানারকম কাজ ও খেলার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবে। যেমন বাসে করে যেতে হবে। ২৪ জন আছে। ৩ জন করে একটি সীটে বসলে কতখানা সীট লাগবে?

৪৮ তা কাগজ আছে। প্রত্যেককে ৬ তা করে কাগজ দিলে কতজন কাগজ পাবে?

খেলার দোকানে ২০ হাত ফিতে আছে। ৫ জনের প্রত্যেকে কত হাত করে কিনলে প্রত্যেকে সমান ভাগ পাবে?

এই রকম করে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ভাগের অর্থ শিক্ষার্থী বুঝবে। তারপর মূর্ত জিনিস যেমন তেঁতুল বিচি, ছোট ছোট কাঠি, টাকা, আনা, পয়সা, নানারকম ছবি ইত্যাদির ভেতর দিয়েও ভাগ সম্বন্ধে ধারণা পেতে পারবে। ভাগের অর্থ বুঝলে তারপর নজর দিতে হবে ভাগের পদ্ধতির ওপর—কেন কিভাবে হচ্ছে সেটা যেন তারা বুঝে তবে অগ্রসর হয়, যান্ত্রিক ভাবে যেন করে না চলে।

প্রথমে ছোট সংখ্যা নিয়ে আরম্ভ করতে হবে এবং ভাগ যে পুনঃ পুনঃ বিয়োগ সেটাই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন ৩০ জন ছাত্রী আছে। খেলার জন্য ৫ জন করে দল করে ভাগ হতে হবে। কয় দল হবে?

```
৩০
 ৫—১ দল
২৫
 ৫—১ দল
২০
 ৫—১ দল
১৫
 ৫—১ দল
১০
 ৫—১ দল
 ৫
 ৫—১ দল
 ০
```

→ ৬ দল

এইভাবে তারা দেখবে যে ৫ জন করে ৬ দল পাওয়া যায় অর্থাৎ ৫

দিয়ে ৩০ কে ভাগ করলে ভাগফল হয় ৬। এইভাবে ভাজ্য, ভাজক ও ভাগফল সম্বন্ধে তাদের ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

তারপর অবশিষ্টের ধারণা দিতে হবে। যেমন—

৪ | ৮ (ভাগফল ২), ৩ | ৯ (ভাগফল ৩), ২ | ৯ (ভাগফল ৪) আর অবশিষ্ট ১

গুণের নামতা তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গেই এরকম ছোট ছোট ভাগ শিক্ষার্থীরা করতে পারবে। ক্রমশ দুই ঘরের সংখ্যার ভাগও তারা নামতা থেকে সহজেই করতে পারবে। যেমন—

৪ | ১২ (৩) ; ৯ | ৩৬ (৪) ; ৮ | ৭২ (৯) ; ৯ | ৮১ (৯) ইত্যাদি

তার পরেই প্রশ্ন হবে ৫, ৫৭ এর ভেতর কতবার যায়? তখন আবার নামতা তৈরি করা হবে। যেমন—

৫×১০=৫০
৫×১১=৫৫
৫×১২=৬০

কাজেই ভাগটি দাঁড়াবে এইরকম ৫)৫৭
১১—২ অবশিষ্ট।

এভাবে নামতা তৈরি করে কয়েকটি অঙ্ক করার পর প্রশ্ন উঠবে যে এই নামতা না লিখে কি পারা যায় না? যেমন—৫ | ৬৭ এই অঙ্কটির মানে হচ্ছে ৬ দশ আর ৭ একককে ৫ ভাগ করা।

```
    ১ দশ আর ৩
৫)৬ দশ আর ৭
  ৫ দশ
  ১ দশ আর ৭
  ১০+৭
৫)১৭
  ১৫
   ২
```

৬ দশকে ৫ ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে ১ দশ করে পড়বে—আর ১ দশ বাকী থাকবে। একটি ১ দশের আঁটিকে ৫ ভাগ করা যায় না। ভাগ করতে গেলে আঁটিটি খুলতে হবে অর্থাৎ ১০ একক পাওয়া যাবে। ১০ একক ও ৭ একক এই ১৭ একক হবে। এই ১৭ একককে ৫ ভাগ করা যায় ও প্রত্যেক ভাগে ৩টি করে একক পড়বে তাতে মোট ১৫টি একক যাবে ও ২টি একক বাকী থাকবে। [সঙ্গে সঙ্গে কাঠির আঁটি ব্যবহার করলে ধারণা পরিষ্কার হবে।]

এইভাবে ধীরে ধীরে 'দশক', 'শতক' ইত্যাদি শব্দগুলি উঠিয়ে দেওয়া হবে। যেমন—

```
   ১৫
৫)৭৭
  ৫
  ২৭
  ২৫
   ২
```

উত্তর :—১৫ ভাগফল ও ২ অবশিষ্ট অর্থাৎ ৫, ৭৭এর ভেতর ১৫ বার আছে আর ২ অবশিষ্ট।

এইভাবে অঙ্ক কষে গেলে ধীরে ধীরে ভাগের নিয়মের অর্থ তারা বুঝতে পারবে।

তারপর আসবে দুই সংখ্যা দিয়ে ভাগ।

যেমন—৫৪৯২ ÷ ২৬

```
     ২১১
২৬)৫৪৯২
   ৫২
    ২৯
    ২৬
     ৩২
     ২৬
      ৬
```


২৬এর ঘরের নামতা তৈরি করতে হবে। যেমন—

২৬×২ = ৫২

২৬×৩ = ৭৮

২৬×৪ = ১০৪

এই নামতা তৈরি করার জন্য প্রত্যেকবার গুণ না করলেও চলে। কারণ পর পর ২৬ যোগ করে গেলেই চলে।

তারপর বলা হবে যে ৫ হাজারের ৫ আঁটিকে ২৬ ভাগ করা যায় না, সেজন্য খুলে ৫০টি শতকের আঁটি পাওয়া যাবে। এই ৫০টি শতক আর ৪টি শতকের আঁটি আছে। এই মোট হোলো ৫৪টি শতকের আঁটি। এখন ৫৪টি শতকের আঁটি ২৬ ভাগ করা যায় ও প্রত্যেক ভাগে ২টি করে শতকের আঁটি পড়বে। অথবা বলা যেতে পারে ৫৪ শতককে ২৬ ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে ২ শতক পড়বে। সেজন্য ২ ওপরে শতকের ঘরে বসানো হোলো। আর ২ শতক অবশিষ্ট নীচে বাদ দিয়ে রাখা হোলো। এখন ২ শতককে

খুলে ২০টি দশের আঁটি করা হোলো। আর ৯ দশ আছে। এই মোট ২৯ আঁটি। এই ২৯ আঁটিকে ২৬ ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে একটি করে দশের আঁটি পড়বে। সেজন্য ১ দশ দশকের ঘরে মাথার ওপর বসানো হোলো। আর বাকী রইলো ৩টি দশের আঁটি। এই ৩টি দশের আঁটি খুলে ৩০টি একক কাঠি পাওয়া গেল। এই ৩০টি একক আর ২ একক এই হোলো ৩২ একক। এই ৩২ এককে ২৬ ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে পড়ে ১ একক আর বাকী থাকে ৬ একক। সেজন্য ১ একক এককের ঘরের ওপর বসানো হোলো আর ৬ একক বাকী রইলো। সুতরাং উত্তর ঃ—ভাগফল ২১১ আর অবশিষ্ট ৬।

ক্রমে ক্রমে এই নামতা লেখার ওপর বিরাগ এসে যায়। তখন নামতা না করেও কি করে ভাগফল ঠিক করতে পারা যায় তার একটা সংকেত শেখানো যেতে পারে। যেমন—

```
       ৭
৫৭)৪২৬৭
```

এখানে ভাজকের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ৫, ৪২এর ভেতর কতবার যায় তা দেখতে হবে। ৪২এর ভেতর ৫ যায় ৮ বার। কাজেই ৪২৬এর ভেতর ৫৭ হয় ৮ বার যাবে নয় ৭ বার যাবে। এখন গুণ করে দেখা যায় ৫৭×৮=৪৫৬ বেশী হয়ে যায় সেজন্য ৫৭×৭=৩৯৯ হোলো।

এখানে ৭ বার যাবে।

ভাগফল ভাজ্যের ডানদিকে লেখার চেয়ে ওপরে লেখার সুবিধা হচ্ছে যে ভাগফলের প্রথম সংখ্যাটির মান দেখেই বোঝা যায় যে ভাগফল মোটামুটি কত হবে। যেমন আগের দৃষ্টান্তে অনুমান করা যায় ভাগফল ৭০ এর কাছে হবে। এ ছাড়াও ভাজ্যের প্রত্যেক সংখ্যার ওপরেই তো একটি সংখ্যা থাকার কথা। সেজন্য যখন ভাজ্যে '০' থাকে আর তার জন্য ভাগফলেও '০' বসে তখন সে '০' বসাতে আর ভুল হয় না যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে।

উৎপাদকের সাহায্যেও ভাগ করা যায়। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীতে সেভাবে করানো উচিত নয়। কারণ এ পদ্ধতিতে অবশিষ্ট নির্ণয় করা একটু জটিল ব্যাপার। সেজন্য এই নিয়মে ভাগ করলেও তা উচ্চ শ্রেণীতে করা উচিত। একটি উদাহরণ—

৪২৬৭ ÷ ৮৪

৮৪=৩×৪×৭। সুতরাং ভাগটি এইভাবে করা যায়—

৩	৪২৬৭	একক	
৪	১৪২২	—	অবশিষ্ট ১
৭	৩৫৫	—	অবশিষ্ট ২ (প্রতিদলে ৩)
	৫০	—	অবশিষ্ট ৫ (প্রতিদলে ১২)

কাজেই অবশিষ্ট=৫×১২+২×৩+১

=৬০+৬+১

=৬৭

এই পদ্ধতিটি বেশ জটিল। সেজন্য নিম্নশ্রেণীতে এভাবে ভাগ করানো ঠিক হবে না। যখন অন্য পদ্ধতি ভাল আয়ত্তে এসে যাবে, তখন দ্বিতীয় পদ্ধতি হিসাবে শেখানো যেতে পারে।

যোগ, বিয়োগ ও গুণের মত ভাগ অঙ্কও মিলিয়ে দেখতে হবে যে ঠিক হয়েছে কি-না। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে ভাগফল ও ভাজক গুণ করে অবশিষ্ট যোগ দিয়ে দেখতে হয় যে ভাজ্যের সঙ্গে মিলেছে কি-না।

৯ বাদ দিয়ে যেমন যোগ, বিয়োগ ও গুণ মেলানো যায়, ভাগ মেলাতেও ঠিক সেই ভাবেই করা যায়। ভাজকের সংখ্যাগুলি পর পর যোগ করে ও ৯ বাদ দিয়ে যেতে হবে। ভাগফলের সংখ্যাগুলিও পর পর যোগ করে ৯ বাদ দিয়ে যেতে হবে। এইভাবে ভাজকের ও ভাগফলের থেকে যে দুটি সংখ্যা পাওয়া যাবে—তা গুণ করে যদি দরকার হয় গুণফলেও ৯ বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অবশিষ্ট থেকেও দরকার হলে ৯ বাদ দিয়ে যা থাকবে তা ভাজক ও ভাগফলের গুণফলের সঙ্গে যোগ করতে হবে। এই যোগফল ভাজ্যের থেকে ৯ বাদ দিয়ে গেলে যে সংখ্যা থাকবে, তার সমান হলে বোঝা যাবে ভাগটি ঠিক হয়েছে। যেমন—

```
        ৫০
   ৮৪)৪২৬৭
      ৪২০
      ----
        ৬৭
```

এখানে ভাজক=৮৪ ; ৮+৪=১২ ; ১২−৯=৩

ভাগফল=৫০ ; ৫+০= ৫ = ৫

অবশিষ্ট=৬৭ ; ৬+৭=১৩ ; ১৩−৯=৪

ভাজ্য=৪২৬৭ ; ৪+২+৬+৭=১৯ ; ১৯−৯−৯=১

ভাজক×ভাগফল+অবশিষ্ট=৩×৫+৪=১৯; ১৯−৯−৯=১=ভাজ্য।
সুতরাং ভাগটি ঠিক আছে।

বিভিন্ন এককের ধারণা

বিভিন্ন এককের ধারণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করে সেই এককগুলির ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে, সে সম্বন্ধে সম্ভব মতো কিছু বললে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ বোধ করবে। যেমন সময়ের একক—ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, বৎসর ইত্যাদি, কখন কিভাবে এগুলি স্থির হোলো।

প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যায় যে বাৎসরিক কতকগুলি পর্বের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আদিম কাল থেকে চলে এসেছে। এই পর্ব অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করে দিতেন জ্যোতিষিগণ। আকাশে তারার অবস্থান লক্ষ্য করে এই দিন ঠিক করা হোতো। কাজেই পঞ্জিকার একটা প্রয়োজন সকলেই অনুভব করতে লাগলো। রোমানরা ক্যালেণ্ডার শব্দটি ব্যবহার করতো ছুটির দিনের তালিকা তৈরির জন্য।

সর্বদেশেই দেখা যায় সময়টাকে ভাগ করা হোলো প্রথমে দিন হিসাবে। এই দিনের মাপও আবার এক একজন এক একভাবে ঠিক করলো। যেমন কেউ কোনও একটি স্থির তারার অবস্থান লক্ষ্য করে দেখলো যে সেই তারাকে ঠিক সেইস্থানে দেখা যায় ২৩ কি ২৩½ ঘণ্টার পর। এই সময়টির মাপ দেওয়া হোলো ১ দিন। কেউ আবার সূর্য একবার ঠিক মাথার ওপর আসার পর আবার যখন মাথার ওপর আসে এর অন্তর্বর্তী সময়কে দিন বলে ধরে নিল। ঋতুর তারতম্য অনুসারে এই দিন ছোট-বড় হতে দেখা গেল। দিনের এইরকম ধারণা হাজার হাজার বছর ধরে চল্লো। দিনের বিভিন্ন সময় সূর্যঘড়ি (sundial) দিয়ে মেপে ঠিক করা হোতো। এতে এক বছরের সমস্ত সৌর দিবসের গড় নির্ণয় করা হোলো এবং দেখা গেল যে গড়ে ১ দিন ২৪ ঘণ্টার কাছাকাছি হয়।

দিনের আরম্ভ কখন ধরা হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন জাতির ভেতর মতভেদ ছিল।

ব্যাবিলনিয়ানরা সূর্যোদয়ের সঙ্গে দিনের আরম্ভ ঠিক করতেন। রোমান, ইহুদী, এথিনিয়ান ও অন্যান্য অনেকে সূর্যাস্তের সময় থেকে দিনের আরম্ভ ধরতেন। এখনও পাশ্চাত্য দেশে সব জায়গায় মধ্যরাত্রিতেই দিন আরম্ভ হয় বলে ধরা হয় এবং সেইভাবেই পৃথিবীর সর্বত্র কাজ চলে।

তারপর হোলো মাস হিসেবে সময়কে ভাগ করা। এই মাস আবার এক একজন এক একভাবে ঠিক করতে লাগলো। যেমন এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যা পর্যন্ত কেউ একমাস ধরলো। কতকগুলি স্থির তারার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে লক্ষ্য করা হোলো যে চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসতে কত সময় নেয়, সেই সময়কে মাস ধরা হোলো। এতে মাস হোলো প্রায় ২৮ দিনে। আবার কারও মতে সূর্য ও চন্দ্র একই রেখায় অবস্থিত হওয়ার পর আবার সেইস্থানে ফিরে আসার ভিতর যে অন্তর্বর্তী সময় সেই সময়কে মাস ধরা হোলো। এ মাস ২৯½ দিনে। চন্দ্রের অবস্থান অনুসারে যারা মাস ঠিক করে তারা মাস এইভাবেই ঠিক করে। সাধারণতঃ মাস এই হিসেবে ৩০ দিনে ধরা হয়ে থাকে।

তারপর এল বছরের হিসাব। বছর ঠিক করতে বহুদিন কেটে গেল, কোনও একটি তারাকে নির্দিষ্ট রেখে পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে কত সময় লাগে সেটাই লক্ষ্য করা হোলো। দেখা গেল সময় হচ্ছে ৩৬৫ দিনের কাছাকাছি! আবার আপাত দৃষ্টিতে সূর্যকে মনে হয় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এক মেষ সংক্রান্তি থেকে আরেক মেষ সংক্রান্তি পর্যন্ত যে সময় তাকেই বৎসর ধরা হোলো। আর এই হচ্ছে সমস্ত দেশের বৎসরের গোড়ার কথা।

সপ্তাহ কি করে ঠিক করা হোলো তা দেখতে গেলে দেখা যায় যে দিনের থেকে একটু বেশী সময়ের একটা মাপের প্রয়োজন হোলো অথচ মাসের চেয়ে ছোট হোলে সুবিধা হয়। তখনই সৃষ্টি হোলো পাক্ষিক গণনা ও পক্ষেরও অর্ধেক করে সৃষ্টি হোলো সপ্তাহের।

বছর কবে থেকে গোনা আরম্ভ হোলো তা নিয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দিন থেকে বছর গুনতে আরম্ভ করেছে। কোনও এক মেষ সংক্রান্তি (vernal equinox)-এর পরের প্রথম অমাবস্যা থেকে হিন্দুদের বছর শুরু হয়েছে। মুসলমানদের দিন আরম্ভ হয় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের বছর আরম্ভ হয়েছে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই থেকে যেদিন নাকি হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় যান।

দিনের ভেতরের ঘণ্টাগুলো বার করা একটু কষ্টকর ব্যাপারই ছিল। প্রথমে কোনও একটা গাছের বা পাহাড়ের ছায়া দেখে তা ঠিক করা হেতো। কিন্তু পরে একটি gnomon বা দণ্ডের ব্যবস্থা করা হোলো; মাটির ওপর দণ্ডটি

পুঁতে, তার ছায়া অনুযায়ী রেখা টানা হোতো। সকলেই মোটামুটি ভাবে ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত্রি ধরে নিয়েছে। এই ১২ সংখ্যাটি কেন নেওয়া হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে ১২এর কতকগুলি সাধারণ ভগ্নাংশ যেমন $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, এইগুলি সহজে বার করা যায়। এইভাবে সূর্যঘড়ি (sundial)-এর সৃষ্টি।

দিনের বেলায় সূর্যঘড়ি দিয়ে সময় ঠিক করা যেত, কিন্তু মুশ্‌কিল হোতো রাত্রিতে বা কোনও মেঘলা দিনে। সেজন্য ব্যবস্থা করা হোলো মোমবাতি জ্বালিয়ে সময় ঠিক করার। কত সময় গিয়েছে তা ঠিক করা হোতো কতখানি মোমবাতি জ্বলেছে তার ওপর। আর এক উপায় ছিল। একটি ছিদ্র সমেত পাত্রে বালি রাখা হোতো। সেই ফুটো দিয়ে বালি ধীরে ধীরে আর একটি পাত্রে পড়তো। একে hourglass বলতো। আবার জলঘড়িও ছিল, জল একটি পাত্র থেকে আর একটি পাত্রে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়তো এবং কতটা জল পড়েছে তাই দিয়ে সময় ঠিক করা হোতো।

পুরোহিত বা ধর্মযাজকেরা ছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায় আর তাঁরাই ঠিক করে নির্ধারণ করে বলে দিতেন সময়ের কথা। সূর্যঘড়ি দেখে দেখে গির্জার ঘণ্টা বাজানো হোতো। clock শব্দটি অনেকে মনে করেন এসেছে celtic শব্দটি থেকে যার মানে হচ্ছে ঘণ্টা। ফরাসী দেশেও cloche কথাটির মানে হচ্ছে ঘণ্টা।

যান্ত্রিক ঘড়ির আগেও রোমানদের সময়ে wheel clock ছিল। অনেকগুলি চাকা সমন্বয় করে ঘড়ি চালানো মধ্যযুগে দেখা যায়। প্রথম যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কার করেন Heinrich De Vick জার্মানীতে ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।

আমাদের দেশেও ১২ মাসে ১ বৎসর, ৩০ দিনে ১ মাস, ১৫ দিনে অর্থাৎ পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত ১ পক্ষ, ৭ দিন একত্র করে বলা হয় সপ্তাহ অর্থাৎ সপ্ত অহ বা দিন। ১ দিনকে যেমন ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করা হয়, আমাদের নিয়ম ছিল ১ দিনকে ৬০ দণ্ডে ভাগ করা। মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদির পরিবর্তে সময়ের বিভাগ হচ্ছে এইরূপ :—

৬০ অনুপলে	১ বিপল
৬০ বিপলে	১ পল
৬০ পলে	১ দণ্ড
৬০ দণ্ডে	১ দিন

বাংলা পঞ্জিকাতে এখনও এইরূপ মানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

রৈখিক পরিমাপ

দৈর্ঘ্য—

দৈর্ঘ্যের মাপ সর্বদেশেই দেখা যায়, আরম্ভ হয়েছে শরীরের কোনও অঙ্গের মাপ দিয়ে। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে হাত দিয়ে, গ্রীস, রোমে পা দিয়ে, আঙ্গুল দিয়ে, হাতের তালু দিয়ে। আমাদের দেশে আঙ্গুল দিয়ে, হাতের তালু দিয়ে ও হাত দিয়ে। আমাদের মাপের পরিমাণ হচ্ছে এইরূপ :—

৩ যবে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুষ্টি
৩ মুষ্টিতে	১ বিতস্তি
২ বিতস্তিতে	১ হাত
২ হাতে	১ গজ
২ গজে	১ ধনু
২০০০ ধনুতে	১ ক্রোশ বা কোশ
৪ কোশে	১ যোজন

আবার কাপড় মাপতে গিয়ে যে মাপ ব্যবহার হয় তা হচ্ছে এইরূপ :—

৩ অঙ্গুলিতে	১ গিরা
৪ গিরাতে	১ হাত
২ হাতে	১ গজ

ইংলণ্ডে দৈর্ঘ্যের মাপ আরম্ভ হয়েছে আঙ্গুল দিয়ে, পা দিয়ে। মুখের থেকে আঙ্গুলের ডগা ধরা হোতো ১ গজ। এখনও দোকানে অনেক সময় দেখা যায় মাপকাঠি না থাকলে দোকানদার ১ গজ কাপড় মাপে মুখের থেকে ধরে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত মাপ নিয়ে। ইংরেজীতে গজকে yard বলা হয়। yard কথাটা এসেছে gyrd শব্দ থেকে যার মানে হচ্ছে একটি লাঠি বা ছড়ি। এই গজের মাপ এক একজনের হাতে এক এক রকম হোতো। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেনরীর (১০৬৮—১১৩৫) মুখের থেকে হাতের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত মাপ নিয়ে একটি ছড়ি মাপা হোলো এবং আইন করে ঠিক করা হোলো যে ঐ মাপই হবে একটি yard বা গজের প্রমান মাপ। এখনও সেই ছড়িটি রয়েছে ইংলণ্ডের এক মিউজিয়ামে। দোকানে যে গজকাঠি দেখা যায় তা ঐ মাপের।

ওজন—

ওজন অধিকাংশ দেশেই আরম্ভ হয় শস্যের ওজনের মাপ ধরে। আমাদের দেশে জহুরীদের ওজন হচ্ছে এই ধরনের—

৪ ধানে	১ রতি
৬ রতিতে	১ আনা
১৬ আনায়	১ তোলা বা ভরি

১ রতি আবার ধরা হয় ১টি কুঁচফলের সমান। চিকিৎসকদের ওজনও এইরূপ—

৪ ধানে	১ রতি
১০ রতিতে	১ মাষা
১২ মাষায়	১ তোলা

বাজারের ওজন হচ্ছে—	৫ তোলায়	১ ছটাক
	৪ ছটাকে	১ পোয়া
	৪ পোয়ায়	১ সের
	৪০ সেরে	১ মণ

ইংরেজী মতেও গ্রেন, গ্রাম অর্থাৎ শস্যের পরিমাপ ইত্যাদি দিয়ে ওজনের আরম্ভ।

মুদ্রা

আগে Barter পদ্ধতি ছিল অর্থাৎ জিনিসের মূল্য অন্য জিনিসেই দেওয়া হোতো। তারপর কড়ি দিয়ে জিনিস কেনার প্রথা হোলো। পরে যখন তামা, রূপা ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহারের প্রচলন হোলো, তখন ২০ কড়ি বা কড়ার বদলে তামার ১টি পয়সা প্রচলনের ব্যবস্থা হোলো। সেজন্য ১ পয়সা লেখা হয় ৫, অর্থাৎ ৫ গণ্ডায় বা ২০ কড়ায় ১ পয়সা। এক তোলা বা ১ ভরি ওজনের একটি রূপার টাকায় ১৬ আনা বলে ধরা হোলো। কারণ ১৬এর ভাজক অনেক পাওয়া যায়। যেমন—১, ২, ৪, ৮, ১৬।

সেইজন্য ১	টাকার	১৬	ভাগের	১	ভাগ	বলা হয়	১ আনা
”	”	৮	”	১	”	”	২ আনা
”	”	৪	”	১	”	”	১ সিকি
”	”	২	”	১	”	”	১ আধুলি।

1369

লঘূকরণ

নিম্ন লঘূকরণ বা উর্ধ্ব লঘূকরণ শেখাবার সময় প্রথমে দু-একটি প্রশ্নে অঙ্কের উল্লেখ করা হবে, যাতে নাকি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে এই ধরনের অঙ্কের জীবনে প্রয়োজন হয়। যেমন নাকি বনভোজনের জন্য প্রত্যেকে ১/১০ করে চাঁদা দেওয়ায় দেখা গেল যে মোট ২১৮৵০ উঠেছে। কত জন চাঁদা দিয়েছে? আবার সরস্বতী পূজার চাঁদা সংগ্রহ করে দেখা গেল ১৩২০টি পয়সা, ৫৬০টি ডবল পয়সা, ৬৩০টি আনি ও ২৮টি টাকা উঠেছে। মোট কত উঠেছে? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই শিক্ষার্থীরা দেখবে যে টাকা-আনাকে পয়সা করার, বা পয়সা ও আনাকে টাকায় পরিণত করার প্রশ্ন উঠবে ও কি করে তা' করতে হয়, তার সংকেতও নিজের থেকেই বার করতে পারবে।

মিশ্র গুণ ও ভাগ—

মিশ্র যোগ-বিয়োগের কথা আগেই বলা হয়েছে। এখন মিশ্র গুণ-ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

প্রঃ ১২৫||৵১৫ পয়সা×১৮৫

(১) ১৮৫কে আমরা ভাগ করতে পারি এইভাবে—(১০×১০)+৮×১০+৫

তাহলে অঙ্কটি দাঁড়াবে এইরূপ :—

১২৫||৵১৫	টা. আ. প.
১০	১২৫৬৭—৶—০—১০০ দিয়ে গুণফল
১২৫৬||৶১০	১০০৫৩—৸—০—৮০ " "
১০	৬২৮—।/—১৫—৫ " "
১২৫৬৭৶০	২৩২৪৯—।—১৫—১৮৫ " "

এই নিয়মের সুবিধা এই যে ১০ দিয়ে গুণ করা সুবিধাজনক। একেবারে ১৮৫ দিয়ে গুণ করতে গেলে একটু জটিল হয়ে পড়ে অনেকের এই ধারণা। তবে এখানে অসুবিধা এই যে কোনও একটি লাইনে যদি একবার ভুল হয় তবে সর্বত্রই সেই ভুলই করে যাওয়া হবে।

(২) সমগ্র সংখ্যাটি দিয়ে একসঙ্গেও গুণ করা চলে। যেমন—

```
১২৫          ॥৵              ১৫
                            ১৮৫
----------------------------------
২৩২৪৯         ।              ১৫

  ১২৪         ১৩৮         ৪ | ৫৫৫
  ৬২৫        ১৮৫০           ------
১০০০০    ১৬ | ১৯৮৮          ১৩৮—৩
১২৫০০       -------
-----        ১২৪—৪
২৩২৪৯
```

এতে সুবিধা এই যে যদি ভুল হয় তবে কোথায় ভুল হয়েছে তা চট্‌ করে বার করা যায়। আবার এভাবেও লেখা যেতে পারে—

```
(৩)  ১২৫×১৮৫=                                  ২৩১২৫
     ১৮৫×॥৵০=১৬ | ১৮৫০
                  ----------
                   ১১৫—॥৵০                     ১১৫॥৵০
     ১৮৫×৲১৫=      ৪ | ৫৫৫
                      ---------
                  ১৬ | ১৩৮—৲১৫
                      ---------
                        ৮—॥৵০                   ৮॥৵১৫
                                               ----------
                                               ২৩২৪৯। ১৫
```

অথবা সাঙ্কেতিক উপায়ে করা যেতে পারে—

```
(৪)
                         ১৮৫ টাকা…১ টাকা হিসাবে
                          ১২৫
                         -----
                          ৯২৫
                         ৩৭০
                        ১৮৫
                        ------
॥০=১ টাকার ১/২     |    ২৩১২৫   = দাম ১২৫ টাকা হিসাবে
৵০=॥০ আনার ১/৪     |      ৯২॥০   =  „   ॥০       „
৲১০=৵০ আনার ১/৪    |     ২৩৵০   =  „   ৵০       „
৲৫=৲১০ পয়সার ১/২   |      ৫৸ ১০=  „   ৲১০      „
                   |     ২৸৵ ৫=  „   ৲৫       „
                       ---------------------------------
                       ২৩২৪৯। ১৫=  „ ১২৫॥৵১৫    „
```

এই চারটি পদ্ধতির ভিতর দ্বিতীয় পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মিশ্র ভাগ—

মিশ্র ভাগের জন্য যে সর্পাকৃতি আকারে বসিয়ে করার প্রথা প্রচলিত আছে তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। সেজন্য নিম্নলিখিত আকারে বসিয়ে করা যেতে পারে—

	২৫	॥/	৫
৯৫)	২৪৩০	॥৶০	১০
	১৯০	৮৮০	১৪০
	৫৩০	৮৯০	১৪২
	৪৭৫	৮৫৫	৯৫
	৫৫×১৬	৩৫×৪	৪৭

উত্তর—ভাগফল ২৫॥/৫ আর অবশিষ্ট ৪৭ পয়সা। এই ৪৭ পয়সা ২৪৩০॥৶১০ অর্থাৎ ভাজ্য থেকে বাদ দিয়ে অথবা ৯৫ − ৪৭ = ৪৮ যোগ দিয়ে শিক্ষার্থী দেখতে পারে ভাগটি মেলে কি-না।

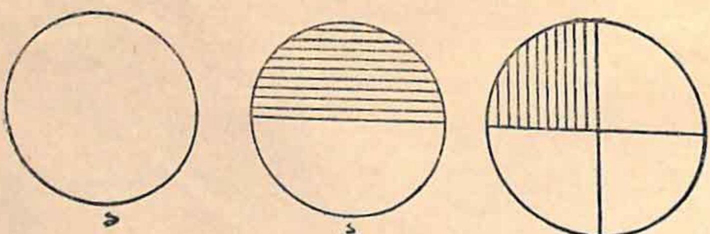
ভগ্নাংশ

ঐতিহাসিক যুগ থেকেই ভগ্নাংশের ধারণা চলে এসেছে। ব্যাবিলন ও মিসর দেশেই ভগ্নাংশের ব্যবহার প্রথমে শুরু হয়। কিন্তু বর্তমানে যে পদ্ধতিতে ভগ্নাংশ লেখা হয়, সে পদ্ধতি হিন্দুরাই প্রথম আবিষ্কার করেন। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর ভগ্নাংশ লিখতেন এইভাবে—$\begin{matrix}২\\৩\end{matrix}$। মাঝের রেখাটি দিতে শুরু করে আরববাসীরা।

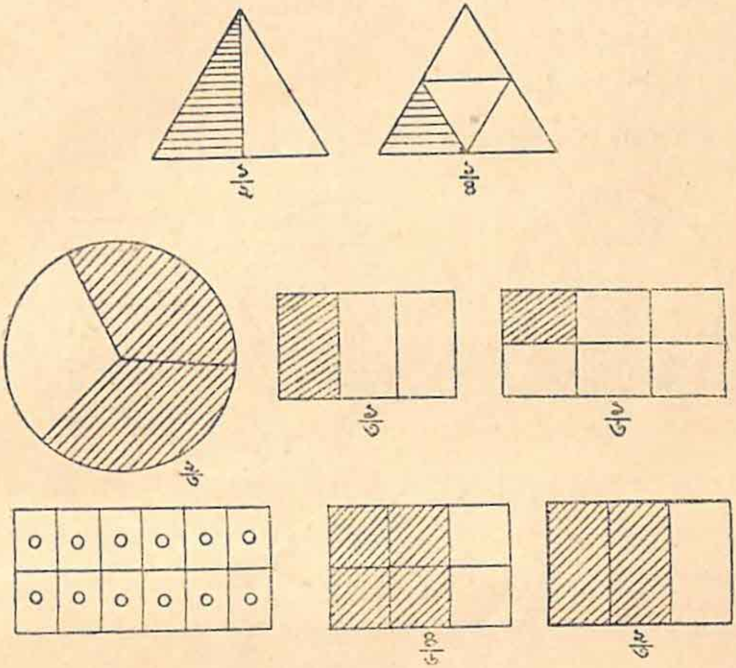
ভগ্নাংশ সম্বন্ধে ধারণা অজ্ঞাতে ছোটবেলা থেকেই এসে যায়। খাবার সময় মা যখন আধখানা রসগোল্লা, আধখানা কলা বা আধ গেলাস দুধ ইত্যাদির কথা বলেন, কিংবা তিন বা চার ভাই-বোনকে কোনও একটি জিনিস সমান ৩ ভাগ বা ৪ ভাগ করে নিতে বলেন—সে সময় অজ্ঞাতে তারা ভগ্নাংশের ধারণা করে নেয়।

মাটির জিনিস—যেমন সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি তৈরি করে তা সমান ভাগ করে ভগ্নাংশের ধারণা দেওয়া যেতে পারে। ২ ইঞ্চি = ১ ফুটের $\frac{১}{৬}$ ভাগ; ২ ফুট = ১ গজের $\frac{২}{৩}$ ভাগ অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ। ১ মাস = $\frac{১}{১২}$ বছর অর্থাৎ ১ বছরের ১২ ভাগের ১ ভাগ। আবার ২০টি রসগোল্লার ভেতর ৫টি হচ্ছে $\frac{১}{৪}$, অর্থাৎ ৪ ভাগের ১ ভাগ। ক্লাসে ৩০টি ছাত্রীর ভেতর ১০টি হচ্ছে $\frac{১}{৩}$, অর্থাৎ ৩ ভাগের ১ ভাগ। এইভাবে দৈনিক ব্যবহার্য নানা মূর্ত জিনিসের ভেতর দিয়ে ভগ্নাংশের ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

তারপর ছবির ভেতর দিয়েও ভগ্নাংশের ধারণা দেওয়া যেতে পারে। যেমন—



১ $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৪}$



একদল জিনিসের অংশ হিসাবেও ভগ্নাংশ প্রকাশ করা যায়। যেমন—১২টি জিনিসের ১/৬ হচ্ছে ২টি, ১/৩ হচ্ছে ৪টি ইত্যাদি।

ভগ্নাংশকে একটি সংখ্যার সঙ্গে আর একটি সংখ্যার সম্বন্ধ হিসাবেও প্রকাশ করা যায়। যেমন ২ ÷ ৪ = ২ : ৪ = ১ : ২ = ১/২ অর্থাৎ ২এর সঙ্গে ৪এর যা সম্পর্ক ১এর সঙ্গে ২এর সেই সম্পর্ক, অর্থাৎ = ১/২।

যেমন ৩টি সন্দেশ + ৪টি সন্দেশ = ৭টি সন্দেশ, সেইরূপ একটি সন্দেশের ৮ ভাগের ৩ ভাগ + ৮ ভাগের ৪ ভাগ = ৮ ভাগের ৭ ভাগ।

অথবা এইভাবে লেখা যায়—

৩/৮ + ৪/৮ = ৭/৮

শিক্ষার্থী বুঝবে যে যত ভাগে ভাগ করা যায় সেই ভাগের সংখ্যা বসবে নীচে, আর যত ভাগ তার থেকে নেওয়া যায় তা বসবে ওপরে।

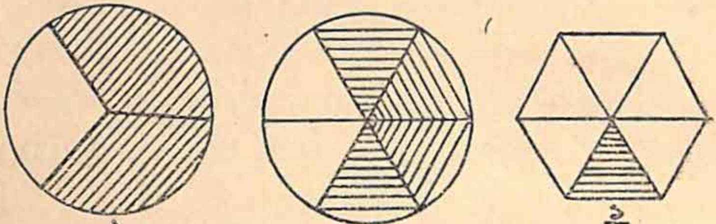
ভগ্নাংশের কিছু ধারণা হলেই তখন মানসিক অঙ্ক করাতে হবে। যেমন ১ টাকার ১/৪ কত? ১/২ কত? ১/১৬ কত? ১/৮ কত? ২/৪ কত? ৪/১৬ কত? ৪/৮ কত?

এই থেকেই শিক্ষার্থীরা ধারণা পাবে যে—

$\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}=\frac{৪}{৮}$

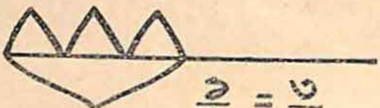
$\frac{১}{৪}=\frac{২}{৮}=\frac{৪}{১৬}$

ছবি দ্বারাও এ ধারণা দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

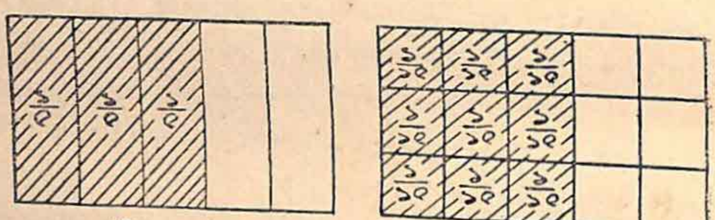


$\frac{২}{৩}$ = $\frac{৪}{৬}$ $\frac{১}{৬}$

$\frac{১}{৬}$ $\frac{১}{৬}$ $\frac{১}{৬}$



$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$



$\frac{৩}{৫}$ = $\frac{৯}{১৫}$

এই ধারণা হওয়ার পর এইরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে—

১ টাকার $\frac{১}{২}$ কত আনা? ৮ আনা

১ টাকার $\frac{১}{৪}$ কত আনা? ৪ আনা

১ টাকার $\frac{১}{৮}$ কত আনা? ২ আনা

তাহলে ১ টাকার ($\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}$)=১৪ আনা।

১৪ আনাকে ১ টাকার অংশ হিসাবে কি ভাবে লেখা যায়?—$\frac{১৪}{১৬}$

তাহলে $\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}=\frac{১৪}{১৬}$

শিক্ষার্থী হঠাৎ বুঝে নাও উঠতে পারে, তখন দেখিয়ে দিতে হবে এইভাবে—

$\frac{১}{২}=\frac{৮}{১৬}$

$\frac{১}{৪}=\frac{৪}{১৬}$

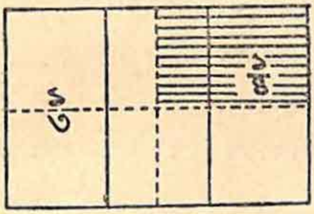
$\frac{১}{৮}=\frac{২}{১৬}$

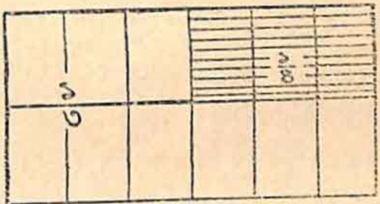
এবং $\frac{৮}{১৬}+\frac{৪}{১৬}+\frac{২}{১৬}=\frac{১৪}{১৬}$

সুতরাং এর থেকে এ-ও বেরিয়ে আসবে যে আমরা যদি কয়েকটি ভগ্নাংশ যোগ করতে চাই তবে ভগ্নাংশগুলির প্রত্যেকটিকে একই সমান অংশে ভাগ করে নেওয়া দরকার।

তারপর ক্রমে ক্রমে বলতে হবে যে এই যে সমান অংশের সংখ্যা যাতে ভাগ করা হয় তাকে বলা হয় **হর**। আর তার থেকে যত অংশ নেওয়া হয়, তাকে বলা হয় **লব**। যেমন $\frac{৮}{১৬}$ এখানে ১৬ হচ্ছে হর আর ৮ হচ্ছে লব, কারণ ১৬টি সমান অংশে ভাগ করা হয়েছে আর তার থেকে ৮টি সমান অংশ নেওয়া হয়েছে।

চিত্রের ভেতর দিয়েও যোগ অঙ্ক শেখানো যেতে পারে। যেমন, $\frac{১}{৩}+\frac{১}{৪}$





$\frac{১}{৩}+\frac{১}{৪}=\frac{৭}{১২}$

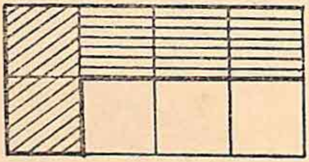
দেখা যায় যে যদি সমান অংশে ভাগ না করে নেওয়া যায় তবে $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৪}$ যোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। মাঝখানের $\frac{১}{৩}$ অংশ সমান ৪ ভাগে বিভক্ত হয়েছে। ঠিক সেই ভাবেই আমরা বাকী ২টি $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রত্যেকটি সমান ৪ ভাগে ভাগ করতে পারি। সমস্ত চিত্রটি সমান ১২ ভাগে বিভক্ত হয়েছে—

$\frac{১}{৩}$ অংশ$=\frac{৪}{১২}$

$\frac{১}{৪}$ অংশ$=\frac{৩}{১২}$

$\frac{১}{৩}+\frac{১}{৪}=\frac{৪}{১২}+\frac{৩}{১২}=\frac{৭}{১২}$

বিয়োগও একই ভাবে করা যায়। যেমন, $\frac{৫}{৮} - \frac{১}{৪}$



$$\frac{৫}{৮} - \frac{১}{৪} = \frac{৩}{৮}$$

সমস্ত ক্ষেত্রটিকে সমান ৮ ভাগে ভাগ করে তার থেকে ৫ ভাগ নেওয়া হোলো। তারপর চার ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৮ ভাগের ২ ভাগ বাদ দেওয়া হোলো। তা হলে দেখা যাচ্ছে ৮ ভাগের ৩ ভাগ বাকী রইলো।

এইভাবে করে করে শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এই সিদ্ধান্তে আসবে যে বিভিন্ন হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ যোগ বা বিয়োগ করতে হোলে, হরগুলিকে একই সংখ্যায় পরিবর্তিত করতে হবে এবং সেইজন্য বিভিন্ন হরগুলির ল. সা. গু. বার করে প্রত্যেকটি হর যাতে সেই একই ল. সা. গু.তে পরিণত হয় তার চেষ্টাই করতে হবে।

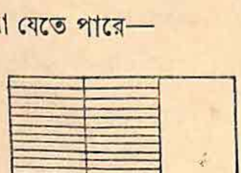
গুণ—

ভগ্নাংশের গুণে প্রথমে একটু গোল বাধে। শিক্ষার্থীরা এই পর্যন্ত জেনে এসেছে যে, কোন সংখ্যাকে গুণ করলে সেই সংখ্যাটি বেড়ে যায়, কিন্তু ভগ্নাংশের গুণে তারা দেখবে যে সংখ্যাটি অনেক সময় কমে যায়। গুণ মানে এতদিন ধারণা ছিল যে পুনঃ পুনঃ যোগ। ভগ্নাংশের গুণেও গুণনীয়ক যদি পূর্ণ সংখ্যা হয়, তবে এক্ষেত্রেও গুণ মানে পুনঃ পুনঃ যোগই হয়।

যেমন $\frac{১}{৩} \times ২ = \frac{১}{৩} + \frac{১}{৩} = \frac{২}{৩}$

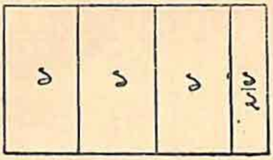
$\frac{১}{৯} \times ৫ = \frac{৫}{৯} = \frac{১}{৯} + \frac{১}{৯} + \frac{১}{৯} + \frac{১}{৯} + \frac{১}{৯}$

ছবি দ্বারাও ইহা বুঝানো যেতে পারে—

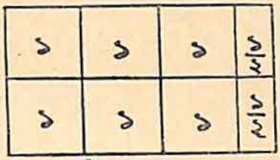


$$\frac{১}{৩} \times ২ = \frac{২}{৩}$$

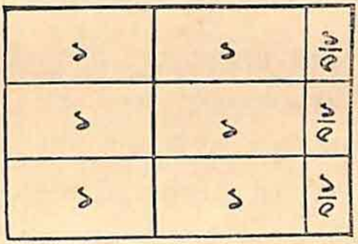
মিশ্রভগ্নাংশও ছবি দ্বারা দেখানো যেতে পারে। যেমন, $৩\frac{১}{২}$



$৩\frac{১}{২}$

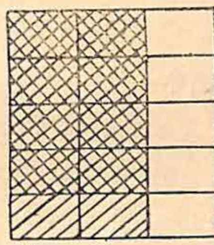


$৩\frac{১}{২} \times ২ = ৭$



$২\frac{১}{৫} \times ৩ = ৬\frac{৩}{৫}$

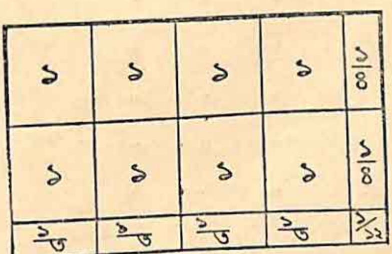
কিন্তু যদি $\frac{১}{৩} \times \frac{১}{২}$ হয় তবে তখন একথা বলা চলে না যে $\frac{১}{২}$ বার $\frac{১}{৩}$, বা $\frac{১}{৩}$ বার $\frac{১}{২}$, কারণ তার কোনও অর্থ হয় না। এখানে মানে হবে $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{২}$ অংশ অর্থাৎ অর্ধেক অথবা $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩}$ অংশ।



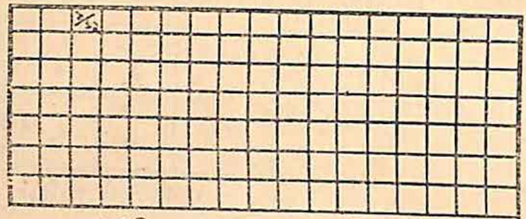
$\frac{২}{৩} \times \frac{৪}{৫} = \frac{৮}{১৫}$

এইভাবে $\frac{২}{৩} \times \frac{৪}{৫}$ এখানেও আগে সমস্ত ক্ষেত্রটির $\frac{২}{৩}$ অংশ বার করা হোলো, তারপর তাকে ৫ ভাগ করে তার ৪ ভাগ নেওয়া হোলো।

$৪\frac{১}{৪} \times ২\frac{১}{৩}$



$৪\frac{১}{৪} \times ২\frac{১}{৩}$



$$\frac{১১৯}{১২} = ৯\frac{১১}{১২}$$

১ একক হিসাবে একটি ক্ষেত্রফল ধরে ৪টি ও সেই অনুপাতেই $\frac{১}{৪}$ একটি খোপ করা হোলো। এই খোপগুলির দ্বিগুণ করা হোলো। তারপর ৪$\frac{১}{৪}$ ক্ষেত্রটিকে ৩ সমান ভাগ করে একটি ভাগ নীচে জুড়ে দেওয়া হোলো। তাতে $\frac{১}{৪}$ অংশটির $\frac{১}{৩}$ হয়ে যাবে একটি ছোট্ট অংশ $\frac{১}{১২}$। এখন সব খোপগুলি যোগ করবার সুবিধার জন্য $\frac{১}{৪}$ ছাড়া আর অন্য খোপগুলিকে লম্বাভাবে ৪ ভাগ করা যায় এবং পরে ৪$\frac{১}{৪}$এর খোপ দুইটি প্রত্যেকটি আড়াআড়িভাবে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। তাহলে প্রত্যেকটি খোপের ক্ষেত্রফল হবে $\frac{১}{১২}$। এইরূপ ১১৯টি খোপ পাওয়া যাবে। সেজন্য গুণফল হবে $\frac{১১৯}{১২}=৯\frac{১১}{১২}$

এইভাবে কিছু চর্চার পর শিক্ষার্থীরা নিয়মটি বুঝে যাবে যে, ভগ্নাংশের গুণ করতে হলে **লব** দুইটির গুণ করতে হবে এবং **হর** দুইটির গুণ করতে হবে।

ভাগ—

গুণে যেমন শিক্ষার্থী আশা করে যে গুণফল সাধারণতঃ বেড়ে যাবে, সেইরূপ ভাগেও শিক্ষার্থী আশা করে যে ভাগফল কমে যাবে। যেমন—২৪টি পয়সা কয়েকটি মেয়ের ভিতর সমান ভাগ করে দিতে হবে।

যদি প্রত্যেককে ১২ পয়সা করে দেওয়া যায় তবে ২ জন পাবে
" " ৮ " " " ৩ " "
" " ৬ " " " ৪ " "
" " ৪ " " " ৬ " "
" " ২ " " " ১২ " "
" " ১ " " " ২৪ " "

সুতরাং ভাগফল সব সময় ২৪ বা ২৪এর কম হয়।

কিন্তু যদি প্রত্যেককে $\frac{১}{২}$ পয়সা করে দেওয়া যায় তবে ৪৮ জন পাবে, অর্থাৎ

ভাগফল তখন ভাজ্য থেকে বড় হয়ে যায়। সুতরাং ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ভাজ্য থেকে বড় হয়ে যায়।

ভাগ বুঝাবার জন্য মৌখিক কিছু অঙ্ক করলে ভাগের নিয়ম বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন—

১ টাকাকে $\frac{১}{২}$ দিয়ে ভাগ করলে কত হয়?

$\frac{১}{২}$ টাকা অর্থাৎ আধুলি ; ১ টাকায় ২ আধুলি।

১ টাকাকে $\frac{১}{৪}$ দিয়ে ভাগ করলে কত হয়?

$\frac{১}{৪}$ টাকা অর্থাৎ সিকি ; ১ টাকায় ৪ সিকি।

১ টাকাকে $\frac{১}{৮}$ দিয়ে ভাগ করলে কত হয়?

$\frac{১}{৮}$ টাকা অর্থাৎ দুআনি ; ১ টাকায় ৮ দুআনি।

১ টাকাকে $\frac{১}{১৬}$ দিয়ে ভাগ করলে কত হয়?

$\frac{১}{১৬}$ টাকা অর্থাৎ ১ আনি ; ১ টাকায় ১৬ আনি।

এর থেকেই শিক্ষার্থীরা বার করবে যে—

$১ \div \frac{১}{২} = ১ \times \frac{২}{১} = ২$ অর্থাৎ ১কে $\frac{১}{২}$ দিয়ে ভাগ মানে ১কে দ্বিগুণ করা

$১ \div \frac{১}{৪} = ১ \times \frac{৪}{১} = ৪$ " ১কে $\frac{১}{৪}$ " " " " ৪ গুণ করা

$১ \div \frac{১}{৮} = ১ \times \frac{৮}{১} = ৮$ " ১কে $\frac{১}{৮}$ " " " " ৮ গুণ করা

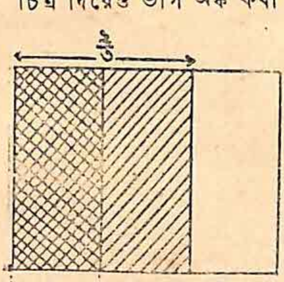
$১ \div \frac{১}{১৬} = ১ \times \frac{১৬}{১} = ১৬$ " ১কে $\frac{১}{১৬}$ " " " " ১৬ গুণ করা

$১ \div \frac{২}{৩} = ১ \times \frac{৩}{২}$ অর্থাৎ ১কে $\frac{২}{৩}$ দিয়ে ভাগ মানে ৩ গুণ করে তার ২ ভাগের ১ ভাগ নেওয়া

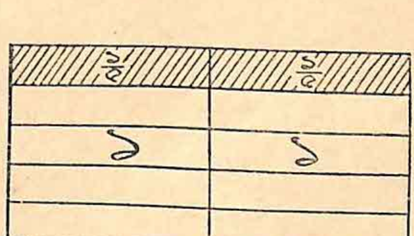
$২ \div \frac{২}{৩} = ২ \times \frac{৩}{২}$ অর্থাৎ ২কে ৩ গুণ করে তার ২ ভাগের ১ ভাগ নেওয়া

সুতরাং কোনও ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করতে হলে ভগ্নাংশটির লবকে হর ও হরকে লব করে যে ভগ্নাংশ হয় ভাজ্যকে তাই দিয়ে গুণ করতে হয়।

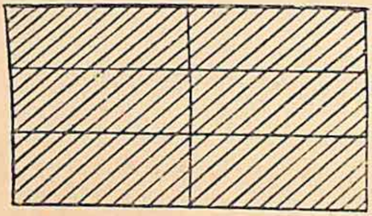
চিত্র দিয়েও ভাগ অঙ্ক কষা যায়। যেমন—$\frac{২}{৩} \div ২$ অথবা $২ \div ৫ =$



$\frac{২}{৩} \div ২ = \frac{১}{৩}$

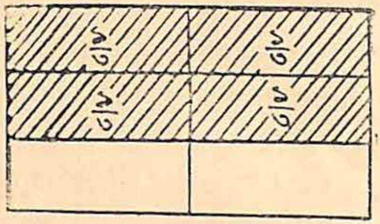


$২ \div ৫ = \frac{২}{৫}$



$\frac{২}{৩} \div \frac{১}{৩} = \frac{২}{৩} + \frac{২}{৩} + \frac{২}{৩} = \frac{৬}{৩} = ২$

$\frac{১}{৩}$ দিয়ে ভাগ করা মানে ৩ দিয়ে গুণ।



$\frac{২}{৩} \div \frac{১}{২} = \frac{২}{৩} + \frac{২}{৩} = \frac{৪}{৩}$

$\frac{১}{২}$ দিয়ে ভাগ করা মানে ডবল করা।

(৩)=১০০০ ভাগের এক ভাগ—একবার ১০ ভাগ করা, আবার দ্বিতীয় বার প্রত্যেকটি ১০ ভাগের ১ ভাগকে ১০ ভাগ করা অর্থাৎ শত ভাগ করা, আবার তৃতীয় বার ১০০ ভাগের ১ ভাগকে দশ ভাগ করে সহস্র ভাগ করে ভাগ করা ইত্যাদি—(তৃতীয়)

অর্থাৎ (১) হচ্ছে দশাংশ, (২) শতাংশ, (৩) সহস্রাংশ ইত্যাদি।

স্টেভিনাস পরে দশমিক সংখ্যা অন্যভাবে লিখতে শুরু করলেন। সে হচ্ছে $৫৮\ \overset{\text{I}}{২}\ \overset{\text{II}}{৪}\ \overset{\text{III}}{০}\ \overset{\text{IIII}}{৩}$ এইভাবে। অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি বড় বড় সংখ্যা না লিখে শুধু একটি, দুইটি আঁক টেনে টেনে চিহ্ন দেওয়া। কিন্তু তাতেও দেখা গেল যথেষ্ট সময়ের দরকার। সেইজন্য কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন যে এককের ঘরের পরে একটি '।' এইরকম চিহ্ন দিলে পরের সংখ্যাগুলি যে দশমাংশ তা বোঝা যাবে। তখন কিছুদিন এইভাবে চল্লো। অর্থাৎ দশমিক সংখ্যা লেখা হোত ৫৮।২৪০৩ এইভাবে। আবার এতেও মুশকিল হোলো। '।' চিহ্নটি একটু ছোট হয়ে গেলেই মনে হোত ইংরেজী ১। সেজন্য স্থির করা হোলো এত বড় রেখার পরিবর্তে ছোট একটু বিন্দু দেওয়া হবে। নেপিয়ার সর্বপ্রথমে এই বিন্দুর ব্যবহার করলেন। কিন্তু তারও অনেক পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিন্দুর সাধারণ প্রচলন দেখা যায়। এই ইতিহাস একটু উল্লেখ করলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টিতে আগ্রহ বোধ করবে।

তারপর আসবে দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করার কথা। ·৪ মানে $\frac{৪}{১০}$ অর্থাৎ ১০ ভাগের ৪ ভাগ তা শিক্ষার্থীরা বুঝেছে। কিন্তু ·৪৩ যে $\frac{৪৩}{১০০}$, তা প্রথমে ঠিক ধরতে নাও পারে। সেজন্য দেখিয়ে দিতে হবে যে—

$$\cdot৪৩ = \frac{৪}{১০} + \frac{৩}{১০০} = \frac{৪০+৩}{১০০} = \frac{৪৩}{১০০}$$

$$\cdot৪৩৫৭ = \frac{৪}{১০} + \frac{৩}{১০০} + \frac{৫}{১০০০} + \frac{৭}{১০০০০}$$

$$= \frac{৪০০০+৩০০+৫০+৭}{১০০০০}$$

$$= \frac{৪৩৫৭}{১০০০০}$$

$$\cdot৫৩০ = \frac{৫}{১০} + \frac{৩}{১০০} + \frac{০}{১০০০}$$

$$= \frac{৫০০+৩০+০}{১০০০}$$

অথবা বলা যেতে পারে যে শেষেরটি '০' এর সমান সেজন্য সেটিকে বাদ দেওয়া চলে।

সুতরাং $\cdot৫৩০ = \frac{৫}{১০} + \frac{৩}{১০০}$

$= \frac{৫০+৩}{১০০}$

$= \frac{৫৩}{১০০}$

এর থেকে বোঝা যাবে যে দশমিক সংখ্যার শেষে যদি '০' থাকে তবে সেই '০' এর মূল্য কিছু নেই।

সুতরাং $\cdot৫৩০০০ = \cdot৫৩$

কিন্তু যদি দশমিক বিন্দুর পরেই বা মাঝে কোনও '০' থাকে যেমন—

$\cdot০৫৩ = \frac{০}{১০} + \frac{৫}{১০০} + \frac{৩}{১০০০}$

$= ০ + \frac{৫০+৩}{১০০০}$

$= \frac{৫৩}{১০০০}$ ... ... (ক)

সুতরাং এই '০'টির মূল্য আছে।

কারণ $\cdot৫৩০ = \cdot৫৩$ (আগে দেখানো হয়েছে)

$\cdot০৫৩ = \cdot৫৩$ নয়—কারণ

$\cdot৫৩ = \frac{৫৩}{১০০}$

$\cdot০৫৩ = \frac{৫৩}{১০০০}$ ... ... (খ)

এখন এর ওপর অনেক চর্চার দরকার ও সেজন্য অনেকগুলি দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে ও সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করবার উদাহরণ দিয়ে চর্চা করা প্রয়োজন। যেমন—

$৫\cdot৪২ = ৫\frac{৪২}{১০০}$; $৬\cdot০৩৭ = ৬\frac{৩৭}{১০০০}$ ইত্যাদি

আবার $\frac{৪৭}{১০০} = \cdot৪৭$; $\frac{২৩০৩}{১০০০} = ২\cdot৩০৩$ ইত্যাদি।

দশমিক শেখার সঙ্গে সঙ্গে ১০, ১০০ ও ১০০০ ইত্যাদি দিয়ে গুণ ও ভাগ কিভাবে সহজে করা যায় তা শিক্ষার্থীরা শিখবে। যেমন—

শ. দ. এ.   স. শ. দ. এ.

১ ৩ ৫×১০ = ১ ৩ ৫ ০ ... (১)

স. শ. দ. এ.   অ. স. শ. দ. এ.

২ ৪ ৬ ৩×১০ = ২ ৪ ৬ ৩ ০ ... (২)

অর্থাৎ (১)এ ১০০ হয়ে যাচ্ছে ১০০০

৩০	”	”	৩০০
৫	”	”	৫০
(২)এ ২০০০	”	”	২০০০০
৪০০	”	”	৪০০০
৬০	”	”	৬০০
৩	”	”	৩০

প্রত্যেকটি অঙ্কের মান এক ঘর বাঁয়ে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি অঙ্ক দশ গুণ প্রাধান্য পাচ্ছে। সেইরকম সংখ্যাটিতে দশমিক থাকলেও ঠিক একই রকম হবে।

$২৫·৩৪\times১০$

$=(২০+৫+\frac{৩}{১০}+\frac{৪}{১০০})\times১০$

$=২০০+৫০+৩+\frac{৪}{১০}$

$=২৫৩\frac{৪}{১০}$

$=২৫৩·৪$

অর্থাৎ ২ দশ হয়ে গেল ২ শত, ৫ একক হয়ে গেল ৫০ ও ·৩ অথবা ৩ দশমাংশ হয়ে গেল ৩ একক, ৪ শতাংশ হয়ে গেল ৪ দশাংশ।

এই নিয়ে অনেক চর্চার দরকার।

১০ দিয়ে ভাগ করলেও আবার দেখা যায়—

$২৫০\div১০=২৫$

২ শত হয়ে গেল ২ দশক

৫ দশক হয়ে গেল ৫ একক

অর্থাৎ প্রত্যেকটি সংখ্যার প্রাধান্য ১০ গুণ কমে যাচ্ছে। সেইরূপ—

$৫·২৩৪\div১০$

$=৫·২৩৪\times\frac{১}{১০}$

$=(৫+\frac{২}{১০}+\frac{৩}{১০০}+\frac{৪}{১০০০})\times\frac{১}{১০}$

$=\frac{৫}{১০}+\frac{২}{১০০}+\frac{৩}{১০০০}+\frac{৪}{১০০০০}$

$=\frac{৫২৩৪}{১০০০০}$

$=·৫২৩৪$

অর্থাৎ দশমিক বিন্দু এক ঘর বামে সরে গিয়েছে এবং প্রত্যেক অঙ্কের প্রাধান্য ১০ গুণ কমে গিয়েছে। এরপর অনেক অঙ্ক কষতে দেওয়া দরকার যাতে ১০ দিয়ে গুণ ও ভাগের যথেষ্ট চর্চা হয়। তা ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিস মনে রাখতে হবে যেমন দশককে দশক দিয়ে গুণ করলে শতক হয়। শতককে দশক দিয়ে গুণ করলে হাজার হয় ইত্যাদি। এইগুলির অনেক চর্চা করলে শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে যে দশ দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে কেন দশমিক বিন্দু বামে বা ডানদিকে সরাতে হয়।

তারপর আসবে দশমিকের যোগ-বিয়োগের কথা। দশমিকের যোগ-বিয়োগের তো কোনও ঝঞ্ঝাট নেই শুধু দেখতে হবে যে নীচে নীচে অঙ্কগুলি বসাবার সময় দশমিক বিন্দু যেন একই লাইনে থাকে। কারণ তাহলে একক, দশক, দশমাংশ, শতাংশ ইত্যাদি সবই একই লাইনে থাকবে ও যোগ করে যোগফল বার করতে সুবিধা হবে।

তারপর দশমিকের গুণ। সাধারণ নিয়ম যা শেখানো হয় তা হচ্ছে যে সংখ্যা দুইটির দশমিক বিন্দু গ্রাহ্য না করে সাধারণ ভাবে গুণ করে যেতে হবে। পরে যে রাশিকে গুণ করা হোলো সেই রাশি ও গুণক রাশি এই দুই রাশিতে দশমিক বিন্দুর পর যে কয়টি অঙ্ক আছে সেই অঙ্ক কয়টির সংখ্যা যোগ করতে হবে ও গুণফলের ডানদিক থেকে গুনে সেই কয়টি অঙ্কের বাঁয়ে দশমিক বিন্দু বসাতে হবে। কিন্তু কেন যে এভাবে গুনে বিন্দু বসাতে হবে তা শিক্ষার্থীরা বুঝে ওঠে না। না বুঝে যান্ত্রিকভাবে করে যায়। যেমন—

```
 ৫২·৩৫৪
    ·২৮
--------
 ৪১৮৮৩২
১০৪৭০৮
--------
১৪·৬৫৯১২
```

কিন্তু এই অঙ্কটি এভাবেও করা যায়—

$$৫২·৩৫৪ \times ·২৮$$
$$= ৫২\frac{৩৫৪}{১০০০} \times \frac{২৮}{১০০}$$
$$= \frac{৫২৩৫৪}{১০০০} \times \frac{২৮}{১০০}$$
$$= \frac{১৪৬৫৯১২}{১০০০০০}$$
$$= ১৪·৬৫৯১২$$

এখানে দশমিক সংখ্যাকে প্রথমে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করে ভগ্নাংশগুলিকে গুণ করতে হয় ও পরে আবার গুণফলকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করতে হয়।

এই পদ্ধতিতে কিছু চর্চা করলে শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে যে কেন গুণ্য ও গুণক রাশির দশমিক বিন্দুর পরের সংখ্যাগুলির সংখ্যা যোগ করে গুণফলে ডানদিক থেকে সেই কয় ঘর গুনে দশমিক বিন্দু বসাতে হয়। কারণ দেখা যাচ্ছে যে ভগ্নাংশ দুইটির হরের গুণফল আর কিছুই নয় '০'র সংখ্যা যোগ করে বসানো। আর প্রত্যেক ভগ্নাংশের হরে দশমিক বিন্দুর পর যে কয়টি সংখ্যা থাকে সেই কয়টি '০'ই বসে।

এই পদ্ধতির সুবিধা আছে যে, শিক্ষার্থীরা এর আগে পর্যন্ত যেভাবে পূর্ণসংখ্যার গুণ করা শিখে এসেছে এ-ও ঠিক সেভাবেই করা। শুধু দশমিক বিন্দু শেষে গুনে বসানো।

এর পরে অনেকগুলি চর্চা করাতে হবে মুখে মুখে। যেন নিয়মটি তাদের মনে দৃঢ়ভাবে বসে যায়। যেমন—

৫·২৩৫৪×২·৮

৫২৩·৫৪×·০২৮

·৫২৩৫৪×২৮

৫২৩৫·৪×·০০০২৮

সেই একই অঙ্ক শুধু দশমিক বিন্দুর স্থান পরিবর্তন করে দিতে হবে।

আর একটি নিয়ম হচ্ছে যাতে গুণক রাশিকে একরকম মানের আকারে (standard form) আনতে হয়। সেই মানটি হচ্ছে যে গুণক রাশি ১ ও ১০ এর ভেতরে থাকবে। গুণক রাশিকে এই আকারে আনতে হলে যদি ১০, ১০০ বা ১০ এর যে-কোনও গুণ দিয়ে গুণ বা ভাগ করতে হয়, তবে গুণফল ঠিক রাখবার জন্য গুণ্যকেও ঠিক সেই রাশি দিয়ে ভাগ বা গুণ করতে হবে। যেমন ২৫৩·৪২১×৩১·৫২ একে এই মানের আকারে আনলে এইরূপ দাঁড়াবে।

২৫৩·৪২১×৩৪·৫২

=২৫৩৪·২১×৩·৪৫২ (গুণককে ১০ দিয়ে ভাগ ও সেইজন্য গুণ্যকে ১০ দিয়ে গুণ করা হোলো।)

২৫৩৪'২১
৩'৪৫২
৭৬০২'৬৩০০০
১০১৩'৬৮৪০০
১২৬'৭ ০৫০
৫'০৬৮৪২
৮৭৪৮'০৯২৯২

দশমিক বিন্দুগুলি ঠিক এক লাইনে বসিয়ে যেতে হবে। এই প্রণালী অনেকে খুব সমর্থন করেন। এতে একটি সুবিধা এই যে দশমিক বিন্দুগুলি একই রেখায় থাকায় গুণফলে দশমিক বিন্দু বসাতে কোনও রকম ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। তা ছাড়া বড় হলে যখন logarithm করতে হয়—তখন এতে অভ্যস্ত থাকলে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু এই standard formএ আনতে যে সব ব্যবস্থা করতে হয় তাতেই শিক্ষার্থীরা অনেক সময় ভুল করে বসে।

আর একটি নিয়ম হচ্ছে এইভাবে বসানো—

২৫৩'৪২১
৩৪'৫২
৭৬০২'৬৩০০০
১০১৩'৬৮৪০০
১২৬'৭১০৫০
৫'০৬৮৪২
৮৭৪৮'০৯২৯২

প্রথমে তিন দশক দিয়ে গুণ করা হোলো। শেষে ৪ একক ইত্যাদি। এতে সুবিধা হচ্ছে যে দশমিক বিন্দু একই রেখায় অবস্থিত থাকে। এবং দ্বিতীয় নিয়মের মত আগে গুণ্য ও গুণক রাশিকে সাজিয়ে নেবার কোন প্রশ্ন আসে না। অথবা এইভাবেও বসানো যেতে পারে—

২৫৩'৪২১
৩৪'৫২
৭৬০২'৬৩০০০
১০১৩'৬৮৪০০
১২৬'৭১০৫০
৫'০৬৮৪২
৮৭৪৮'০৯২৯২

গুণক রাশির একককে গুণ্য রাশির শেষের অঙ্কের নীচে বসিয়ে অন্য অঙ্কগুলি আগে-পরে ঠিক মত বসিয়ে গুণ করতে হবে। যে অঙ্ক দিয়ে

গুণ করা হবে ঠিক সেই অঙ্কের নীচে তার গুণফলটি বসাতে আরম্ভ করতে হবে। আর দশমিক বিন্দু গুণ্য রাশির দশমিক বিন্দুর ঠিক বরাবর বসিয়ে যেতে হবে।

আবার নিম্নলিখিত উপায়ে সাজিয়ে নিয়েও গুণ করা যেতে পারে—

```
২ ৫ ৩˙৪ ২ ১
    ৩ ৪˙৫ ২
──────────────────
৭ ৬ ০ ২˙৬ ৩ ০ ০ ০
১ ০ ১ ৩˙৬ ৮ ৪ ০ ০
  ১ ২ ৬˙৭ ১ ০ ৫ ০
      ৫˙০ ৬ ৮ ৪ ২
──────────────────
৮ ৭ ৪ ৮˙০ ৯ ২ ৯ ২
```

এখানে গুণক রাশির প্রথম অর্থপূর্ণ অথবা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাটি গুণ্য রাশির এককের ঘরের নীচে বসিয়ে তারপর পর পর অন্য সংখ্যাগুলি বসাতে হবে। গুণ করবার সময় গুণকের প্রথম অঙ্কটি দিয়ে গুণ করে গুণ্য সংখ্যার সর্বশেষ সংখ্যাটির নীচে বসাতে আরম্ভ করতে হবে। দশমিক বিন্দু গুণক রাশির দশমিক বিন্দুর বরাবর বসবে।

এই নিয়ম ও আগের নিয়মে সুবিধা এই যে দশমিক বিন্দু গুণফলে বসাতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু অসুবিধা এই যে গুণক ও গুণ্য রাশির দশমিক বিন্দু দুই জায়গায় থাকাতে ঠিকমত গুণফল বসানো ও দশমিক বিন্দু বসানো একটু অসুবিধাজনক মনে হয়।

দশমিকের ভাগ—

গুণের বিপরীত নিয়মই ভাগ। সুতরাং গুণের সময় যেভাবে দশমিক বিন্দু বসানো হয়েছে ভাগের সময়ও ঠিক সেই ভাবেই বসানো যেতে পারে।

যেমন ২৭˙৩৪৮৬৫ ÷ ˙৪৫

$$= \frac{২৭৩৪৮৬৫}{১০০০০} \times \frac{১০০}{৪৫}$$

$$= \frac{২৭৩৪৮৬৫}{৪৫} \times \frac{১০০}{১০০০০}$$

$$= \frac{৬০৭৭}{১০০}$$

$$= ৬০˙৭৭$$

নিয়মটি সহজেই বোধগম্য। ভাজ্য ও ভাজককে সাধারণ সংখ্যা মনে করে সাধারণ ভাবে ভাগ করে যেতে হয়। তারপর ভাজ্যে দশমিকের পরে যে কয়টি সংখ্যা আছে তা গুনে তার থেকে ভাজকে দশমিকের পরে যে কয়টি

সংখ্যা আছে তা বাদ দিয়ে ভাগফলে ডানদিক থেকে গুনে সেই কয়টি সংখ্যার পরে বসাতে হবে। এ নিয়মটি শিক্ষার্থী সহজেই বুঝবে। ওপরে যেভাবে করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে নিয়ম হচ্ছে যে ভাজ্য ও ভাজককে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করে তারপর সাধারণ ভগ্নাংশের মত ভাগ করতে হয়।

আর একটি নিয়ম হচ্ছে যে ভাজককে পূর্ণসংখ্যায় পরিবর্তিত করে নেওয়া। ভাজককে পূর্ণসংখ্যায় পরিবর্তিত করতে যে কয় ঘর দশমিক সরাতে হয় ভাজ্যেরও সেই কয় ঘর দশমিক সরানো দরকার। তারপর ভাগ করতে হয়। ভাগ করতে গিয়ে ভাজ্যের দশমিক যখন এসে পড়বে তখনই দশমিক বিন্দু বসিয়ে দিতে হয়। যেমন—

২৭·৩৪৬৫ ÷ ·৪৫

```
       ৬০·৭৭
    ------------
৪৫ )২৭৩৪·৬৫
    ২৭০
    -----
      ৩৪৬
      ৩১৫
     ------
       ৩১৫
       ৩১৫
     ------
```

এই নিয়মটি বোঝানো বেশী কষ্টকর নয়। কারণ নিয়ম হচ্ছে $\frac{২৭·৩৪৬৫}{·৪৫}$ ভগ্নাংশটির হর ও লবকে ১০০ দিয়ে গুণ করলেই হবে। এখন ১০০ দিয়ে গুণ করতে হচ্ছে কারণ ·৪৫কে ১০০ দিয়ে গুণ করলেই সংখ্যাটি পূর্ণসংখ্যা হবে।

আর একটি নিয়ম হচ্ছে—ভাজককে একটি মানে পরিবর্তিত করা। যাকে বলা হয় standard form। অর্থাৎ ভাজকে দশমিকের আগে যেন শুধু একটি অঙ্ক থাকে। আর সেই হিসেবে ভাজ্যের দশমিকও সরাতে হবে। যেমন—

$$\frac{২৭·৩৪৬৫}{·৪৫} = \frac{২৭৩·৪৬৫}{৪·৫}$$

```
৪·৫ )২৭৩·৪৬৫
```

এখানে ২৭৩·৪কে ৪ দিয়ে ভাগ করলেই বোঝা যাবে দশমিক বিন্দু কোথায় বসবে।

এইরূপ আরও কয়েকটি অঙ্ক করলে শিক্ষার্থী নিয়মটি বুঝতে পারবে যে পৌনঃপুনিক সংখ্যা কয়টির জন্য ৯ বসাতে হয় ও যার ওপর পৌনঃপুনিক নেই তার জন্য '০' বসাতে হয় এবং সেই সংখ্যা সমস্ত সংখ্যা থেকে বাদ দিতে হয়।

'৯ = ১ ইহাও শিক্ষার্থীরা বার করবে ও এতে আনন্দ পাবে।

টাকা আনা পয়সাকে দশমিকে পরিণত করলে অনেক সময় অঙ্কের সুবিধা হয়। যেমন—

১১৫।১০কে ২২৫ দিয়ে গুণ করতে হলে যদি আনা পয়সাকে দশমিকে পরিবর্তিত করা যায় তবে সুবিধা হয়। যেমন—

।০ = $\frac{১}{৪}$ টাকা = '২৫ টাকা

‹১০ = $\frac{১}{৩২}$ টাকা = '০৩১২৫ টাকা

তা হলে ১১৫।১০ = ১১৫ + '২৫ + '০৩১২৫ টাকা

= ১১৫'২৮১২৫ টাকা

এখন এই দশমিক সংখ্যাটিকে ২২৫ দিয়ে গুণ করা যায়। তবে একটা কথা এই যে দশমিকের পরে ৩ ঘরের বেশী হলে একটু অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে, কারণ কাজ একটু দীর্ঘ হয়ে পড়ে। কিন্তু এইটুকু শিক্ষার্থীরা নিজেরা তৈরি করে রাখতে পারে যে—

৮ আনা = '৫ টাকা

৪ " = '২৫ "

২ " = '১২৫ "

১ " = '০৬২৫ "

বর্গমূল

বর্গমূল বার করবার আগে বর্গফল সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকা দরকার। যেমন ৯ এর বর্গফল = ৯×৯ = ৮১ = $৯^২$, ৭এর বর্গফল ৭×৭ = ৪৯ = $৭^২$ ইত্যাদি।

বর্গফলের ধারণা হলে তারপর আসবে বর্গমূলের ধারণা। যেমন—

৯ = ৮১ এর বর্গমূল = $\sqrt{৮১}$

৭ = ৪৯ এর " = $\sqrt{৪৯}$

ইত্যাদি

বর্গমূল শেখাতে হলে প্রথমে উৎপাদকের সাহায্যে বর্গমূল বার করবার নিয়ম শেখাতে হবে। যেমন—

$১৪৪ = ২ \times ২ \times ২ \times ২ \times ৩ \times ৩$

$\therefore \sqrt{১৪৪} = ২ \times ২ \times ৩ = ১২$

প্রত্যেক দুইটি উৎপাদকের জন্য বর্গমূল একটি ধরতে হবে। ভগ্নাংশের বর্গমূল বার করবার সময় মনে রাখতে হবে যে মিশ্র ভগ্নাংশকে অমিশ্র ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করে নিতে হবে।

$\sqrt{১\frac{৯}{১৬}} = \sqrt{\frac{২৫}{১৬}} = \frac{৫}{৪}$

কিন্তু সাবধান হতে হবে যে ভুল করে যেন কেউ $\sqrt{১\frac{৯}{১৬}} = ১\frac{৩}{৪}$ না করে। কারণ এরকম ভুল হওয়া আশ্চর্য নয়—

$\sqrt{১\frac{৯}{১৬}} = \sqrt{১ \times ১ \times \frac{৩}{৪} \times \frac{৩}{৪}}$

$\therefore$ বর্গমূল $= ১\frac{৩}{৪}$

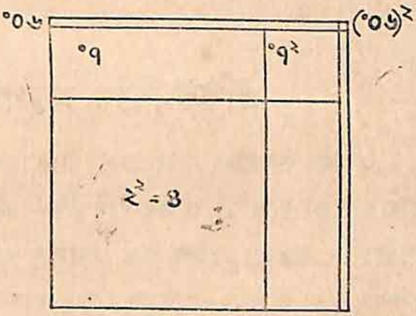
সুতরাং মিশ্র ভগ্নাংশকে অমিশ্র ভগ্নাংশে আগে পরিবর্তিত করতে হবে।

সাধারণতঃ বর্গমূল বার করতে হলে ২টি করে অঙ্ক একসঙ্গে করে জোড়া করে নিতে হয়। শিক্ষার্থীরা দেখবে যে এর কারণ হচ্ছে এক অঙ্কের সংখ্যা অথবা দুই অঙ্কের সংখ্যার বর্গমূল ১ অঙ্কের সংখ্যা। তিন অথবা চার অঙ্কের সংখ্যার বর্গমূল হয় দুই অঙ্কের সংখ্যা। আবার পাঁচ অথবা ছয় অঙ্কের সংখ্যার বর্গমূল হয় তিন অঙ্কের সংখ্যা। সেজন্য দশমিকের আগে ও পরে যদি জোড়া জোড়া অঙ্ক নেওয়া যায় তবে যত জোড়া হবে তত সংখ্যক অঙ্ক বর্গমূলে থাকবার সম্ভাবনা। দশমিকের বামেও জোড়া করে নিতে হবে ও সেই অনুসারে পূর্ণ সংখ্যা হবে। যেমন ১০৩৭·২২৬৪৩৬এর বর্গমূল যদি বার করতে হয় তবে নিম্নলিখিত ভাবে জোড়া করে নিলে সুবিধা হবে—

	৩	২·	২	০	৬
৩	১০	৩৭	·২২	৬৪	৩৬
	৯				
৬২	১	৩৭			
	১	২৪			
৬৪২		১৩	·২		
		১২	৮৪		
৬৪৪০৬			৩৮	৬৪	৩৬
			৩৮	৬৪	৩৬

প্রথমে নিয়মানুসারে কতকটা করে যাবে, কিন্তু পরে যখন উচ্চ শ্রেণীতে উঠবে তখন নিয়মটি কেন হয় তার ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে ছোট একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। যেমন $\sqrt{৭·৬১৭৬}$

	২·	৭	৬
২	৭·	৬১	৭৬
	৪		
৪৭	৩	৬১	
	৩	২৯	
৫৪৬		৩২	৭৬
		৩২	৭৬



৭এর নীচে সব চেয়ে বড় বর্গক্ষেত্র হচ্ছে ৪। সুতরাং ৭·৬১৭৬ − ৪ = ৩·৬১৭৬ খালি জায়গা আরও বাকী থাকবে। বর্গক্ষেত্রটির দুইদিকে একটু বাড়িয়ে আরও খানিকটা জায়গা পাওয়া যায়। এখন কতটা বাড়ানো হবে সেই হচ্ছে প্রশ্ন। যদি x বাড়ান যায় তবে পাওয়া যাবে $২ \times x + ২ \times x + x^২$ অথবা $৪x + x^২$ অর্থাৎ $(২ \times ২)x + x^২$।

এখন x কত হবে সেটা পাওয়া যাবে বাকী যে অংশ আছে তার থেকে।

$$\frac{৩·৬১৭৬}{৪} = ·৯০২৯$$

কিন্তু দেখা যায় $৪ \times ·৯ + (·৯)^২ = ৩·৬ + ·৮১ = ৪·৪১$

ইহা ৩·৬১৭৬ থেকে বড় হয়ে যায়। সেজন্য ·৮ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তবে পাওয়া যায়—$৪ \times ·৮ + (·৮)^২ = ৩·২ + ·৬৪ = ৩·৮৪$

এ-ও বেশী হয়ে যায়, সেজন্য দেখতে হবে—$৪ \times ·৭ + (·৭)^২ = ২·৮ + ·৪৯ = ৩·২৯$

তাহলে এখন বাকী রইল $৭·৬১৬ - (৪ + ৩·২৯) = ৭·৬১৬ - ৭·২৯ = ·৩২৭৬$

এখন কথা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রটি আর একটু বড় করতে হবে। কতটুকুর মত বাড়াতে হবে তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে এই থেকে যে $২ \times ২·৭ = ৫·৪$

সুতরাং $\frac{·৩২৭৬}{৫·৪} = ·০৬$এর মত।

তাহলে একটি বর্গক্ষেত্র পাওয়া গেল যার এক বাহু = ২·৭৬।

এখন ক্ষেত্রফল যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে—

$$২^২ + ২ \times ·৭ + ২ \times ·৭ + ৭^২ + ২·৭ \times ·০৬ + ২·৭ \times ·০৬ + (·০৬)^২ = ৭·৬১৭৬$$

সুতরাং দেখা গেল একটি সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্র তৈরী হয়েছে, যার বাহু= ২·৭৬। এভাবে দেখিয়ে দিলে কেন ভাজক সব সময় ভাগফলের দ্বিগুণ করতে হয় তা শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে।

ঐকিক নিয়ম, অনুপাত ও সমানুপাত

৩ গজ কাপড়ের দাম ১২৲ টাকা হলে ১ গজের দাম কত ও ১ গজের দাম ৪ টাকা হলে ১০ গজের দাম কত—এই দুইটি প্রশ্নের উত্তরই শিক্ষার্থী দিতে পারবে। সুতরাং দুইটি অঙ্ক মিলিয়ে প্রশ্ন যখন থাকে যে ৩ গজ কাপড়ের দাম ২।৶০ হলে ১০ গজ কাপড়ের দাম কত হবে—তখন অঙ্কটি কষতে গেলে দেখবে যে প্রথমে বার করলে সুবিধা হয় ১ গজ কাপড়ের দাম কত। অঙ্কটি লিখতে হবে এইভাবে—

৩ গজ কাপড়ের দাম— ২।৶০=৩৯ আনা

১ " " " $\frac{৩৯}{৩}$ "

১০ " " " $\frac{\overset{১৩}{\cancel{৩৯}}}{\cancel{৩}}\times ১০$

=১৩০ আনা

=৮৵০ আনা

নিয়ম হচ্ছে যা দেওয়া আছে তা বিশ্লেষণ করে একটি বাক্যে প্রকাশ করতে হবে এমন ভাবে যে, যা বার করতে হবে তার বিবরণ যেন সব চেয়ে শেষে আসে। একটির দাম বার করে নিয়ে তারপর যতখানার দরকার তার দাম বার করতে হয়। সেজন্য এই নিয়মকে ঐকিক নিয়ম বলে। অঙ্কটি হয়ে গেলে উত্তর লেখার সময় এককটি স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে।

ঐকিক নিয়মে এই সব অঙ্ক কষা ছেলে মানুষদেরই উপযুক্ত নিয়ম। ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এই নিয়মে অঙ্ক কষবে। কিন্তু তারপরেই যখন তারা এই নিয়মটি বেশ আয়ত্তে আনবে তখন আর এই নিয়মে ঠিক না করলেও চলবে। তখন আর দ্বিতীয় ধাপ করার কোনও প্রয়োজন নেই। এই সময় অনুপাত (ratio)-এর ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

যেমন, ৮খানা চেয়ারের দাম যদি ৯৬ টাকা হয় তবে ১৭খানা চেয়ারের দাম কত?

এখানে প্রশ্নটি পড়তে হবে এইভাবে—

চেয়ারের দাম $\frac{১৭}{৮}$ এই অনুপাতে বাড়ছে।

সেজন্য দাম পড়বে $\overset{১২}{\cancel{৯৬}} \times \frac{১৭}{\cancel{৮}} = ২০৪$ টাকা।

কিম্বা ৩$\frac{১}{২}$ গজ কাপড়ের দাম ৮৲ হলে ২ গজ কাপড়ের দাম কত?

এখানে কাপড়ের দাম কমবে $\frac{২}{৩\frac{১}{২}}$ এই অনুপাতে।

সেজন্য কাপড়ের দাম হবে $৮ \times \frac{২}{\frac{৭}{২}} = ৮ \times \frac{৪}{৭} = \frac{৩২}{৭} = ৪\frac{৪}{৭}$ টাকা।

অনুপাত ও সমানুপাতের ধারণা দেওয়া যেতে পারে এইভাবে—

১	গজ	কাপড়ের	দাম	৩৲
২	"	"	"	৬৲
৩	"	"	"	৯৲
৪	"	"	"	১২৲
৫	"	"	"	১৫৲
৬	"	"	"	১৮৲
৭	"	"	"	২১৲
৮	"	"	"	২৪৲
১০	"	"	"	৩০৲
১৫	"	"	"	৪৫৲

এর থেকে দেখা যায় যে, যে অনুপাতে কাপড়ের পরিমাণ বাড়ে, সেই অনুপাতে কাপড়ের দামও বাড়ে। এখন যদি যে-কোনও দুইটি কাপড়ের পরিমাণ নেওয়া যায় ও সেই পরিমাণ অনুযায়ী কাপড়ের দামও নেওয়া যায় তবে পাওয়া যায়—

	গজ	টাকা
	$\frac{৪}{৭}$	$\frac{১২}{২১}$
অথবা	$\frac{৫}{৯}$	$\frac{১৫}{২৭}$

দেখা যায় যে এই ভগ্নাংশগুলি সমান।

অর্থাৎ ৫ গজ কাপড়ের সঙ্গে ৯ গজ কাপড়ের যা সম্পর্ক, ১৫৲ টাকার সঙ্গে ২৭৲ টাকার সেই সম্পর্ক। অঙ্কের ভাষায় বলা চলে ৫ ও ৯এর

ভেতর যে অনুপাত, ১৫ ও ২৭এর ভেতর সেই অনুপাত। ভাগের চিহ্ন দেওয়া হয় এইভাবে '÷'। ওপরে ও নীচে দুইটি বিন্দুর পরিবর্তে যদি দুইটি সংখ্যা বসান যায় তবেই হয়ে যায় একটি ভগ্নাংশ। ওপরে যদি ৭ ও নীচে ৮ বসান যায় তবে অর্থ হয় কোনও এক জিনিসের ৮ ভাগের ৭ ভাগ, অথবা ৭টি জিনিস ৮ ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে যা পড়ে তাই। ভগ্নাংশ মানে ভাগফল বোঝা যায়। অনুপাত বললেও ভাগফলই বোঝা যায়। এক সংখ্যা আর এক সংখ্যার ভেতরে কতবার আছে এই অর্থে ব্যবহার হয়।

যখন দুইটি অনুপাত সমান হয় তখন লেখা হয় এইভাবে—$\frac{৫}{৯}=\frac{১৫}{২৭}$ এবং পড়া হয় এইভাবে—৫এর সঙ্গে ৯এর যা সম্পর্ক, ১৫এর সঙ্গে ২৭এরও সেই সম্পর্ক। এইভাবেই সমানুপাতের ধারণাও এসে যায়। এইরকম দুইটি অনুপাতের বিবৃতিকেই সমানুপাতের বিবৃতি বলা হয়, এবং লেখা হয় এইভাবে—৫ : ৯ : : ১৫ : ২৭। তাহলে মনে রাখতে হবে, দুইটি অনুপাত সমান হলেই তাদের সমানুপাত বলা হয়।

কয়েকটি অঙ্ক দিয়ে সমানুপাতের অর্থ সহজ করে দেওয়া যায়। যেমন ২ পাউণ্ড চায়ের দাম যদি ৬৸০ হয় তবে ২৩৷৶০তে কত পাউণ্ড চা পাওয়া যাবে ?

এরকম ক্ষেত্রে অঙ্কটি দাঁড়াবে এইরূপ—

ধরা যাক ২৩৷৶০তে x পাউণ্ড চা পাওয়া যাবে। তবে—

চা	দাম
x	২৩৷৶০ = ৩৭৮ আনা
২	৬৸০ = ১০৮ "

অথবা $\frac{x}{২}=\frac{৩৭৮}{১০৮}$

অথবা $x=\frac{৩৭৮\times ২}{১০৮}$ = ৭ পাউণ্ড।

ত্রৈরাশিক পদ্ধতি (Rule of three)

সমানুপাতের ব্যবহার করে ত্রৈরাশিকের নিয়মে অঙ্ক করার প্রথা অনেকদিন উঠে গিয়েছে। এখন ঐকিক নিয়মই বেশী ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ত্রৈরাশিক

পদ্ধতির উপর পরীক্ষামূলক কাজ হয়েছে। Mr. Winch ইংলণ্ডে এবিষয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট উপকার আছে এবং যদি ছোট ছোট সংখ্যা দিয়ে করা যায়, সমানুপাতের অঙ্ক অনেক আগেই আরম্ভ করা যায়। ইংলণ্ডের মিস্ টমসন এই পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজ করে দেখিয়েছেন যে ঐকিক নিয়ম ভাল সন্দেহ নেই; কিন্তু ত্রৈরাশিক পদ্ধতি অথবা ভগ্নাংশের নিয়ম আরও বেশী কার্যকরী। অবশ্য ঐকিক নিয়ম দিয়েই আরম্ভ করতে হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভগ্নাংশের পদ্ধতিতেই অঙ্ক কষা সুবিধা-জনক। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যেতে পারে, যদি ৩ সের ঘির দাম ৭৵০ হয় তবে ২ সের ঘির দাম কত হবে? ঐকিক নিয়ম অনুসারে করলে এভাবে করা যায়—

৩ সের ঘির দাম ৭৵০

১ " " " $\frac{৭৵০}{৩}$

২ " " " $\frac{৭৵০}{৩}\times২$

ভগ্নাংশ পদ্ধতিতে হলে এইভাবে হবে—

৩ সের ঘির দাম ৭৵০

২ " " " ৭৵০$\times\frac{২}{৩}$

প্রথম পদ্ধতি ও দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কোনও পার্থক্য আছে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় না। মনে হয়, দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ ভগ্নাংশ পদ্ধতিতে কেবল মাঝের ধাপটি বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে মানসিক ক্রিয়া দুই পদ্ধতিতে দুই রকম। প্রথম পদ্ধতিতে একটি জিনিসের মূল্যের ধারণা প্রথম মনে আসে; কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটির মূল্যের কথা মনে আসে না, দুইটির ভিতর অনুপাতের কথাই বেশী মনে আসে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে ঐকিক নিয়ম ব্যবহার করাই বেশী সহজ, আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের পদ্ধতিই ব্যবহার করা সহজ। যেমন, ৩ সের ঘির দাম ৭৵০ হলে ১৬ সেরের দাম কত বার করতে দিলে ঐকিক নিয়মই বেশী সুবিধাজনক, কিন্তু যদি ১৫ সেরের দাম বার করতে দেয় তবে ভগ্নাংশের পদ্ধতিই বেশী কার্যকরী হয়।

ভগ্নাংশ প্রণালী ব্যবহার করতে হলে নিম্নলিখিত ভাবে অগ্রসর হতে হয়—

(১) প্রশ্নটির ভিতর যেটি উত্তর হবে সেই সংখ্যাটি—সেটি টাকা, আনা, সের, ছটাক, গজ, ফুট বা যাই হোক্, তা লিখতে হবে। (২) তারপর অন্য দুইটি সংখ্যা ওপর নীচে বসিয়ে একটি ভগ্নাংশ তৈরি করতে হবে। এখন প্রশ্ন উঠবে দুইটির ভিতর কোন্‌টি উপরে বসবে আর কোন্‌টি নীচে বসবে। সেটি নির্ভর করবে সম্ভাব্য উত্তরের ওপর। প্রশ্নটি পড়ে যদি বোঝা যায় যে উত্তরটি যা দেওয়া আছে তার থেকে বড় হবে, তবে বড় সংখ্যাটি ওপরে ও ছোট সংখ্যাটি নীচে বসাতে হবে। আর যদি বোঝা যায় যে উত্তরটি যা দেওয়া আছে তার থেকে ছোট হবে, তবে ছোট সংখ্যাটি ওপরে ও বড় সংখ্যাটি নীচে বসাতে হবে। সুতরাং এইভাবে সঙ্গে সঙ্গে অনুপাতের ধারণাও এসে যায়।

শতকরা

শতকরার অর্থটি শিক্ষার্থীদের খুব ভাল করে বুঝতে হবে। কোনও জিনিস মাপতে গেলে একটি প্রমাণ মাপ দরকার—যার সঙ্গে তুলনা করে মাপলে প্রকৃত মাপটি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। ১০০ সংখ্যাটি সেজন্য একটি প্রমাণ সংখ্যা ধরে নেওয়া হয়েছে। ১০০ এর পরিবর্তে যে-কোনও সংখ্যা ইচ্ছে করলে নেওয়া যেতো। ১০০ এর সুবিধা এই যে অনেক সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য, যেমন ২, ৪, ৫, ১০, ২০, ২৫, ৫০ ইত্যাদি। কিন্তু একটি মস্ত অসুবিধা যে ৩ দ্বারা বিভাজ্য নয়। শতকরা ৫ মানে প্রতি শতে পাঁচ। ইহা লেখা হয় ৫/১০০ এইভাবে। এই জিনিসটি যাতে শিক্ষার্থী খুব ভাল করে বোঝে সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ এই হচ্ছে গোড়ার কথা। যদি কোনও সমস্যায় ক্রয়মূল্য বার করবার প্রশ্ন থাকে তবে ক্রয়মূল্যটি এই প্রমাণ মূল্য অর্থাৎ ১০০ ধরে নিতে হয়। তাহলে সুবিধা হয় এই যে যদি ধরা হয় যে শতকরা ১০ টাকা লাভে সে জিনিসটি বিক্রি করে তবে এই বোঝা যাবে যে সে ১১০ টাকায় জিনিসটি বিক্রি করেছে। যদি সে জিনিসটিকে শতকরা ১২ টাকা ক্ষতিতে বিক্রি করে থাকে তবে বোঝা যাবে যে ৮৮ টাকায় সে বিক্রি করেছে। শতকরার অধিকাংশ অঙ্কই অনুপাত ও সমানুপাতের অঙ্ক। যদি

শতকরা ৩ টাকা বাদ দিয়েও একজনের ধার ১৬০৲ টাকা হয়, তবে শতকরা ৪ টাকা বাদ দিলে ধার কত থাকবে? এইভাবে লিখে করা যায়—

যখন সংখ্যাটি ১০০ টাকা হিসাবে ধরা হয় তখন সংখ্যাটি	ধার
৯৭৲	১৬০৲
৯৬৲	x

$$\text{সুতরাং } x=\frac{১৬০\times৯৬}{৯৭}$$

আর একটি উদাহরণ :—

একটি ফলওয়ালা আম কিনলো ৫৲ করে প্রত্যেক ঝুড়ি, আর প্রত্যেক ঝুড়িতে ৩০টি করে আম আছে। সেই আম সে ৫৲ প্রতি ঝুড়িই বিক্রি করলো, কিন্তু প্রত্যেক ঝুড়িতে ২৪টি করে আম। এইভাবে বিক্রি করায় তার শতকরা কত লাভ হোলো?

অঙ্কটি হবে এইরূপ—

আম	যত টাকায় কেনা হোলো
৩০টি ঝুড়ি	১০০
২৪ „ „	x (টাকায় বিক্রি)

$$x=\frac{\overset{৫}{\cancel{৩০}}}{\underset{৪}{\cancel{২৪}}}\times\overset{২৫}{\cancel{১০০}}=১২৫$$

সুতরাং ১০০ টাকার ওপর ২৫ টাকা লাভ হোলো। সেজন্য উত্তর হবে ২৫%।

উদাহরণ—

এক ডিমওয়ালা টাকায় ৯টি করে ডিম কিনলো। টাকায় কয়টি করে বিক্রি করলে তার শতকরা ১২$\frac{১}{২}$ টাকা লাভ হবে?

এখানে অঙ্কটি হবে এইরূপ—

ডিম	যত টাকায় কেনা হোলো
৯টি করে টাকায়	১০০
x	১১২$\frac{১}{২}$ (টাকায় বিক্রি)

$$x=\frac{১০০\times৯}{১১২\frac{১}{২}}=\frac{\overset{৪}{\cancel{১০০}}\times২\times\cancel{৯}}{\underset{\cancel{৯}}{\cancel{২২৫}}}=৮$$

সে ৮টি করে বিক্রি করলে ১২½% লাভ করতে পারবে।

সুতরাং এইসব ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনুপাতের প্রশ্ন আসে এবং ভগ্নাংশের নিয়মে এই অঙ্ক সহজে করা যেতে পারে।

সুদকষা

শতকরা বিষয়টি বেশ বুঝলে পরে সুদকষা বুঝতে অসুবিধা হবে না। কতকগুলি ছোট ছোট উদাহরণ আগে মুখে মুখে করে অথবা লিখে অঙ্ক কষে চর্চা করলে তখন নিয়মটি শিক্ষার্থী বুঝে ফেলবে। ধীরে ধীরে এই Formulaটি সে তৈরি করবে—

$$I=\frac{p\times t\times r}{100}$$

$$A=p+I$$

অথবা $\text{সুদ}=\frac{\text{আ}\times\text{স}\times\text{হা}}{১০০}$　　আ=আসল
স=সময়
হা=হার

এই Formula ব্যবহার করেই সুদ, আসল, হার ইত্যাদি সবই বার করতে পারবে।

গ. সা. গু. ও ল. সা. গু.

দুই বা ততোধিক সংখ্যার গ. সা. গু. অর্থাৎ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক দুইভাবে বার করা যায়—(১) উৎপাদকের সাহায্যে, (২) দুই সংখ্যাকে পুনঃপুনঃ ভাগ করে। যেমন ১০ ও ১৬এর গ. সা. গু. বার করতে হবে।

```
১০)১৬(১
   ১০
   ──
    ৬)১০(১
       ৬
      ──
       ৪)৬(১
         ৪
        ──
         ২)৪(২
           ৪
           ─
```

গ. সা. গু.—২

এই পুনঃপুনঃ ভাগের ফলে গ. সা. গু. কেমন করে বার করা হয় সেইটি শিক্ষার্থীদের বোঝা দরকার। নিম্নশ্রেণীতে যান্ত্রিকভাবে করতে দেওয়া হবে। উচ্চশ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের নিয়মটি বোঝানো যেতে পারে। এ বুঝবার জন্য আগে কয়েকটি উপপাদ্য আলোচনার দরকার।

১ম উপপাদ্য—

যদি a সংখ্যাটি b সংখ্যার গুণনীয়ক হয় তবে a সংখ্যা b সংখ্যার যে-কোনও গুণিতকের গুণনীয়ক হবে।

প্রমাণ—

a সংখ্যা b এর গুণনীয়ক

অর্থাৎ $b = a \times k$, (k সংখ্যাটি পূর্ণসংখ্যা)

$\therefore \quad b \times m = (a \times k) \times m$

$= a \times (k \times m)$

$\therefore$ a সংখ্যা $b \times m$ সংখ্যার গুণনীয়ক।

২য় উপপাদ্য—

যদি a সংখ্যাটি b ও c সংখ্যা দুইটির সাধারণ গুণনীয়ক হয় তবে a সংখ্যাটি b ও c সংখ্যা দুইটির যে-কোনও গুণিতকের যোগ বা বিয়োগ-ফলের সাধারণ গুণনীয়ক হবে। অর্থাৎ a সংখ্যাটি $mb \pm nc$ এর সাধারণ গুণনীয়ক হবে।

প্রমাণ—

a সংখ্যা b ও c সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক

∴ $b = ka$, $c = la$, (k ও l পূর্ণসংখ্যা)

∴ $mb \pm nc = mka \pm nla = a(mk \pm nl)$

∴ a সংখ্যা $mb \pm nc$ সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক।

৩য় উপপাদ্য—

A কে B দিয়ে ভাগ করলে যদি C অবশিষ্ট থাকে তবে A এবং B এর গ. সা. গু., B এবং C এর গ. সা. গু. এর সমান হবে।—

ধরা যাক $A = QB + C$ ... (১)

∴ $C = A - QB$ ... (২)

(১) এর থেকে পাওয়া যায় যে B ও C এর সাধারণ গুণনীয়ক $QB+C$ এর অর্থাৎ A র গুণনীয়ক। সুতরাং B ও C এর সাধারণ গুণনীয়ক A ও B এরও সাধারণ গুণনীয়ক।

(২) এর থেকে পাওয়া যায় যে A ও B এর সাধারণ গুণনীয়ক $A - QB$ এর অর্থাৎ C এর সাধারণ গুণনীয়ক।

সুতরাং A ও B এর সাধারণ গুণনীয়ক এবং B ও C এর সাধারণ গুণনীয়ক এক।

∴ A ও B এর গ. সা. গু. = B ও C এর গ. সা. গু.। এখন ২টি সংখ্যার গ. সা. গু. কেন পুনঃপুনঃ ভাগ করে পাওয়া যায় তা বোঝা যাবে যদি নীচের অঙ্কটি বুঝতে চেষ্টা করা যায়। A ও B দুইটি সংখ্যা যাদের গ. সা. গু. বার করতে হবে।

```
B) A (P
   PB
   ---
   C) B (Q
      QC
      ---
      D) C (R
         DR
         ---
         N) D (Z
            ZN
            ---
```

D কে N দিয়ে ভাগ করায় আর অবশিষ্ট রইল না। সেজন্য N ও D এর গ. সা. গু. N।

এখন A ও B এর গ. সা. গু.

= B " C " "

= C " D " "

= D " N " "

∴ A ও B এর গ. সা. গু.=N

দুইটি সংখ্যার গুণফল তাদের ল. সা. গু. ও গ. সা. গু. এর গুণফলের সমান।

ধরা যাক্ A ও B এই দুইটি সংখ্যার গ. সা. গু. = f

তাহলে A=af, B=bf ; a, b পরস্পর মৌলিক সংখ্যা। কারণ a ও b এর যদি সাধারণ গুণনীয়ক থাকে তবে f গ. সা. গু. হতে পারে না।

A ও B এর ল. সা. গু. বার করতে হলে Aর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গুণিতকটি বার করতে হবে এবং সেই গুণিতকটি B দ্বারা বিভাজ্য হওয়া চাই।

সুতরাং A ও B এর ল. সা. গু.=mA, যেখানে m হচ্ছে ক্ষুদ্রতম পূর্ণসংখ্যা যাকে A দিয়ে গুণ করলে গুণফল B দ্বারা বিভাজ্য হবে।

এখন $\frac{mA}{B} = \frac{maf}{bf} = \frac{ma}{b}$

সুতরাং b নিশ্চয়ই maর একটি গুণনীয়ক। কিন্তু b ও a পরস্পর মৌলিক সংখ্যা। সেজন্য b নিশ্চয়ই mএর গুণনীয়ক হবে। সুতরাং m এর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম মান b

∴ A ও B এর ল. সা. গু.$=bA = \frac{B}{f} A = \frac{AB}{f}$

অথবা A ও B এর ল. সা. গু. × গ. সা. গু. = AB

বীজগণিত

বীজগণিতকে বলা হয় অঙ্কের সামান্যীকরণ (generalization), অর্থাৎ অনেকগুলি অঙ্ক কষবার পর যখন একটি সাধারণ নিয়মে উপস্থিত হওয়া যায় তখনই বীজগণিত এসে যায়। অঙ্ক ও বীজগণিতের ভিতর ঠিক সীমা নিরূপণ করা দুরূহ। এই দুইটিতে বিষয়বস্তুর পার্থক্য যে খুব বেশী তা নয়। বরং বলা যেতে পারে যে, একই বিষয় বিভিন্ন মনোভাব নিয়ে দেখা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যেতে পারে যে, শিক্ষার্থীকে প্রথমে বুঝিয়ে দেওয়া হোলো যে কোনও একটি ক্ষেত্রের পরিমাণ হচ্ছে যত বর্গ একক পরিমাণ স্থান সেখানে থাকে তাই। সেই বর্গ একক বর্গইঞ্চি, বর্গফুট, বর্গগজ ইত্যাদি সবই হতে পারে। এই সংজ্ঞা জানা থাকলে শিক্ষার্থীকে একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বার করতে বলা যেতে পারে। যেখানে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৫ ইঞ্চি, শিক্ষার্থী দেখবে যে সমস্ত বর্গক্ষেত্রটি ৫টি সারিতে বিভক্ত হয়েছে আর প্রত্যেকটি সারিতে ৭টি বর্গইঞ্চি পরিমাণ স্থান রয়েছে। তাহলে সমস্ত ক্ষেত্রটিতে ৭×৫=৩৫ বর্গইঞ্চি পরিমাণ স্থান রয়েছে। এইভাবে ৯ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৬ ইঞ্চি প্রস্থ-বিশিষ্ট যে ক্ষেত্র, তার ক্ষেত্রফল দেখা যায় যে ৯×৬=৫৪ বর্গইঞ্চি। এইভাবে চিত্র এঁকে এঁকে বার করবার পর সে শেষে দেখতে পায় যে চিত্র আঁকার আর দরকার হয় না। কারণ নিয়মটি সে বুঝতে পেরেছে যে, দৈর্ঘ্যের মাপকে যদি প্রস্থের মাপ দিয়ে গুণ করা যায় তবেই ক্ষেত্রফল বেরিয়ে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থী অঙ্ক কষছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি থেকে যাচ্ছে অঙ্ক। কিন্তু যখনই সে অঙ্ক কষার থেকে নিয়মটির দিকে তার দৃষ্টি নিয়েছে তখনই সে অঙ্কের সীমা পেরিয়ে চলে এল বীজগণিতে। এখন যে-কোনও মাপই দেওয়া যাক না কেন দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের জন্য, এই নিয়মে ফেলে দিলে তখনই উত্তর বেরিয়ে আসবে। এই ধরনের সব প্রশ্নই এখন এই নিয়মে করা যাবে বলে একে বলা হয় সামান্যীকরণ (generalization)।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, অঙ্কের থেকেই বীজ-

গণিতের সৃষ্টি। সুতরাং শিক্ষার্থীদের বীজগণিত শেখাতে হলে অঙ্কের ভিতর দিয়েই আরম্ভ করতে হবে। অঙ্ক কষতে দুই রকমের চিন্তাধারা আসে। প্রথম হচ্ছে একটি পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় যে, কি করা দরকার—তারপর যা করা দরকার মনে হয় তা কার্যে পরিণত করা। কিন্তু বীজগণিতের কাজ হচ্ছে একই ধরনের কতকগুলি অঙ্ক কষার পর কি নিয়ম বিমূর্তভাবে এই অঙ্ক কষার ভিতরে রয়েছে তা বার করা ও তারপর ভাষায় সেই নিয়মটি প্রকাশ করা। এইজন্য ভাষার ওপরে যথেষ্ট দখল থাকা প্রয়োজন।

বীজগণিতের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় যখন প্রতীকের ব্যবহার করতে হয়। যা করার ইচ্ছা তা সংক্ষেপে প্রকাশের চেষ্টায় প্রতীক সাহায্য করে। প্রতীকের ভাষায় প্রকাশ করবার জন্য বিষয়টিকে সঠিক বিশ্লেষণ করা দরকার। এই প্রতীকের ব্যবহারই আবার সামান্যীকরণেও সাহায্য করে। কারণ প্রতীকং বুঝতে সাহায্য করে যে একটি বিবৃতিকে কত ভাবে কত ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায়। অঙ্কের ধারা যতই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, এই বিশ্লেষণ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না যদি নাকি প্রতীকের ব্যবহার না করা হয়। সুতরাং বীজগণিতের প্রধান অবদান হচ্ছে প্রতীকের ব্যবহার ও তদ্দ্বারা বিশ্লেষণ সহজ করা ও সংক্ষেপে ফলাফল প্রকাশ করার সাহায্য করা। এই প্রতীকের ব্যবহার যে শুধু বিদ্যালয়ের গণিতের ক্ষেত্রেই কাজে লাগে তা নয়। বিদ্যালয়ে বীজগণিতের একরকম রূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বীজগণিতের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। যে-কোনও ক্ষেত্রেই যখন কিছু তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, তখনই ঐ কাজের সুবিধার জন্য একরূপ বীজগণিতের আবিষ্কার হয়। যেমন নাকি Statistics এ $m=\frac{\Sigma fx}{n}$ এইরূপ প্রতীকের অর্থাৎ বীজগণিতের ব্যবহার চলে।

এই সব বীজগণিতের উদ্দেশ্য এক। ভাষার দৌর্বল্য হেতু যেখানে বিমূর্ত তত্ত্বানুসন্ধানে ভাষার সাহায্যে যথার্থ বিবৃতি দিতে অসুবিধা হয়, সেখানে বীজগণিত এই অভাব পূরণ করে এই কাজে সাহায্য করে। শব্দসম্ভার এবং বাক্যাংশ বা বাগ্ধারা (phrases) যেভাব ব্যক্ত করে, সেই ভাবই সহজে প্রতীক দ্বারা ব্যক্ত হয় এবং ভাবটি সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বীজগণিতের এই প্রতীক যে কোনও সংখ্যার

পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তা বলা চলে না। এ হচ্ছে একটি ভাবপ্রকাশের পথ বা উপায় মাত্র। গণিতের বিবৃতিগুলি প্রকাশের জন্য এ সংক্ষিপ্ত উপায় বা shorthand বলা চলে।

বীজগণিত দ্বারা যন্ত্রচালিতের মত গণনার কাজ এবং জটিল সমস্যা সমাধানের কাজ করা যায়। যে সমস্যায় সংখ্যা অথবা মাপের প্রশ্ন আসে সেখানেই বীজগণিতের সাহায্যে সমাধান সহজে করা যায়। এ ছাড়াও বীজগণিতে সৃষ্টির ক্ষমতাও রয়েছে। বীজগণিতের সঙ্গে সঙ্গে ঋণাত্মক সংখ্যা, imaginary সংখ্যা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বীজগণিত সকলের পড়ার দরকার কি? বীজগণিতে মানসিক শিক্ষা বা চর্চা হয় তা ঠিক, কিন্তু তার থেকেও প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে যে বীজগণিত কৃষ্টিমূলক শিক্ষায় সাহায্য করে। সাধারণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী হয়তো মেকানিক্স বা Calculus পড়বে না, হয়তো উচ্চস্তরের বীজগণিত-সংশ্লিষ্ট গণিত তার করতে হবে না, কিন্তু এটা তার বোঝা দরকার যে সর্বক্ষেত্রেই এমন কতকগুলি বিবৃতি দেবার প্রয়োজন হয় যাকে সাধারণ বিবৃতি বলা চলে অর্থাৎ সাধারণভাবে অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। এইরূপ সাধারণভাবে বিবৃতি বীজগণিতের সাহায্য ছাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। এঞ্জিনিয়ারের কার্যক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই বীজগণিতের প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থী আর কিছু না করুক, এই বিষয়টির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তার ধারণা থাকা দরকার। এইটুকু অন্ততঃ তার উপলব্ধি করা উচিত যে বীজগণিত ছাড়া কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যের সামান্যীকরণ অর্থাৎ সাধারণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বীজগণিত ব্যতীত কতকগুলি ভাবপ্রকাশও অসম্ভব হোতো। যেমন—

$$(x+a)^n = x^n + nx^{n-1}.\ a + \frac{n(n-1)}{\lfloor 2} x^{n-2}a^2 + \cdots\cdots + a^n$$

এই ধারণাটি প্রতীক ছাড়া কখনই প্রকাশ করা সম্ভব হোতো না। ভাষায় যদি এই ধারণাটি প্রকাশ করার চেষ্টা হয়, তবে তা কখনই সহজসাধ্য হবে না। প্রতীকের সাহায্যেই এই ভাবটি—এই সাধারণ বিবৃতিটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

হিন্দুরাই বীজগণিত শাস্ত্রের উদ্ভাবক। ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে আর্যভট্ট সর্বপ্রথম

বীজগণিত প্রণয়ন করেন। তারপর ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি এই শাস্ত্রের উন্নতি করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভাস্করাচার্য দুই প্রকার গণিতের উল্লেখ করেন—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। তাঁর মতে পাটীগণিত ব্যক্তগণিত ও বীজগণিত অব্যক্তগণিত। তিনি লিখেছেন—

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তং সংজ্ঞং।
ব্যক্তং পাটীগণিতমব্যক্তং বীজগণিতং ॥"

———

দিক্‌-নির্দেশক সংখ্যা (Directed Numbers)

ঋণাত্মক সংখ্যা—

ভারতবর্ষে ঋণাত্মক সংখ্যার উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ব্রহ্মগুপ্তের লেখায় (৬২৮ খ্রীঃ)। ধনাত্মক রাশিকে সম্পত্তি ও ঋণাত্মক রাশিকে ঋণ বলে তিনি আখ্যা দেন। একটি সরলরেখার একদিক ধনাত্মক রাশি নির্দেশ করলে বিপরীত দিক ঋণাত্মক রাশি নির্দেশ করবে বলে তাঁরা ধরেছেন। Diophantus-এর চেয়েও তাঁরা অনেক এগিয়ে গিয়ে বার করেছেন যে একটি দ্বিঘাত সমীকরণ (Quadratic equation)-এর দুইটি বর্গমূল থাকে। ভাস্কর বলেছেন যে $x^2-45x=250$ এই সমীকরণের সমাধান হচ্ছে— $x=50$

অথবা $x=-5$

কিন্তু তিনি বলেন যে শেষেরটি গ্রহণ করা হবে না। কারণ সাধারণ মানুষ এরূপ মূল্য অনুমোদন করে না।

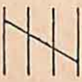
হিন্দুগণ যাঁরা ঋণাত্মক রাশির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা এই রাশি বিয়োজ্য হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। সংখ্যার ওপর একটি ছোট বৃত্ত বা বিন্দু দিয়ে তাঁরা ঋণাত্মক রাশি প্রকাশ করতেন। ভাস্কর লিখতেন এইভাবে—

$\overset{\circ}{৬}$ অথবা $\ddot{৬}$।

বিয়োগ ছাড়া ঋণাত্মক সংখ্যার উল্লেখ প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলন, চীন বা গ্রীক গণিতে দেখা যায় না।

চীনদেশে আগে বিয়োজ্য হিসাবে এই ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। ধনাত্মক সংখ্যা লাল রঙে এবং ঋণাত্মক সংখ্যা কালো কালিতে লেখা

হোতো। আর এক উপায়ে তাঁরা ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ করতেন। সংখ্যা ঋণাত্মক হলে তার ডানদিকের 0 ছাড়া আর যে শেষ অঙ্ক থাকে তা কোনাকুনি-ভাবে একটি কর্ণ দ্বারা কেটে দেওয়া হোতো। যেমন, –১০৭২৪ লেখা হোতো

10  =  এইভাবে ; –১০,২০০ লেখা হোতো 10 

এইভাবে।

গ্রীকগণ $(a-b)^2$ অথবা $(a+b)(a-b)$ এদের সমতুল্য জ্যামিতিক চিত্র আঁকতেন এবং $(-b).(-b)$ এবং $(+b).(-b)$ এদের ফলও জানতেন, কিন্তু ঋণাত্মক সংখ্যা বলে ঠিক কিছু উল্লেখ করতেন না।

আরবদেশে ফিবোনেক্কি (১২২৫ খ্রীঃ) ঋণাত্মক রাশিকে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

স্টিফেল (১৫৪৪ খ্রীঃ) ঋণাত্মক রাশির কথা স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে ঋণাত্মক সংখ্যা 'o' থেকেও ছোট।

বিয়োগের চিহ্ন অর্থাৎ দিক্ নির্দেশ

বীজগণিতেই ঋণাত্মক রাশির সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রথম পরিচয় হয়। এতদিন পর্যন্ত অঙ্কে শুধু ধনাত্মক (positive) সংখ্যা নিয়েই শিক্ষার্থী অঙ্ক করেছে। এখন সে বুঝবে যে সংখ্যার সাহায্যে জগতে যে বহুল কাজ সাধিত হচ্ছে তা সম্ভব হয় না যদি সংখ্যাকে ধনাত্মক রাশির গণ্ডির ভিতরেই সীমাবদ্ধ করে রাখা যায়। সংখ্যার দুই রকম ব্যবহার—(১) ধনাত্মক, (২) ঋণাত্মক। নির্দেশ অনুসারে সংখ্যা ধনাত্মক কি ঋণাত্মক তা বুঝতে হবে।

একটি ছেলে একটি পেন্সিল হাতে করে ক্লাস ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির এক মোড়ের প্রশস্ত জায়গায় এসে থামল। তারপর ওপরে ১২ ধাপ যখন উঠেছে তখন হাত থেকে তার পেন্সিলটি পড়ে গেল। পেন্সিলটি তুলবার জন্য তাকে ৫ ধাপ নামতে হোলো। এখন সে মোড়ের প্রশস্ত জায়গা থেকে ৭ ধাপ উপরে আছে। এই ৭টি ধাপ বার করতে মনে মনে এইভাবে গোনা হোলো—প্রশস্ত জায়গা থেকে যে ধাপটিতে পেন্সিল আছে তার দূরত্ব ১২ – ৫ = ৭ ধাপ।

সাধারণতঃ বিয়োগ চিহ্নের অর্থ অনুসারে বলা হয় যে ১২ থেকে ৫ বাদ

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে ১২র আগে যোগের চিহ্ন আর ৫এর আগে বিয়োগের চিহ্ন। ১২র আগে যোগের চিহ্ন মানে ১২ ধাপ ওপরে উঠেছে আর ৫এর আগে বিয়োগ চিহ্ন মানে ৫ ধাপ নীচে নেমেছে। সুতরাং বিয়োগ চিহ্নটি যে শুধু বাদ দেওয়ার চিহ্ন তা নয়। দিক পরিবর্তন অর্থাৎ উলটো দিকে যাওয়াও বোঝায়। যদি পেন্সিলটি আবার ঐ প্রশস্ত জায়গায় এসে পড়তো তবে অঙ্কটি দাঁড়াতো এইরূপ—

ধাপসংখ্যা=১২ – ১২=০

অর্থাৎ ১২ ধাপ ওপরে গিয়ে আবার ১২ ধাপ নীচে নেমেছে।

কিন্তু পেন্সিলটি যদি ১২ ধাপ বেয়ে নেমে প্রশস্ত জায়গায় পড়ে আবার তারও ৮ ধাপ নীচে গড়িয়ে যায় তবে ছেলেটির পেন্সিলটি আনতে নামতে হবে ১২+৮=২০ ধাপ। তখন অঙ্কটি দাঁড়াবে এইরূপ—

ধাপসংখ্যা=১২ – ২০

এখন বিয়োগের চিহ্ন মানে যদি সত্যিই বাদ দেওয়া প্রশ্নই আসে তবে এ অঙ্কের কোনও অর্থই হয় না। কারণ ১২ থেকে ২০ বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু যদি এই অঙ্কটি মানে এই ধরা হয় যে বালকটি ১২ ধাপ উপরে গিয়ে আবার ২০ ধাপ নীচে নেমে এসেছে তবে অবশ্য এরূপ অঙ্কের অর্থ হয় এবং ইহা অসম্ভব বলে মনে হয় না। সুতরাং যদি লেখা যায় যে ধাপের সংখ্যা ১২ – ২০= – ৮ তার মানে হবে যে বালকটি এখন সিঁড়ির মোড় থেকে ৮ ধাপ নীচে আছে।

যদি বালকটি ৮ ধাপ ওপরে ওঠে ও তারপরে আবার ১২ ধাপ ওপরে ওঠে তবে শেষে সে যেখানে দাঁড়াবে তা হচ্ছে +৮+১২=+২০ ধাপ ওপরে। সুতরাং এখানে যোগের চিহ্ন মানে শুধু যোগ করা নয় কিন্তু ওপরে যাওয়া। সুতরাং যোগ বা বিয়োগ চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে দিক-নির্দেশক সংখ্যাও বলা চলে।

শুধু 'উপর' ও 'নীচ' এই দুই দিক নির্দেশ ছাড়াও দিক-নির্দেশক সংখ্যা অন্য প্রকার গতি ও মাপও প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে—ডাইনে বা বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতের দিকের গতি। সুতরাং যখন কোনও সংখ্যা দিক-বিশেষে গতি বা দূরত্ব নির্দেশ করে, অর্থাৎ উপরে বা নীচে, সম্মুখে বা পশ্চাতে, ডাইনে বা বামে গতি নির্দেশ করে অথবা পূর্বে বা পরে, জমা বা খরচ, লাভ বা ক্ষতি নির্দেশ করে

তখন ইহা প্রকাশের জন্য সংখ্যাটির পূর্বে যোগ বা বিয়োগের চিহ্ন বসাতে হয়—শুধু বুঝিয়ে দিতে হয় যে কোন্ দিক নির্দেশ করছে—তখন এই চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে দিক-নির্দেশক সংখ্যা বলা হয়।

দিক-নির্দেশক সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ

প্রশ্ন ঃ—১। সিঁড়ির মোড়ের প্রশস্ত জায়গা থেকে ৬ ধাপ উপরে উঠে একটি ছেলে আবার ১৩ ধাপ নেমে এল। শেষ পর্যন্ত সে কোথায় ছিল?

উত্তর ঃ—যে ধাপে সে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে—

+৬ − ১৩ = − ৭ ... (১)

২। সিঁড়ি বেয়ে ৬ ধাপ উপরে উঠ্‌লে বালকটি একটি ঘরের দরজায় এসে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু ভুলে সে ১৩ ধাপ উঠে গেল। তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে হলে সে এখন কি করবে?

গন্তব্য স্থান = +৬ − (+১৩) = − ৭ ... (২)

উত্তর ঃ—তার ৭ ধাপ নেমে আসতে হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে এই যোগ ও বিয়োগের চিহ্ন যদি দিক-নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ যোগ ও বিয়োগের অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা। একটু সতর্কতার সঙ্গে লিখলেই তা চলতে পারে। যখন দিক নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন একটি বন্ধনীর ভিতর ঐ চিহ্ন সমেত লিখলে বোঝা যাবে কোন্ দিক নির্দেশ করছে। উদাহরণস্বরূপ—

(১) নম্বরের অঙ্কটি লেখা যায় এইভাবে—

(+৬) + (− ১৩) = − ৭;

(২) নম্বরের অঙ্কটি লেখা যায় এইভাবে—

(+৬) − (+১৩) = − ৭।

প্রথমটিতে একটি গতির দুইটি অংশ দেওয়া আছে। সেই দুই অংশের যুক্ত উৎপন্ন ফল বার করতে হবে। সেজন্য দুই বন্ধনীর মাঝের যোগ চিহ্নটি এখানে সংখ্যা দুইটির যোগ বোঝায়।

দ্বিতীয়টিতে যুক্ত উৎপন্ন ফল দেওয়া আছে ও গতির একটি অংশ দেওয়া আছে। অপর অংশটি বার করতে হবে। +৬ হচ্ছে যুক্ত উৎপন্ন ফল ও

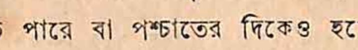
+১৩ হচ্ছে একটি অংশ। অন্য অংশটি বার করতে হবে। সুতরাং এখানে এই দুই বন্ধনীর মাঝের যোগ ও বিয়োগ চিহ্ন সমস্যার রূপই প্রকাশ করছে। যখন আমরা ঠিক অঙ্কের গণনার কাজ করি তখন আমরা এই চিহ্নগুলির কথা আর ভাবি না। যদি মাঝে যোগের চিহ্ন থাকে তবে পরের দিক-নির্দেশক সংখ্যাটি যে চিহ্ন সমেত আছে সেই চিহ্ন সমেতই রাখা হয়। কিন্তু যদি দুই বন্ধনীর মাঝে বিয়োগ চিহ্ন থাকে তবে পরের বন্ধনীর ভিতর দিক-নির্দেশক সংখ্যাটির আগে যে চিহ্ন আছে সেই চিহ্নটি বদলাতে হবে। অর্থাৎ বিয়োগ চিহ্ন থাকলে যোগ চিহ্ন হবে ও যোগ চিহ্ন থাকলে বিয়োগ চিহ্ন হবে।

সুতরাং বীজগণিতের যোগ অর্থে বোঝা যায় একটি রেখার উপর একটি মূল উৎপত্তি বিন্দু থেকে গতি বা দূরত্বের যোগফল, যে গতি বা দূরত্ব সম্মুখের দিকেও হতে পারে বা পশ্চাতের দিকেও হতে পারে আর তাদের যুক্ত উৎপন্ন ফল ঐ অংশগুলির প্রত্যেকটির থেকে বড়ও হতে পারে আবার ছোটও হতে পারে। দিক-নির্দেশক সংখ্যা নয়, এরূপ সংখ্যা কয়েকটি যোগ করলে যোগফল সর্বদাই সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটির চেয়ে বড় হয়।

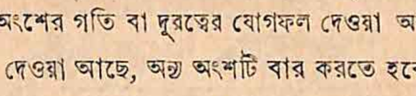
বীজগণিতের বিয়োগ অর্থে বোঝা যায় একটি রেখার উপর একটি মূল উৎপত্তি বিন্দু থেকে দুইটি অংশের গতি বা দূরত্বের যোগফল দেওয়া আছে ও এক অংশের গতি বা দূরত্বের মাপ দেওয়া আছে, অন্য অংশটি বার করতে হবে।

গুণ ও ভাগ

রেখাচিত্র দিয়ে বীজগণিতের গুণ ও ভাগ বোঝান যেতে পারে।



'O' বিন্দুটি হচ্ছে মূল মধ্যবিন্দু। A থেকে ABর দিক ধরে গেলে এই দিক ধরা হবে ধনাত্মক দিক। কিন্তু B থেকে BAর দিক ধরে গেলে ধরা হবে ঋণাত্মক দিক। 'O' বিন্দুতে পৌছাবার পূর্বের সময় ধরা হবে ঋণাত্মক, আর 'O' বিন্দুতে পৌছাবার পরের সময় ধরা হবে ধনাত্মক।

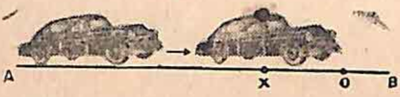


(ক) একটি মোটর গাড়ী A থেকে Bর দিকে ঘণ্টায় ২০ মাইল গতিতে যায়। 'O' বিন্দু ছাড়াবার ৩ ঘণ্টা পরে গাড়ীটি কোথায় থাকবে?

এখানে **A থেকে Bর** দিকে যাচ্ছে সেজন্য দিকটি ধনাত্মক এবং ২০ মাইল ধনাত্মক বলে ধরে নেওয়া হবে। আবার 'O' বিন্দু ছাড়াবার ৩ ঘণ্টা **পরে** গাড়ীটির অবস্থান বার করতে হবে সেজন্য ৩ ঘণ্টাও ধনাত্মক বলে ধরে নিতে হবে। গাড়ীটি ৩ ঘণ্টা পর 'X' বিন্দুতে থাকবে। সেজন্য অঙ্কটি দাঁড়াবে এইরূপ—

(+২০)×(+৩)= +৬০ ... (১)

(খ) গাড়ীটি **A থেকে Bর দিকে যায়।** 'O'-তে পৌঁছাবার ৩ **ঘণ্টা আগে** গাড়ীটি কোথায় থাকবে ?



A থেকে Bর দিকে যায় সেজন্য গতির হার +২০। 'O'-তে পৌঁছাবার ৩ ঘণ্টা আগে সময় হবে −৩। সুতরাং অঙ্কটি দাঁড়াবে এইরূপ—

(+২০)×(−৩)= −৬০ ... (২)

(৩) গাড়ীটি B থেকে Aর দিকে যায়। তাহলে 'O'-তে পৌঁছাবার ৩ ঘণ্টা পরে গাড়ীটি কোথায় থাকবে ?



B থেকে গাড়ীটি Aর দিকে যায় সেজন্য গতি ধরা হবে ঋণাত্মক অর্থাৎ (−২০)
'O'-তে পৌঁছাবার ৩ ঘণ্টা **পরের** অবস্থান
সেজন্য ঘণ্টা ধরা হবে (+৩)
অঙ্কটি দাঁড়াবে এইরূপ—

(−২০)×(+৩)= −৬০ ... (৩)

(৪) গাড়ীটি B থেকে Aর দিকে যায়। তাহলে 'O'-তে পৌঁছাবার ৩ ঘণ্টা আগে গাড়ীটি কোথায় থাকবে ?



B থেকে গাড়ীটি Aর দিকে যায়, সেজন্য গতি ধরা হবে ঋণাত্মক অর্থাৎ (−২০)

'O'-তে পৌছাবার ৩ ঘণ্টা আগের অবস্থান

সেজন্য ঘণ্টা ধরা হবে (−৩)

অঙ্কটি দাঁড়াবে এইরূপ—

(−২০)×(−৩)=+৬০ ··· (৪)

(১), (২), (৩), (৪) থেকে পাওয়া যায়—

(i) দুইটি ধনাত্মক রাশি গুণ করলে গুণফল ধনাত্মক হয়।

(ii) একটি ধনাত্মক রাশির সঙ্গে একটি ঋণাত্মক রাশি গুণ করলে গুণফল ঋণাত্মক হয়।

(iii) দুইটি ঋণাত্মক রাশি গুণ করলে গুণফল ধনাত্মক হয়।

এর থেকে পাওয়া যায় গুণ্য ও গুণকের চিহ্ন যদি একই হয় তবে গুণফল ধনাত্মক হয়। গুণ্য ও গুণকের চিহ্ন যদি বিভিন্ন হয় তবে গুণফল ঋণাত্মক হয়।

সমীকরণ (Equations)

হিন্দুদের গণিতশাস্ত্রে সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় বহু বহু পূর্বে। হিন্দুগণ বড় বড় সংখ্যা নিয়ে নানারকম সমস্যার সমাধান করতেন। অনেক ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন যে সংখ্যাবিজ্ঞান ও বীজগণিতে ভারতবর্ষ গ্রীকদের থেকেও বেশী উন্নতি করেছিল। অনেকে বলেন আলেকজান্দ্রিয়ার স্কুলের Diophantus বীজগণিতে অনেক কাজ করেছিলেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে সন্দেহ আছে যে Diophantus হিন্দুদের কাছ থেকেই এসব নিয়েছিলেন কিনা।

হিন্দুদের ভিতর ভাস্কর (১১৫০ খ্রীঃ) সাধারণ অঙ্কের জন্য নাম দিয়েছিলেন 'বীজগণিত' অর্থাৎ বীজের গণনা বা মূল অথবা মৌলিক সংখ্যার গণনা। এবং Algebra বলতে বর্তমানে যা বোঝা যায় তার নাম দিয়েছিলেন অব্যক্ত গণিত। বীজগণিতে জানা সংখ্যা নিয়ে গণনা করা হয় কিন্তু অব্যক্ত গণিতে অজানা সংখ্যা সম্বন্ধে গণনা।

Algebra শব্দটির আভাস আরবদেশের আব্ খোরীজিমি (৮২৫ খ্রীঃ) নামক একজন গণিতজ্ঞের লেখায় পাওয়া যায়। তিনি ব্যবহার করেছেন আল্-জব্বর্‌-ওয়াল্-মোকাবালা শব্দটি।

১৬০০ শতাব্দীতে ইংরেজদের ভিতর এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়—আলজিবর ও আলমাকাবেল এই দুইটি শব্দের সংযোগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নামটি কেটে ছেঁটে করা হয়েছে Algebra। সেই সময়কার একটি বইতে পাওয়া যায়—

"Cancel minus terms and then
Restore to make your Algebra
Combine your homogeneous terms and
This is called Muqhaballah."

'Al-jabr' শব্দটির মুল অর্থ হচ্ছে ঋণাত্মক রাশির transposition অর্থাৎ পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরিত করণ। আর 'Muqhaballah' শব্দটির অর্থ ধনাত্মক রাশির পার্শ্বান্তরিত করা ও সরল করা।

গ্রহবিজ্ঞান (Astronomy) ও যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics)-এর নানাবিধ সমস্যা সমাধান করতে গিয়েই গণনা ও সঙ্গে সঙ্গে বীজগণিতের সৃষ্টি। গ্রীকগণ বা হিন্দুগণ যে গণিত বা বীজগণিত করতেন তা এখনকার থেকে ভিন্ন রকম ছিল। তার ভিতর কতক ছিল নিয়ম অনুসরণ করে গণনা আর কতক ছিল সমস্যা-সমাধান। কিন্তু সেই সমস্যা-সমাধানে বিমূর্ত সংখ্যার কোনও ব্যবহার নেই। বিমুর্ত সংখ্যার ব্যবহার ও সাঙ্কেতিক প্রতীকের ব্যবহার খুব ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়েছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন মতানুযায়ী বিভিন্ন সাঙ্কেতিক প্রথা বার হোলো।

প্রথমে নিয়ম ও সমস্যাগুলি ভাষাতেই একেবারে পুরোপুরি লেখা হোতো যাকে ইংরেজীতে বলা হতো Rhetoric Algebra, অর্থাৎ আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় বীজগণিত। যেমন—

4টি গরুর দামের সহিত 6টি মহিষের দাম যোগ করিলে হয় 576 টাকা।

তারপর কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত করে লেখা হতে লাগলো। যেমন—

4টি গরু + 6টি মহিষ = 576 টাকা।

একে বলা হয় Syncopated Algebra।

তারপর প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার করে লেখা হোলো—

$$4x+5y=576$$

একে বলা হোলো প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার করে সমস্যা-সমাধান অথবা Symbolic Algebra।

সমস্যা-সমাধানের ভিতর দিয়ে যখন বীজগণিতের সৃষ্টি তখন সমীকরণ প্রথমে আরম্ভ করতে হবে সমস্যা-সমাধানের ভিতর দিয়ে। কোনও formulaর ভিতর দিয়েও আরম্ভ করতে পারা যায়, যেমন—

আয়ত ক্ষেত্র = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

আয়ত ক্ষেত্র ও দৈর্ঘ্যের মাপ দেওয়া থাকলে প্রস্থের মাপ কত বার করতে হবে।

$$\text{অথবা সুদ} = \frac{\text{আসল} \times \text{হার} \times \text{সময়}}{১০০}$$

আসল, সময় ও হার দেওয়া আছে। সুদ বার করতে হবে।

বীজগণিতের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় সংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা-সমাধানে। প্রথম বীজগণিতের সমস্যা ইজিপ্টের আমেসের পুস্তকে দেখা যায়—"বস্তুর সঙ্গে তার এক-সপ্তমাংশ যোগ করলে 19 হয়"।

সংখ্যা সংক্রান্ত ধাঁধার উত্তর বার করতে গিয়েও বীজগণিত প্রয়োগ করা হয়। যেমন একটি সংখ্যা মনে করতে বলে তা দ্বিগুণ করতে বলা হোলো। তারপর 7 যোগ করতে বলে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে যোগফল 25 হয়েছে। এখন সংখ্যাটি বার করতে হবে। সমীকরণের সাহায্যে এর সমাধান বার করা যাবে।

এর পরে এই ধরনের বহু সমস্যা নিয়ে সমীকরণ সমাধানের চর্চা করা প্রয়োজন। সমস্যাগুলিকে বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশের আগে চর্চা করতে হবে তারপর সমাধানের চর্চা চলবে।

তারপর '=' চিহ্নটির অর্থ ভাল করে বুঝতে হবে।

যথা—$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (অভেদ) … (১)

$x^2 + 4x + 4 = 0$ (সমীকরণ) … (২)

বাঁশটির উচ্চতা = 20 ফুট (হয়) … (৩)

'=' চিহ্নের অর্থ

(১) a ও bর জন্য যে-কোনও সংখ্যা বসান যাক না কেন এই উভয় দিকের যোগফল সমান হয়।

(২) xএর জন্য কোনও বিশেষ সংখ্যা বসালে তবে ইহা সত্য হয়।

(৩) হয় বা আছে।

সুতরাং দেখা যায় যে '=' এই চিহ্নটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর ভিতর সমীকরণ কখন বোঝায় তা ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

সমীকরণ শেখাতে ভারসাম্য নিয়ম (balance method) ছেলেমেয়েদের পক্ষে খুব উপযোগী। যতক্ষণ দাঁড়িপাল্লার উভয় দিকে একই মাপের জিনিস চাপান যায় ততক্ষণ ওজনে ভারসাম্য থাকবে। আর একটি জিনিস হচ্ছে যে মাপবার সময় যে অজানা জিনিসের মাপ চাই সেই অজানা জিনিস একদিকে আর জানা মাপ সব একদিকে দিয়ে যখন দুইদিকের ভার সমান হয় তখন অজানা জিনিসের মাপ নিজের থেকেই বেরিয়ে আসে। এই ভারসাম্য নিয়মে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কি করে অজানা জিনিসটিকে একধারে এনে জানা জিনিস সব আর একধারে নেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে যে একজন কসাই একখণ্ড মাংস ওজন করছে। মাংসখণ্ডটি দাঁড়িপাল্লার একদিকে চাপিয়ে সে আর একদিকে এক সের ওজনের বাটখারা রাখলো। দেখা গেল যে যেদিকে বাটখারা দেওয়া হয়েছে সেদিকটা ঝুঁকেছে বেশী। কাজেই মাংসের টুকরোটির ঠিক ওজন পাবার জন্য আর কোনও রকম চেষ্টা না করে 2 ছটাকের একটি বাটখারা মাংসের পাত্রে চাপান হোলো। তখন পাল্লা ঠিক হোলো। তার মানে মাংসের ওজন+2 ছটাক=1 সের।

সুতরাং 2 ছটাক ওজন দুইদিক থেকে সরিয়ে নিলে একদিকে থাকে শুধু মাংসখণ্ড আর অন্যদিকে থাকে 1 সের − 2 ছটাক=14 ছটাক ওজন। সুতরাং 2 ছটাক পার্শ্বান্তরিত করলে তার চিহ্ন কেন পরিবর্তন হবে তা শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে। পরে এই ধরনের সহজ মৌখিক বা লিখিত অনেক সমস্যা সমাধান করতে দিতে হবে।

এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রত্যেকটি ধাপ যেন শিক্ষার্থী বুঝতে পারে ও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারে। এটা তার অভ্যাসে পরিণত করার জন্য যুক্তি তার কাছে বার বার চাইতে হবে।

সমস্যা সমাধানের পর প্রাপ্ত সমাধানটি সমীকরণে বসিয়ে দেখতে হবে যে সত্যিই সমাধান ঠিক হয়েছে কিনা।

লেখার দিক দিয়ে দেখতে হবে যেন শিক্ষার্থী অন্তত প্রথম দিকে কোনও ধাপ বাদ না দেয়। যেমন—

$15x = 45$

উভয় দিককে 15 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যায়—

$$x=\frac{45}{15}=3$$

কিংবা $144+x=171$

উভয় দিক থেকে 144 বাদ দিলে পাওয়া যায়—

$$x=171-144=27$$

কিন্তু এইভাবে করতে করতে এমন একটি সময় আসবে যখন তারা যন্ত্রচালিতের মতনই অঙ্ক কষে যেতে পারবে। আর তা যদি না পারে তবে বোঝা যাবে যে শিক্ষা ঠিক হয়নি। অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষক প্রতি ধাপেই বার বার বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'কেন'। এ রকম বাধা পেলে অভ্যাস গঠনেও অসুবিধা হয়।

সমীকরণ শেখাবার সময় কতকগুলি বাক্য শিক্ষক প্রথম প্রথম ব্যবহার করবেন না, যেমন—সমীকরণের একপাশ থেকে অন্যপাশে কোনও সংখ্যা বা রাশি স্থানান্তরিত করলে তার চিহ্ন বদলে দিতে হবে, কিংবা cross multiply বা কোনাকুনি ভাবে গুণ করার কথা। এইগুলি তখনই করা যায় যখন স্থির জানা যায় যে এই নিয়মগুলি শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে সামান্যীকরণ করে পেয়েছে। সুবিধার জন্য এই নিয়মগুলি তারা ব্যবহার করবে তখনই যখন নাকি তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা নিয়মের ব্যাখ্যা দিতে পারে। $a=b-x$, এখানে x-কে অন্যপাশে চিহ্ন পরিবর্তন করে নেওয়া অর্থ—

$a+x=b-x+x$
অথবা, $a+x=b$ } অর্থাৎ দুই দিকে x যোগ করা হচ্ছে।

অথবা $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ তার থেকে পাওয়া যায় $ad=bc$ এবং তা পাওয়া যায় দুই দিকে bd দিয়ে গুণ করে—

$$\frac{a}{b}\times bd=\frac{c}{d}\times bd$$

অথবা, $ad=bc$

সুতরাং এই কোনাকুনি ভাবে গুণ করার অর্থ যে দুই পাশের হরের গুণফল দিয়ে দুই দিক গুণ করা তা তারা যখন নিজেরা অঙ্ক করে করে

বুঝবে তখন ঐ রকম বাক্য যেমন 'কোনাকুনি ভাবে গুণ করা' ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভগ্নাংশযুক্ত সমীকরণ করবার আগে বীজগণিতের ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করা দরকার। ভগ্নাংশযুক্ত সমীকরণ করার সময় প্রথম প্রথম দিকে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি ধাপ লিখে বুঝিয়ে দেবে, যেমন—

$$\frac{x-2}{5}=\frac{x+1}{7}$$

এখানে ভগ্নাংশ তুলে দিতে গিয়ে আমাদের দুই দিকই 35 দিয়ে গুণ করতে হবে। যদি কোনও বন্ধনী থাকে তবে একই ধাপে ভগ্নাংশ ও বন্ধনী তোলার চেষ্টা করা ঠিক নয়।

সমাধান যখন পাওয়া যায় তখন তা সমীকরণে বসিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে সমাধান ঠিক হয়েছে কিনা। কিন্তু সেই মেলানোর পদ্ধতির উপরও আবার লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন—

$$\frac{x-3}{4}+\frac{x+2}{6}+6=\frac{3}{4}(12x-7)+\frac{9}{4}$$

এই সমীকরণ সমাধান করলে পাওয়া যায় $x=1$

মেলাবার পদ্ধতি :—

বাম দিক $=\frac{1-3}{4}+\frac{1+2}{6}+6=6$

ডান দিক $=\frac{3}{4}(12.1-7)+\frac{9}{4}=6$

অনেক সময় মেলাবার চেষ্টা করা হয় এইভাবে—

$$\frac{1-3}{4}+\frac{1+2}{6}+6=\frac{3}{4}(12\times1-7)+\frac{9}{4}=6$$

কিন্তু এভাবে লেখা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ—

(১) যা প্রমাণ করতে হবে তাই প্রথম লাইনে সত্যি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

(২) যে ভাবে সমাধান বার করা হয়েছে সেই একই উপায়ে যদি আবার আমরা মেলাতে যাই তবে যে ভুল একবার করা হয়েছে সেই ভুলেরই আবার পুনরুক্তি হতে পারে।

সহ-সমীকরণ (Simultaneous Equations)

এই সমীকরণও সমস্যা দিয়ে আরম্ভ করাই ভাল। যেমন, রামের একটি থলিতে কতকগুলি সিকি আছে আর কোনও মুদ্রা নেই। হরির কাছে তার ১০ আনা ধার রয়েছে। হরির কাছে একটি থলিতে আবার শুধু কতকগুলি দুআনি আছে। এখন হরির ধার শোধ করতে রাম কয়টি মুদ্রা দেবে আর হরিই বা তার পরিবর্তে রামকে কয়টি মুদ্রা দেবে ?

মনে করা যাক যে রাম হরিকে x সংখ্যক সিকি দিয়েছে আর হরির কাছ থেকে y সংখ্যক দুআনি পেয়েছে। তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায় গিয়ে $4x-2y=10$ ।

x এবং y-কে যে মূল্য দিলে এই সমীকরণটি সিদ্ধ হয় তার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

x	3	4	5	6	7	8
y	1	3	5	7	9	11

ইত্যাদি ... (১)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে অসংখ্য সমাধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সঠিক একটি সমাধান পেতে হলে আর একটি সমীকরণ দরকার যাতে জানা যায় যে দেওয়া-নেওয়াতে মোট কতগুলি মুদ্রার ব্যবহার হয়েছে।

মনে করা যাক্ যে এই দেওয়া-নেওয়াতে মোট ৭টি মুদ্রা ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে সমীকরণ দাঁড়ায় এইরূপ— $x+y=7$

এই সমীকরণ অনুসারে আবার x ও yএর বিভিন্ন মুল্য পাওয়া যায়। যথা—

x	7	6	5	4	3	2
y	0	1	2	3	4	5

ইত্যাদি ... (২)

১নং ও ২নং এই দুইটি তালিকাই সত্য হয় ধরা যায় $x=4, y=3$

সুতরাং দেখা যায় যে যখন দুইটি অজানা সংখ্যা বার করতে হয় তখন একটি সমীকরণ হলে চলে না, দুইটি সমীকরণ চাই।

সহ-সমীকরণ দুই উপায়ে সমাধান করা যায়।

(১) Substitution—সমীকরণদ্বয়ের যে-কোনটি হইতে অজ্ঞাত রাশিদ্বয়ের একটির মান অপরটির দ্বারা প্রকাশ করা এবং অন্য সমীকরণটিতে প্রথমে উক্ত অজ্ঞাত রাশিটির স্থলে এই মান বসিয়ে একটি সমীকরণ গঠন করা ও সমাধান দ্বারা অজ্ঞাত রাশিটির মান নির্ণয় করা—পরে এই সমীকরণ দুইটির যে-কোনও একটিতে এই মান বসিয়ে অবশিষ্ট অজ্ঞাত রাশিটি নির্ণয় করা। যেমন—

$2x-y=5 \cdots (1)$
$x+y=7 \cdots (2)$
(1) থেকে পাওয়া যায় $y=2x-5$। yএর এই মান (2) সমীকরণে বসিয়ে পাওয়া যায় $x+2x-5=7$
অথবা $x=4$, $\therefore y=3$

(২) Elimination—প্রত্যেক সমীকরণ থেকে অজ্ঞাত রাশি দুইটির যে-কোন একটিকে বাদ দিয়ে দেওয়া। যেমন—

$2x-y=5 \cdots (1)$
$x+y=7 \cdots (2)$
(1) ও (2) যোগ করলে y-কে বাদ দেওয়া যায়। এবং $3x=12$ হয়। $\therefore x=4$

দ্বিঘাত সমীকরণ (Quadratic Equations)

এ ক্ষেত্রেও একটি সমস্যার সমাধান নিয়েই আরম্ভ করতে হবে। যেমন, এক ব্যক্তি কয়েকটি কলম কিনলেন ১৮০ টাকায়। তিনি নিজের জন্য ১টি রেখে বাকী কলমগুলি প্রত্যেকটি কেনা দামের থেকে ১ টাকা বেশীতে বিক্রি করে দিয়ে মোটের উপর ১০ টাকা লাভ করলেন। তিনি কতগুলি কলম কিনেছিলেন?

ধরা যাক তিনি x সংখ্যক কলম কিনেছিলেন। তাহলে তার প্রত্যেকটি কলমের কেনা দাম $\frac{180}{x}$ টাকা।

তিনি $(x-1)$টি কলম বিক্রি করলেন কেনা দামের চেয়েও ১ টাকা বেশীতে। অর্থাৎ প্রত্যেকটির বিক্রয়মূল্য হচ্ছে $\frac{180}{x}+1$ টাকা।

সুতরাং বাকী কলমগুলি তিনি বিক্রি করলেন—

$$(x-1)\left(\frac{180}{x}+1\right)$$ টাকায়।

কিন্তু বিক্রি করে তিনি ১০ টাকা লাভ করলেন, কাজেই বিক্রি করে তিনি পেলেন ১৮০+১০=১৯০ টাকা। সুতরাং—

$$(x-1)\left(\frac{180}{x}+1\right)=190$$

অথবা $180x-180+x^2-x=190x$

অথবা $x^2-11x-180=0$

সুতরাং এখানে সমীকরণ পাওয়া যাচ্ছে যেখানে অজ্ঞাত রাশির বর্গ অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘাতবিশিষ্ট পদ আছে। এই রকম সমীকরণকে দ্বিঘাত সমীকরণ বলা হয়।

এই সমীকরণ সমাধান করতে হলে প্রথমে আরম্ভ করতে হবে সহজ সমীকরণ দিয়ে। যেমন— $x^2-9=0$, অথবা $x^2=9$

এখানে দেখা যায়— $x=3$ অথবা -3এর সমান।

উৎপাদক (factor) দ্বারাও সমাধান করা চলে।

$x^2-9=0$ এই সমীকরণটি অন্যভাবেও লেখা যায়। যেমন—

$$(x-3)(x+3)=0$$

দুইটি রাশির গুণফল যদি '০' হয় তবে তাদের ভিতর একটি অন্তত '০' হবে। সুতরাং উপরের সমীকরণে হয় $x-3=0$ অথবা $x+3=0$

অর্থাৎ হয় $x=+3$ অথবা $x=-3$

যখন $3x^2-10x-8=0$ এই ধরনের সমীকরণ উৎপাদকের সাহায্যে সমাধান করতে হয় তখন এই ধাপটি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। কারণ—

$$3x^2-10x-8=0$$

অথবা $(3x+2)(x-4)=0$

কাজেই হয় $3x+2=0$, নয় $x-4=0$ (এই ধাপটি লেখা বিশেষ প্রয়োজনীয়)

তারপর এই নীতি অনুসরণ করে অন্যান্য কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। যেমন—

(১) যদি $xy=0$ হয় আর $x=1$ হয়, তবে $y=$কত ?

(২) যদি $(a-b)x=0$ হয়, তবে x সম্বন্ধে কি কিছু বলা যায় ?

(৩) যদি $(x+1)(y-2)=0$ হয় আর $x=-1$ হয়, তবে y সম্বন্ধে কি কিছু বলা যায় ?

এই সঙ্গে এই কথাও উল্লেখ করা যায় যে $P\times Q\times R=0$ হলে হয় P, নয় Q, নয় $R=0$ হয়। কিন্তু $P+Q+R=0$ হলে কিছুই বলা যায় না।

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের আর একটি উপায় হচ্ছে একটি সংখ্যাকে পুরোপুরি বর্গ করা। যখন উৎপাদক সহজে পাওয়া যায় না তখন এই নিয়মটি ব্যবহার করা ভাল। যেমন— $x^2+2x=15$

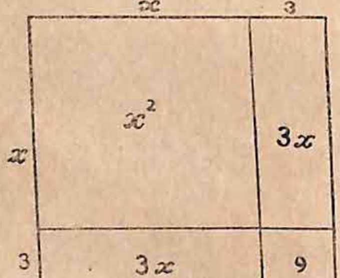
অথবা $x^2+2x+1=16$ অথবা $(x+1)^2=(4)^2$ অথবা $(x+1)=\pm 4$

এর থেকে দেখা যায় যে একটি রাশির পূর্ণবর্গ বার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে—

x^2+6x এই রাশিটির সঙ্গে কি যোগ করলে তবে একটি বর্গরাশি পাওয়া যায় ? দেখা যায় যে ইহা বার করার জন্য চর্চার দরকার।

জ্যামিতির সাহায্যেও এইরূপ সমীকরণের সমাধান বার করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে x^2+6x এই রাশিটি $(x+3)^2$ এই রাশির প্রথম দুইটি সংখ্যা। সুতরাং যদি 9 যোগ করি তবেই একটি পূর্ণ বর্গক্ষেত্র পাওয়া যেতে পারে।



$$x^2+6x=7$$

এখানে দুইদিকে 9 যোগ করে পাওয়া যায়—

$$x^2+6x+9=7+9$$

অথবা $(x+3)^2=(4)^2$

অনেক চর্চার পর শিক্ষার্থী নিয়মটি বুঝতে পারবে যে xএর সহগের অর্ধেকের বর্গফল বার করে যোগ দিলেই বাঁয়ের রাশিটি একটি বর্গসংখ্যা হবে। এ নিয়মটি একটু কষ্টকর হয় যখন xএর সহগ বিজোড় অথবা ভগ্নাংশ হয়।

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করতে গেলে দুই ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়—

(১) $(x-a)^2-b=0$

$\therefore (x-a+\sqrt{b})(x-a-\sqrt{b})=0$

$\therefore$ হয় $(x-a+\sqrt{b})=0$

অথবা $(x-a-\sqrt{b})=0$

(২) $(x-a)^2=b$

$\therefore x-a=\pm\sqrt{b}$

অথবা $x=a\pm\sqrt{b}$

এই দুইটির ভিতর (২)এর প্রথাই বেশী সহজ ও ভাল। দুইটি নিয়মই করে দেখান যেতে পারে যে দুইভাবেই সমাধান পাওয়া যায়।

সহজ সরল ক্ষেত্রে formula অর্থাৎ সূত্র দিয়ে সমাধানের সেরূপ প্রয়োজন নেই। তাছাড়া যারা প্রথম আরম্ভ করছে তাদের জন্যও এই নিয়ম সুবিধাজনক নয়।

চিত্রলেখ দ্বারা সমাধান

সহজ সহজ সমীকরণ এভাবে সমাধান করার পর শিক্ষার্থীদের দেখান যেতে পারে যে কেমন করে দ্বিঘাত সমীকরণ রেখাচিত্র দ্বারা সমাধান করতে পারে—

$$\left.\begin{array}{l} 2x^2-5x=11 \text{ অথবা} \\ 2x^2-5x-2=2x+5 \end{array}\right\}$$

এই ধরনের সমীকরণ উৎপাদকের সাহায্যে সমাধান করা কষ্টকর। সেজন্য রেখাচিত্র দিয়ে করলে সমাধান সহজে বেরিয়ে আসবে।

$$\left.\begin{array}{l} y=2x^2-5x-2 \\ y=2x+5 \end{array}\right\}$$

এই দুইটি রেখাচিত্র যেখানে ছেদ করবে সেই বিন্দুর x ও y-ই হচ্ছে সমাধান।

সমীকরণকে বীজগণিতের কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ বলা হয়। এ যেন বীজগণিতের মেরুদণ্ড। বীজগণিতের বাঁধাধরা যন্ত্রচালিতের মত কাজের ভিতর রস এনে দেয় সমীকরণ। বীজগণিত যেন শুষ্ক হাড় আর সমীকরণ রক্ত ও মাংস। যন্ত্রচালিতের মত নিয়ম ধরে যে সব কাজ বীজগণিতে করতে হয় সে সব পরে পরে একসঙ্গে করিয়ে যাওয়া ঠিক নয়, তাতে বিষয়টি অর্থহীন ও একঘেঁয়ে হয়ে ওঠে। সমীকরণ সমাধান করতে যখন যে সবের প্রয়োজন হবে তখনই

তাদের শেখাতে হবে। যে সব নিয়ম সমীকরণ সমাধানে প্রয়োজন হবে না সে সব রাখা হবে পরে শেখাবার জন্য।

বীজগণিতের যে সব অঙ্ক শুধু চর্চার জন্যই করা হয় সে সব অঙ্কের উপকারিতা কতখানি সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। খুব দুরূহ জটিল ধরনের অঙ্ক যা নাকি গণিতশাস্ত্র বা বিজ্ঞানশাস্ত্রেও খুব কমই প্রয়োজন হয়, সে সব অঙ্ক বাদ দিলেও এমন কিছু ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। ঐ ধরনের অঙ্ক বেশী করতে গেলে অযথা মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ে ও গণিতের উপর বিরাগ এসে যায়। যেমন নাকি $6x^5-4x^4-11x^3-3x^2-3x-1$ এবং $4x^4+2x^3-18x^2-3x+3$ এর গ. সা. গু. বার করা। অথবা

$$\sqrt{(\sqrt[3]{16a^2b^2})^5} \times \sqrt[4]{(\sqrt[3]{512a^5}\cdot 16b^5)^4}$$

এ রকম একটি রাশির সরল করা।

বীজগণিতে কতকগুলি নিয়ম শিখতে হয়। কিন্তু সেই নিয়মগুলি শেখাই বীজগণিত শেখার উদ্দেশ্য নয়। বীজগণিত শেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যামূলক অঙ্কের সমাধান করা। সে সমস্যা গণিতের সমস্যা হতে পারে, বিজ্ঞানের সমস্যা, যন্ত্রশিল্প কাজের সমস্যা প্রভৃতিও হতে পারে। এই সব সমস্যা সমাধানে বীজগণিতের যে সব নিয়মের প্রয়োজন হয় না সেই সব নিয়ম স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যায়।

বিদ্যালয়ে যে বীজগণিত শেখান হয় তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্যা সমাধান করা। এই সমস্যা সমাধান করা যায় সমীকরণ সমাধান করে। সুতরাং সমীকরণই হচ্ছে বীজগণিতের কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ।

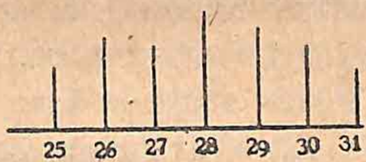
চিত্রলেখ (Graphs)

খবরের কাগজেই অনেক সময় ছেলেমেয়েরা চিত্রলেখ দেখে থাকে। উত্তাপের চিত্র, বস্তুর মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির চিত্র, কোনওরূপ অসুখের দরুন মৃত্যুর হারের চিত্র, বৃষ্টিপাতের চিত্র ইত্যাদি খবরের কাগজেই দেখতে পাওয়া যায়। সব ক্ষেত্রেই সব কিছুতেই পরিবর্তন চলছে, আর সেই পরিবর্তনের রূপ যখন চিত্রের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় তখনই সেই পরিবর্তন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়।

এই চিত্রলেখ Descartes প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু মনে হয় গ্রীক্‌রা তার বহু পূর্বে এই সম্বন্ধে কিছু ধারণা করেছিলেন। কিন্তু বীজগণিত সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় এই বিষয়ে বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি।

বিশ্লেষণ (analysis) ও সামান্যীকরণ (generalization)-ই হচ্ছে বীজগণিতের মূল উদ্দেশ্য। চিত্রলেখ দ্বারা এই দুই উদ্দেশ্যই বিশেষভাবে সাধিত হয়। অনেকগুলি দৃষ্টান্ত বা ঘটনার থেকে সামান্যীকরণ করে একটি নিয়ম আবিষ্কার করতে চিত্রলেখ সাহায্য করে।

লম্ব রেখা দিয়েই প্রথমে চিত্রলেখ আরম্ভ হবে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেই চিত্রলেখ আরম্ভ করা যায়। একটি রুলটানা কাগজের যে-কোনও একটি লাইন ধরে, লাইনটি সমান কয়েক ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিন্দুতে একটি তারিখ বসানো যেতে পারে। প্রতিদিন শ্রেণীতে কয়েকটি মৌখিক অঙ্ক কষতে দেওয়া যায়। তারপর যে যে-কয়টি পারলো, তার জন্য গুনে গুনে উপরে বিন্দু দিতে হয়।



এই বিন্দুগুলি সরল রেখা দ্বারা যোগ করলে চিত্রলেখ পাওয়া যায়। এই ভাবে শ্রেণীতে প্রতিদিনের ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি-সংখ্যা, বৃষ্টিপাতের মাপ, তাপের মাপ, শিক্ষার্থীদের মাসান্তে উচ্চতার মাপ ইত্যাদির চিত্রলেখ আঁকা যায়। রেখার হঠাৎ উত্থান বা পতনের অর্থ কি বা কারণ কি হতে পারে তা শিক্ষার্থীরা বার করতে চেষ্টা করতে পারে।

বিশ্বের নানাবিধ বৈচিত্র্যের ভিতরও যে ঐক্য আছে, বিভিন্ন উপাদানগুলি যে পরস্পর নির্ভরশীল, নিরবচ্ছিন্ন অথচ নিয়মিত ভাবে যে পরিবর্তন চলছে,—উত্থান পতন, হ্রাস বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ক্ষয়, এ সবই যে চিরন্তন নিয়ম—গণিত বিধি-নিয়মের ছাঁচে ফেলে এই সব সত্যই সকলের সম্মুখে তুলে ধরে এবং চিত্রলেখ হচ্ছে এ ভাব প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রথমে যে চিত্রলেখ করানো হবে তা বিরতিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন তথ্যধারা (discontinuous series) নিয়ে করানো যেতে পারে। যেমন প্রতিদিনকার ছাত্রের উপস্থিতি-সংখ্যা, প্রতি মাসের বৃষ্টির মাপ, প্রতিদিনের ঠিক মধ্যাহ্নের কোনও একটি বিশেষ ছায়ার মাপ, কোনও শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের অঙ্কের নম্বর ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে কোনও অন্তর্বর্তী সময়ের মাপের প্রশ্ন (interpolation) ওঠে না। যেমন ৭ তারিখের ও ৮ তারিখের উপস্থিতি-সংখ্যা দেওয়া থাকলেও ঐ দুই দিনের অন্তর্বর্তী কোনও সময়ের উপস্থিতি-সংখ্যার প্রশ্নই আসে না। পর পর দুই দিনের মধ্যাহ্নের ছায়ার মাপ দেওয়া থাকলেও অন্তর্বর্তী কোনও সময়ের ছায়ার মাপের প্রশ্ন ওঠেই না।

এ ক্ষেত্রে অনুভূমিক (horizontal) রেখার উপর কোনও মাপের প্রশ্ন আসে না। ঐ রেখার উপর সমান দূরত্ব রেখে কয়েকটি বিন্দু নিয়ে সেই সব বিন্দুতে লম্ব টেনে পর পর পরিমাণ প্রকাশ করতে হবে।

এইভাবে বিচ্ছিন্ন বা বিরতিযুক্ত চিত্রলেখ থেকে ধীরে ধীরে যাওয়া যায় পরিসংখ্যানের চিত্রলেখতে যা নাকি কোনও একটি নিয়ম অনুসরণ করে টানা হয় ও যাতে অন্তর্নিবেশ সম্ভব হয়। বিভিন্ন বয়সে ছেলে-মেয়েদের গড় উচ্চতার চিত্রলেখ টানা হলে, দুই বয়সের অন্তর্বর্তী কোনও বয়সের—যেমন ৭ বৎসর ও ৮ বৎসর বয়সের ছেলেদের গড় উচ্চতা জানলে ও তাদের চিত্রলেখ আঁকা হলে ৭ বৎসর ৬ মাস বয়সের গড় উচ্চতাও সেই চিত্রলেখ থেকে বার করা সম্ভব হয়। যেখানে এই অন্তর্নিবেশ সম্ভব হয় তার উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে—কয়েকটি দিনের সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়ের চিত্রলেখ আঁকা হলে ঐ সব দিনের মধ্যবর্তী কোনও দিনের সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়ও বার করা যায়। এইভাবে সুদ ও হার, সুদ ও সময়, সুদ ও আসল, সময় ও দূরত্ব ইত্যাদির চিত্রলেখ আঁকা যায় ও অন্তর্নিবেশ সম্ভব হয়।

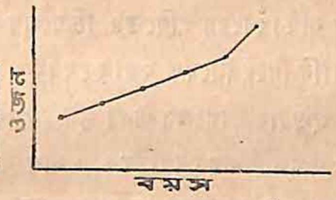
চিত্রলেখ ও সূত্রের (formula) ভিতর পরস্পর সম্বন্ধ রয়েছে। এই সম্বন্ধটি দুই দিক থেকে দেখা যায়। একটি চিত্রলেখকে পরীক্ষা করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনও সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা। আবার কোনও সূত্র অনুযায়ী চিত্রলেখ এঁকে সেই সূত্রের অন্তর্নিহিত তথ্যগুলির সন্ধান বার করা। প্রথমটির উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে একটি লম্বভাবে দণ্ডায়মান

দণ্ডের ছায়ার দৈর্ঘ্য সারাদিন ধরে সমান সময়ান্তরে মেপে চিত্রলেখ আঁকা অথবা একটি দোলকের দৈর্ঘ্য ও দোলার সময়ের চিত্রলেখ আঁকা ইত্যাদি। আবার যদি দেওয়া থাকে যে একটি রাশির nth সংখ্যা হচ্ছে $\frac{3n-2}{4}$, রাশির সংখ্যাগুলি বার করতে হবে, তাও চিত্রলেখ থেকেই বার করা সম্ভব হয়।

দুইটি হ্রাসবৃদ্ধিশীল বস্তু এমনভাবে সম্পর্কিত থাকতে পারে যে একটির কোনও মূল্য দিলে অন্যটিরও একটি স্থির মূল্য পাওয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ধারণা চিত্রলেখ থেকেই পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দেওয়া যেতে পারে—

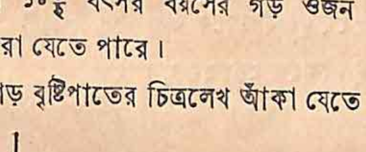
বিভিন্ন বয়সের গড় ওজন দেওয়া আছে--

বয়স	7	8	9	10	11	12
গড় ওজন (পাউণ্ড)	48	52	57	62	69	78



প্রশ্ন করা যেতে পারে ১০½ বৎসর বয়সের গড় ওজন কত? এবং উত্তর চিত্রলেখ থেকে বার করা যেতে পারে।

আবার বৎসরের গড় বৃষ্টিপাতের চিত্রলেখ আঁকা যেতে পারে। যেমন—

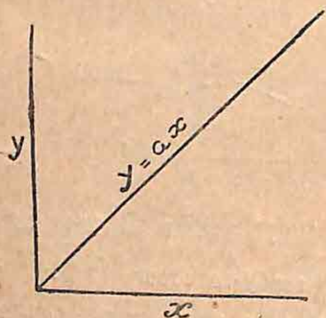


কিন্তু এখানে আবার $1921\frac{1}{2}$ বৎসরের বৃষ্টিপাতের প্রশ্ন আসেই না।

চিত্রলেখ সহজ গণক (ready-reckoner) হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। যেমন সময় অনুপাতে একটি গাড়ি কতদূর যাবে, কোনও জিনিসের পরিমাণ অনুপাতে দাম, বিভিন্ন দিনে গাছের উচ্চতা ইত্যাদি চিত্রলেখ সাহায্যেই বার করা যায়।

এইরূপ চিত্রলেখের ব্যবহার থেকে শিক্ষার্থী দেখবে যে একটি বিন্দুর অবস্থান বার করতে হলে দুই অক্ষরেখা (axis) থেকে বিন্দুটির দূরত্বের মাপের দরকার হয়। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—একটি গুপ্তধন বার করতে হবে। গুপ্তধনের স্থানটি বার করতে হলে তারা দেখবে, হয় দুই দেওয়ালের থেকে দূরত্ব বা দুই সারি গাছের থেকে দূরত্ব অথবা দুইটি রাস্তার থেকে দূরত্ব, এই ধরনের মাপের প্রয়োজন হয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী বুঝবে যে ন্যূনপক্ষে যে সামগ্রী (data) দরকার একটি বিন্দুর অবস্থান ঠিক করতে তা হচ্ছে—দুইটি স্থির রেখা থেকে বিন্দুটির লম্বের দূরত্ব। প্রথমে চিত্রলেখ আঁকবার সময় অক্ষরেখা দুইটিকে একক দিয়ে নির্দেশ করা যায়। যেমন—ওজন হলে পাউণ্ড; সময় হলে মিনিট, ঘণ্টা বা সেকেণ্ড; দূরত্ব হলে মাইল, গজ বা ফুট; উচ্চতা হলে ফুট, ইঞ্চি ইত্যাদি। কিন্তু যখন সত্যিকারের গণিতের চিত্রলেখ আঁকা হবে তখন এই রেখাগুলি x, y, w ইত্যাদি দিয়ে নির্দেশ করা হবে।

সুতরাং কাগজের উপর দুইটি রেখা লম্বভাবে টেনে অনুভূমিক রেখাকে x এবং তদুপরি লম্ব রেখাটিকে y বাহু বলে অভিহিত করা যায়। y রেখা থেকে x রেখার সামান্তরাল যে দূরত্ব তাকে বলা হয় ভুজ, আর x রেখা থেকে y রেখার সঙ্গে সমান্তরাল যে দূরত্ব তাকে বলা হয় কোটি। x ও y রেখা যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুকে ধরা হয় মূল বিন্দু।



শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে আবিষ্কার করবে যে x ও y axisএ একটি মান (scale) ধরে নেওয়া দরকার। কাগজ বুঝে সেই মানটি ঠিক করতে হবে। তা ছাড়া

এমন ভাবে স্কেল ধরা হবে যাতে নাকি অন্তর্বর্তী কোনও বিন্দুর অবস্থান সহজে বার করা যেতে পারে।

এর পরে চিত্রলেখ হবে $y=ax$ এই ধরনের, অর্থাৎ xএর অনুপাতে yএর পরিবর্তন হবে। যেমন ঘণ্টায় ২৫ মাইল হিসাবে গেলে একটি গাড়ি ২ ঘণ্টা, ৩, ৪, ৫, ৮ ইত্যাদি ঘণ্টায় কতদূর যাবে?

$y=ax$

এই চিত্রলেখ মূল বিন্দু দিয়ে যাবে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার চিত্রলেখ মূল বিন্দু দিয়ে যায় না। যেমন নাকি টেলিফোনের বিলের চিত্রলেখ। ভাড়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয়, তার উপর যতটি ডাক (call) হয় সেই অনুসারে টাকা হয়।

সব সময়ই যে সরলরৈখিক চিত্রলেখ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে তার কিছু মানে নেই। বক্ররেখা দিয়েও আরম্ভ করা যেতে পারে।

$$y=x(x-2)$$

$$y=x(x+2)(x-4)$$

$$y=120/x$$

অথবা $y=\dfrac{x-3}{x-2}$

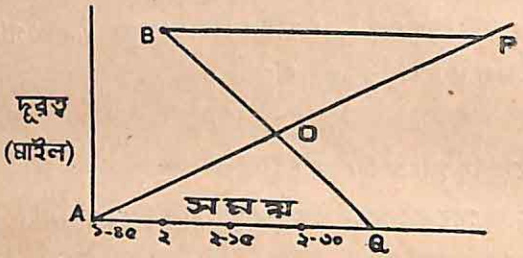
এই ধরনের বক্ররৈখিক চিত্রলেখ দিয়ে আরম্ভ করলে শিক্ষার্থীরা আরও উৎসাহ পাবে। অবশ্য এ ধরনের চিত্রলেখ আরম্ভ করা যাবে যখন শিক্ষার্থী y ও x অক্ষদ্বয়ের ব্যবহার বুঝবে।

যখন নাকি $y=f(x)$ এই ধরনের সমীকরণের চিত্রলেখ আঁকা হয় তখন অনেক রকম প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন—চিত্রলেখটিতে কি সমতা রয়েছে? চিত্রলেখটির কি সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন কোনও মান আছে? xএর কোন্ কোন্ মানের ভিতর চিত্রলেখটির ধনাত্মক মান হয়? ইত্যাদি।

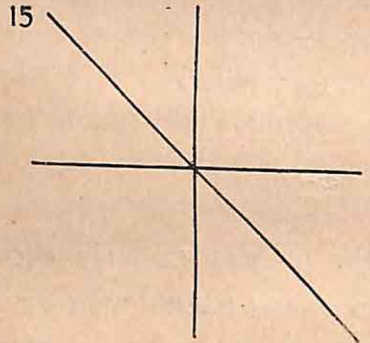
চিত্রলেখ দ্বারা প্রশ্নের সমাধানও অনেক সময় সহজ হয়। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যেতে পারে—

কমল A বিন্দু থেকে P বিন্দুতে যাবার জন্য বেলা ১-৪৫ মিনিটে রওনা হোলো। A থেকে Pএর দূরত্ব ১১ মাইল। সে ঘণ্টায় ২ মাইল হিসাবে চলতে লাগলো। আবার বাবুল B বিন্দু থেকে Q বিন্দুতে যাবার জন্য ২টায়

রওনা হোলো এবং সে ঘণ্টায় ৩ মাইল হিসাবে চললো। তাদের উভয়ের কখন পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে?



তারপর $y=-x$ এই ধরনের চিত্রলেখ শিক্ষার্থীরা করবে। তারা দেখবে এই চিত্রলেখ বামদিক থেকে ডানদিকে নেমে যায়।



এর পরের ধাপে একটি চিত্রলেখের সঙ্গে সমান্তরাল করে চিত্রলেখ আঁকার প্রশ্ন উঠবে। তখন সমীকরণ হবে এই ধরনের—

$$y=\frac{3}{4}x+2$$
$$y=\frac{3}{4}x+1$$
$$y=\frac{3}{4}x$$
$$y=\frac{3}{4}x-1$$
$$y=\frac{3}{4}x-2$$

যদি সমীকরণ $ax+bx+c=0$ এইভাবে দেওয়া হয় তবে শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থ একটু অস্পষ্ট মনে হয়। কিন্তু যদি $y=\frac{3}{4}x+2$ কে ভেঙ্গে $4y=3x+8$ অথবা $4y-3x-8=0$ লেখা হয় তবে তখন জিনিসটি

আর উচ্চতা যখন প্রত্যেকের $(a-b)$, তখন সব মিলে ঘনফল হবে—$(a-b)(a^2+ab+b^2)$

অর্থাৎ $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$।

Irrational numbers

(পূর্ণ সংখ্যা বা সামান্য ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশের অযোগ্য সংখ্যা)

গণিতে প্রথমে স্বাভাবিক সংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়, যেমন—১, ২, ৩,……ইত্যাদি। এই সংখ্যা দিয়ে যোগ ও গুণ সব সময়ই সম্ভব হয়। কিন্তু ভাগের কাজ সব সময় সম্ভব হয় না। অর্থাৎ একটি সংখ্যাকে আর একটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে সব সময় পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় না। সেই জন্যই সৃষ্টি হোলো ভগ্নাংশের। আবার বিয়োগের কাজও সব সময় সম্ভব হয় না বলে সৃষ্টি হোলো ঋণাত্মক সংখ্যার।

যদি বর্গ ঘনাদির মূলাকর্ষণ (evolution) সব সময় সম্ভব করতে হয় তবে আর এক শ্রেণীর সংখ্যার দরকার হয় যাদের বলা যেতে পারে irrational number। যেমন নাকি $\sqrt{2}$। একে আমরা পূর্ণ সংখ্যা বা সামান্য ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি না।

গ্রীক্‌দের ভিতর পীথাগোরাস-পন্থীরা বার করলেন যে কোনও বর্গক্ষেত্রের কর্ণের ঠিক মাপ পাওয়া যায় না। তাঁরা শেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সংখ্যা মাত্রেই হচ্ছে হয় rational নয় irrational। আর irrational সংখ্যা হচ্ছে সেই সংখ্যা যা নাকি দুইটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেকটি পূর্ণ সংখ্যা বা সামান্য ভগ্নাংশ জ্যামিতিতে একটি রেখার উপর একটি বিন্দুর অবস্থিতি দিয়ে প্রকাশ করা যায়। সেইরূপ irrational সংখ্যা যেমন $\sqrt{2}$ প্রকাশ করা যায় দৈর্ঘ্য দিয়ে। 1″ বা 1′ বাহু সমেত একটি বর্গক্ষেত্র যদি নেওয়া যায় আর ঐ বর্গক্ষেত্রের কর্ণটির সমান করে যদি নেওয়া যায় একটি রেখা OP, তবে রেখাটির উপর P বিন্দুটিই প্রকাশ করবে $\sqrt{2}$। প্রত্যেকটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণ হচ্ছে বাহুর $\sqrt{2}$ গুণ। কিন্তু এমন কোনও ভগ্নাংশ

নেই যাকে বলা যেতে পারে ঠিক $\sqrt{2}$ এর সমান। $\sqrt{2}$ এর ঠিক কাছাকাছি পৌঁছাবার জন্য পর পর ভগ্নাংশ নিয়ে একটু একটু করে ক্রমে বড় করে দেখা যেতে পারে। যেমন $1, \frac{14}{10}, \frac{141}{100}, \frac{1414}{1000}, \cdots$ ইত্যাদি। কিন্তু তবুও ঠিক $\sqrt{2}$-তে পৌঁছানো যায় না। এই রকম অনুপাতকে গ্রীকরা বলেন অতুল্য পরিমাণ (incommensurable)। এই সব অতুল্য পরিমাণ সংখ্যা, ভগ্নাংশ, পূর্ণ সংখ্যা এই সব একত্রে হয় সত্যিকারের সংখ্যা রাশি।

'surd' কথাটির উৎপত্তির ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে Al-khowarizmi (৮২৫ খ্রীঃ) rational সংখ্যাদের বলতেন 'audible' অর্থাৎ যা শোনা যায় এবং surd-দের সম্বন্ধে বলতেন 'inaudible' অর্থাৎ যা শোনা যায় না। এই inaudible শব্দ থেকে surd শব্দটি এসেছে। surd অর্থ হচ্ছে বোবা (deaf, mute)। আরবরা ও হিব্রুরা এই surds-কে বলতেন 'non-expressible numbers'—অর্থাৎ যা প্রকাশ করা যায় না।

জ্যামিতি

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিক্ষার্থীরা জ্যামিতি বিষয়টি মুখস্থ করবার চেষ্টা করে। তাদের হয়তো ধারণা যে জ্যামিতি কতকগুলি বিন্দু, রেখা ইত্যাদি নিয়ে অর্থহীন খেলা। কতকগুলি সূত্র মুখস্থ, কতকগুলি সম্পাদ্য ও উপপাদ্যের সাধারণ নির্বচন, বিশেষ নির্বচন, অঙ্কন, প্রমাণ ইত্যাদি পড়ে পুনরুক্তি করতে পারলেই জ্যামিতি শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এই পুনরুক্তির জন্য শিক্ষার্থীরা বিষয়টি মুখস্থ করে আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করে। কাজেই দেখা যায় পরীক্ষার খাতায় অর্থহীন ভাবে তারা মাঝে মাঝে দুই-এক লাইন যুক্তির ধারা বাদ দিয়েও উপপাদ্য বা সম্পাদ্য শেষ করে দেয় এবং তাতে বিশেষ কিছু ত্রুটি হয় বলে মনে করে না। যাদের মুখস্থ করবার শক্তি প্রখর তারা 'একেবারে মুখস্থ লিখে দিয়ে এসেছি' বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে আর যাদের সে শক্তি সেরূপ নেই তারা হয়তো জ্যামিতি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। বিষয়টি তাদের মনে এক অহেতুক ভীতির সৃষ্টি করে।

এর কারণ হচ্ছে জ্যামিতি শিক্ষাপদ্ধতির দোষ। জ্যামিতি বিষয়টি কি—জীবনে এর কোন প্রয়োজন আছে কিনা—তা শিক্ষার্থী বুঝে ওঠে না। আগেই বলা হয়েছে যে শিক্ষা কার্যকরী করতে হলে তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে—শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন-বোধ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে কাজে। হাতে-কলমে পরীক্ষা করে সে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে চায়। এবং এইভাবে করলে সেই জ্ঞান তার কাছে স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে ওঠে। জ্যামিতি-শিক্ষা তার কাছে নীরস শুষ্ক বলে মনে হয় না।

জ্যামিতি-শিক্ষার প্রারম্ভেই শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে যে জ্যামিতি কি ও তারা কেন শিখছে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারে জ্যামিতির প্রয়োজন কি ও কিভাবে জ্যামিতি সাহায্য করে এ-ধারণা বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের দিতে হবে। প্রথম যখন জ্যামিতি বিষয়টি তারা আরম্ভ করে তখন তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে জ্যামিতি কি। জ্যামিতি যে মানুষের ইচ্ছামত তৈরী কতকগুলি তথ্য নয়—প্রয়োজনের তাগিদে যে এর

সৃষ্টি, জগতের রহস্য আবিষ্কার করতে গিয়ে যে এর উদ্ভব, তারই আভাস দিতে হবে। সুতরাং এর সৃষ্টির ইতিহাস একটু উল্লেখ করলে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে।

জ্যামিতি শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করলেই জ্যামিতি-শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকটা বোঝা যাবে। জ্যামিতি শব্দ এসেছে জ্যা ও মিতি এই দুইটি শব্দ থেকে। জ্যা অর্থ পৃথিবী আর মিতি অর্থ হচ্ছে পরিমাপ। ইংরেজীতে বলা হয় Geometry—Geo অর্থ পৃথিবী আর meter অর্থ মাপা। প্রত্যেক দেশেই জ্যামিতির সৃষ্টি হয়েছে ক্ষেত্র মাপার ভিতর দিয়ে।

আমাদের দেশে বৈদিক যুগে যজ্ঞের বেদী তৈরি করতে গিয়ে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা জ্যামিতিক আকৃতির ব্যবহারের কথা জানা যায়। প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ভাস্কর তাঁর বই 'লীলাবতী'তে জ্যামিতি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখেছেন দেয়াল, পুষ্করিণী, কূপ, ছায়া ইত্যাদি সম্বন্ধে। অর্থাৎ এই সব করতে গিয়েই জ্যামিতির প্রয়োজন হয়েছে। মিসর দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে নীলনদের প্লাবনের পর জমির হিসাব রাখতে গিয়ে ও তীরে বাঁধ বাঁধতে গিয়ে নানা মাপের দরকার হয় ও তার ভিতর দিয়েই জ্যামিতির উন্নতি। রোম দেশে জ্যামিতি আরম্ভ হয় নগর তৈরি করতে গিয়ে। গ্রীস দেশে জ্যামিতির উন্নতি হয়েছে কলার ভিতর দিয়ে। যত স্থাপত্য, ভাস্কর্য—সবের ভিতরই জ্যামিতিক আকৃতির ব্যবহার দেখা যায়। জ্যামিতির সাহায্যে তাঁরা তাঁদের তৈরী জিনিসকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত করতে সক্ষম হয়েছেন। কোনও একটি জিনিসকে যদি সুন্দর করতে হয় তবে তার ভিতর সমতা ও সামঞ্জস্য থাকা চাই। জ্যামিতিতে এসব নিয়েই চর্চা চলে।

শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে স্বর্ণকার, লৌহকার, রাজমিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী প্রভৃতি কারিগর, তা ছাড়া যারা ঘর-বাড়ীর নক্শা তৈরি করে, জমির মাপের কাজ করে, বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি সকলেরই জানতে হয় কি করে সঠিক ও নিখুঁত ভাবে নানা আকারের ও নানা প্রকারের জিনিস ও ক্ষেত্রের মাপ জ্যামিতির সাহায্যে সহজে করতে পারা যায়।

তারপর যখন শিক্ষার্থীরা আর এক ধাপ উপরে উঠবে তখন তাদের বোঝাতে হবে যে কেবলমাত্র যে নানারকম ক্ষেত্রের মাপ, আয়তন ইত্যাদি

ঠিক করবার জন্যই জ্যামিতির ব্যবহার প্রয়োজন হয় তা নয়। জ্যামিতির সঙ্গে যতই তারা পরিচিত হবে দেখবে যে এই বিষয়টি পৃথিবীর নানা রহস্য বুঝতে তাদের কত সাহায্য করে। প্লেটো বলেছেন যে ভগবান সৃষ্টির ভিতর দিয়ে জ্যমিতির খেলা খেলছেন। উদ্ভিদ-জগতের দিকে দেখলে দেখা যায় যে এক একটি ফলের এক এক রকম আকৃতি। আনারসের গায়ে বহুভুজের আকৃতি। ফার্ণ গাছের পাতা, তেঁতুলের পাতা, পাইন গাছের ডাল ইত্যাদি সমান্তরাল ভাবে সাজানো। গাছের পাতা সব নানা আকারের। পেঁপে, নারকেল প্রভৃতি গাছ কতকটা বেলন আকৃতি (cylindrical)।

প্রাণী-জগতের দিকে দেখলে দেখা যায় যে মাকড়সা যে জাল বোনে মনে হয় যেন সে বহুভুজ আঁকবার নিয়ম সব জানে। মৌমাছি তার মৌচাকে যে খোপগুলি বানায় তার অধিকাংশই হয় ষড়ভুজ অর্থাৎ ছয়-বাহু-বিশিষ্ট। পাখী যে বাসা বাঁধে তার ভিতর কেমন সমতা দেখা যায়। এসব দেখলে সত্যিই মনে হয় যে সৃষ্টির ভিতর দিয়ে জ্যামিতির খেলা চলছে।

ভগবানের সৃষ্টির এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে মানুষ জ্যামিতিক তথ্য সংকলন করলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে লক্ষ্য করলো যে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সবই বৃত্তাকার দেখায়। সূর্য যে পথে পূবে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায় তা-ও অর্ধবৃত্তাকার। তখন মানুষ বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করলো। সূর্য দেখা যায় পূবে ওঠে, আবার সারাদিন ধরে মাথার উপর দিয়ে গিয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। সূর্য কখন কতটা উঁচুতে উঠেছে, আমাদের কাছ থেকে কতটা দূরে আছে, রোজ যে চাঁদ আকাশে দেখা যায় সে চাঁদ কত বড়, পৃথিবী থেকে কতটা দূরে, একটি পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে পাহাড়টি কত উঁচু, একটি নদীর কাছে দাঁড়িয়ে নদীটি কত চওড়া, পৃথিবীর এক জায়গায় যখন বেলা ৯টা বেজেছে—কোনও জায়গায় হয়তো ভোরই হয়নি আবার কোনও জায়গায় হয়তো রাত ৯টা—এই সব তথ্য জানতে জ্যামিতির ব্যবহার প্রয়োজন হয়। এই সব বুঝতে হলে রেখা, ঋজুরেখ ক্ষেত্র, বৃত্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে হয়। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে রেখা, ত্রিভুজ, বহুভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি নিয়ে আঁক কষাই জ্যামিতির উদ্দেশ্য, মনে রাখতে হবে যে জ্যামিতি-শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য তাই নয়। এর থেকে শিক্ষার্থীরা যে-জ্ঞান লাভ করবে তা দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজে প্রয়োজন হবে এবং ভগবানের সৃষ্টিকেও বুঝতে সাহায্য করবে।

মনোবিজ্ঞান ও জ্যামিতি শিক্ষা-পদ্ধতি

আগেই বলা হয়েছে যে Gestalt-বাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গণিতকে সমগ্রভাবে বুঝবার ও জানবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জ্যামিতি আরম্ভ করা হয় সূত্র ধরে। বিন্দুর থেকে আরম্ভ করে রেখা, তারপর সমতল ক্ষেত্র ও পরে ঘনবস্তু এইভাবে শেখানো হয়। কিন্তু শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনে ঘনবস্তু নিয়েই বেশীর ভাগ সময় নাড়াচাড়া করে। বিন্দু বা রেখার ব্যবহার খুব কমই করে। জ্যামিতিক বিন্দুর সূত্র হচ্ছে—যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ কিছুই নেই, কেবল অবস্থিতি আছে তার নাম বিন্দু। সুতরাং জ্যামিতিক বিন্দুর কোনও আয়তন নেই। পেন্সিলের অগ্রভাগ যতদূর সম্ভব সরু করে তার সাহায্যে কাগজের উপর একটি দাগ বসালে, ঐ দাগটিকে বিন্দু বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা জ্যামিতিক বিন্দু নয়। কারণ ঐ দাগ যতই ছোট হোক না কেন, ওর কিছু-না-কিছু আয়তন থাকবেই। সুতরাং জ্যামিতিক বিন্দু হচ্ছে সত্যিকারের কল্পনার বস্তু। আবার রেখার সূত্র হোলো যে কেবল দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার বা বেধ নেই। এরকম জিনিস কি প্রকৃত আঁকা যায় যার শুধু দৈর্ঘ্য আছে, একটুও প্রস্থ নেই? যত সরু করেই আঁকা হোক না কেন—একটু-না-একটু প্রস্থ থাকবেই। জ্যামিতিক রেখা সেজন্য আঁকা যায় না—কল্পনা করতে হয়। সেজন্য পর পর বিন্দু ও রেখার সূত্র দিয়ে যদি জ্যামিতি আরম্ভ করা যায় তবে জ্যামিতি একটি অবাস্তব, কাল্পনিক ও বিমূর্ত জিনিস বলে মনে হবে, তাতে আশ্চর্য কি?

কিন্তু সত্যিই কি জ্যামিতি কাল্পনিক কিছু? জ্যামিতির ব্যবহার আসে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে—প্রতিদিনকার কাজে। ঘনবস্তু নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করি। ঘনবস্তুর আকৃতি, প্রকৃতি, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতঃই জানবার জন্য অনুসন্ধিৎসা থাকবে। ঘনবস্তুর অংশ হিসেবে সমতল, সমতলের অংশ হিসেবে রেখা, রেখার অংশ হিসেবে বিন্দু, এইভাবে যদি আলোচনা করা যায় তবে বিষয়টি বিমূর্ত হবে না বরং মূর্ত হয়ে উঠবে। জ্যামিতি বিষয়টির সমগ্র বাস্তব রূপও আমরা ধারণা করতে পারবো।

আগেই বলা হয়েছে গণিতে প্রেষণার (motivation) খুবই দরকার। প্রেষণা দুইভাবে আসে—প্রথম ভিতর থেকে ও দ্বিতীয় বাইরে থেকে। ভিতর

থেকে যা আসে তা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য, আগ্রহ, প্রয়োজনীয়তা-রোধ, মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আসে। বাইরের থেকে যা আসে তা যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী শেখে সেই পরিস্থিতি অর্থাৎ বাইরে থেকে আসে। পরীক্ষার নম্বর, পারিতোষিক, তারকা চিহ্ন, পুরস্কার, অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী কর্তৃক শিক্ষার্থীর কাজের যথাযোগ্য অনুমোদন ইত্যাদি থেকে আসে বাইরের প্রেষণা। অপর পক্ষে তিরস্কার, ঠাট্টা, ভয়প্রদর্শন, ব্যঙ্গ ইত্যাদিতে প্রেষণার বিপরীত কাজ হয়।

শিক্ষায় আগ্রহ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। একটি কাজ করতে গিয়ে যখন সেটি ঠিকমত হতে থাকে তখন শিক্ষার্থী আত্মপ্রসাদ লাভ করে, এবং আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। সুতরাং গণিত ঠিকমত কষতে পারলে তাতেও শিক্ষার্থীর মনে প্রেষণা আসে।

শিক্ষা দু'রকমে দেওয়া যেতে পারে—এক হচ্ছে যুক্তিধারা অনুসরণ করে, আর এক হচ্ছে—মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করে (Logical & Psychological)।

যুক্তিধারা অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে বিষয়টিকে এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যে সমগ্র বিষয়টি যেন যুক্তির দিক দিয়ে বেশ ধারাবাহিক হয়। একটির পর একটি যুক্তি দিয়ে বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে শেখালে বিষয়টির উপরই শিক্ষকের মনোযোগ বেশী থাকে। বিষয়টি যুক্তি অনুসারে বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভাগ করে, অবচ্ছেদ অনুসারে সাজিয়ে নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সমস্ত বিষয়টি একটি পরিকল্পনা অনুসারে সাজিয়ে নেওয়া হয় এবং সেই পরিকল্পনাটি পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত থাকে। কিন্তু মনস্তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে বিষয়, প্রসঙ্গ, শিক্ষার ধারা প্রভৃতি স্থির হয়। শিক্ষার্থী যখন যার প্রয়োজন বোধ করে, তখন সে বিষয় উপস্থিত করা হয়। পরিকল্পনা পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত থাকে না। এখানে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে শিশুর আগ্রহ, তার সুপ্ত ক্ষমতা, মেজাজ, পছন্দ, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করা হয়। তারপর এই সব বুঝে সেই অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং যাকে মনস্তত্ত্বসম্মত বলা হচ্ছে তা যে অযৌক্তিক বা বিযৌক্তিক তা নয়,—এ হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনের যুক্তি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের ধারা বুঝতে চেষ্টা করেন। কি রকম করে শেখালে শিক্ষার্থী আগ্রহান্বিত হবে, কি করে পাঠ চিত্তাকর্ষক করে তোলা

যায়—এই সব ভেবে তবে পাঠ দেন। শিক্ষার্থীর মনের ধারা অনুসারে পাঠ দেওয়া হয় বলে শিক্ষার্থী পাঠে আনন্দ পায়। সে স্বাধীনতা উপভোগ করে ও তার ভিতরের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশ পায়। নিজের চেষ্টায় সে শিক্ষালাভ করে অর্থাৎ নিজেকে সে নিজেই শিক্ষা দেয়। এভাবে শিখলে বিষয়টির প্রত্যেকটি ধাপ, প্রত্যেকটি যুক্তি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জ্যামিতি-শিক্ষা এতদিন যেভাবে দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে—যুক্তিধারা-অনুসৃত পদ্ধতিতে (Logical method)। কতকগুলি সূত্র মুখস্থ করার পর পরলব্ধ জ্ঞান, পরের চিন্তাধারা, পরের অভিজ্ঞতা অনুসারে লিপিবদ্ধ কতকগুলি উপপাদ্য ও সম্পাদ্য শিক্ষার্থীকে শিখতে হয়। এর ভিতর তার নিজের কোনও উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা সে খুঁজে পায় না, নিজের কোনও অভিজ্ঞতা থেকে এ তথ্য আহৃত হয় না। তার নিজের যুক্তি খাটাবার কোনও অবকাশ সে পায় না এবং সেজন্যই সে আগ্রহ বোধ করতে পারে না। বিষয়টি আয়ত্তে আনতে মুখস্থ করবার চেষ্টা চলে আর ফলে সমস্ত বিষয়টি নীরস শুষ্ক মনে হয়।

১১, ১২, ১৩ এই বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীর যুক্তির ক্ষমতা ততটা উন্নত হয় না। হাতে-কলমে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সে পারে এবং ভালবাসে এবং তাতেই আনন্দ পায়। সুতরাং যুক্তির কঠোরতার ভিতর গিয়ে বিষয়টিকে অযথা নীরস, শুষ্ক ও ভয়াবহ করে না তুলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজসাধ্য যা—যাতে তারা আনন্দ পায় অর্থাৎ হাতে-কলমে কাজ করে এই সব সম্পাদ্য উপপাদ্য বিশ্লেষণ যদি সে করতে চেষ্টা করে তবে সমগ্র বিষয়টির একটি ধারণা তার হবে। সমস্ত বিষয়টির একটি ধারণা পাওয়ার পর যদি সে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে তখন যুক্তির ধারা সে কিছু কিছু বুঝবে, কারণ যুক্তির ক্ষমতা তখন তার কিছু বাড়বে এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণের আনন্দও সে পাবে।

অনেকের মতে এইরকম হাতে-কলমে বিশ্লেষণমূলক কাজ করতে গেলে অযথা সময় নষ্ট হবে। একবার বিশ্লেষণমূলক কাজ করে আবার সেই একই জিনিস যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে গেলে একই বিষয়ের উপর দুইবার করে বৃথা সময় দিতে হবে। তার উত্তরে বলা যায় যে গণিতে পুনশ্চর্চার প্রয়োজন যথেষ্ট রয়েছে। এতে সময়ের অপচয় হবে না বরং সাশ্রয় হবে। কারণ প্রথমে যদিও তারা ধীরে ধীরে এগোবে কিন্তু বিষয়টিতে তাদের আগ্রহ জন্মাবে। আগ্রহ-ই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান সহায়। প্রথম দিকে বিষয়বস্তুর কতখানি তারা আয়ত্ত

করতে পারলো সেটাই লক্ষ্য থাকবে না,—বিষয়টিতে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারা গিয়েছে কিনা সেটাই হবে পরম লক্ষ্য। বিষয়টিতে যদি আগ্রহ বোধ করে তবে পরে তারা নিজেরাই দ্রুত এগিয়ে চলবে।

বর্তমানের ধারণা জ্যামিতি-শিক্ষাকালে দুইটি বিষয়ের উপর বেশী জোর দিতে হবে—(১) স্বজ্ঞা (intuition), (২) বিশেষ বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া (induction)। স্বজ্ঞা মানে যে শিক্ষার্থীকে বলা হয় যে 'দেখ এবং বোঝ তোমার মন কি বলে'। যেমন নাকি একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড়। শিক্ষার্থী এ বিষয়টি মনে মনে বোঝে যে এ তো ধ্রুব সত্য। এর আবার প্রমাণের কোনও প্রয়োজন আছে বলে তার বিশ্বাস হয় না। ইউক্লিড কিন্তু তাঁর জ্যামিতিতে এটি প্রমাণ করতে গিয়ে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ, উপপাদ্য প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছেন যা নাকি আরও বেশী কঠিন। যুক্তির ধারার দিক দিয়ে হয়তো এইরকম প্রমাণের মূল্য আছে, কিন্তু জ্যামিতি বিষয়টির দিক থেকে যে এর খুব বেশী প্রয়োজন আছে তা নয়—বরং এতে শিক্ষার্থীর উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া ও তার শক্তির অপচয়ের আশঙ্কাই থাকে। একটি ছোট্ট বাদাম ভাঙবার জন্য কর্মকারের বৃহৎ হাতুড়ির ব্যবহার যেমন বাড়াবাড়ি, এও ঠিক তাই। সুতরাং এই যুক্তি যতদিন শিক্ষার্থী না বুঝবে ততদিন পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে যদি বিষয়টিতে আর অগ্রসর হতে না দেওয়া হয় তবে অপচয়ই হবে সন্দেহ নেই। ইউক্লিডের প্রথম দুইটি উপপাদ্য—একটি সরল রেখা আর একটি সরল রেখার সঙ্গে কোনও এক বিন্দুতে মিললে পাশাপাশি কোণ দুইটি যে দুই সমকোণের সমান হয় অথবা একটি সরল রেখার কোনও এক বিন্দুতে ঐ রেখার বিপরীত দিক থেকে আর দুইটি সরল রেখা মিলিত হলে যে পাশাপাশি কোণ দুইটি উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি যদি দুই সমকোণের সমান হয় তবে ঐ দুই সরল রেখা একই সরল রেখায় অবস্থিত। জ্যামিতিতে এই প্রথম দুইটি উপপাদ্যই বোধ হয় অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে আরম্ভেই বিভ্রান্ত করে দেয়। এই উপপাদ্য দুইটি এত প্রত্যক্ষ যে এদের প্রমাণের কোনও দরকার আছে বলে বর্তমানে গণিতজ্ঞরা মনে করেন না। ইহা স্বজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যায় সেজন্য প্রমাণের চেষ্টা করে অযথা সময় নষ্ট না করে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে বিষয়টিতে এগিয়ে যাওয়াই গণিতজ্ঞরা সমীচীন মনে করেন।

জ্যামিতির ইতিহাস পড়লেও তা-ই দেখা যায়। ইউক্লিডের বহু পূর্বেই জ্যামিতির সৃষ্টি। স্বজ্ঞা (intuition)-ই ছিল প্রশস্ত উপায়। সুতরাং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার সময়ও নজর রাখতে হবে যেন তারা আত্মপ্রত্যয়ের ব্যবহার করে।

জ্যামিতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, যেখানে শুধু স্বজ্ঞা দ্বারা কাজ হয় না, সেখানে আরোহী প্রণালী অর্থাৎ induction-এর উপর ভিত্তি করে জ্যামিতির সৃষ্টি। হাতে-কলমে কাজের ভিতর দিয়ে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ছিল প্রকৃষ্ট উপায়। একটি কি দুইটি দৃষ্টান্তে হয় না,—অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে তবে সিদ্ধান্তে আসতে হয়। সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য নির্ভর করবে দৃষ্টান্তের সংখ্যার উপর। যত বেশী দৃষ্টান্ত হবে সিদ্ধান্তও তত বেশী নির্ভরযোগ্য হবে।

জ্যামিতির ইতিহাস ও শিক্ষা-পদ্ধতি

বহু বৎসর পূর্বে হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'Education' নামক বইখানিতে এই লাইনটির উল্লেখ করেছেন—'The education of the child must accord, both in mode and arrangement, with the education of mankind considered historically'—অর্থাৎ শিশুর শিক্ষার ধারা ও ব্যবস্থা ঠিক সেইভাবে হবে যেভাবে ইতিহাসে দেখা যায় মানবজাতি ক্রমে ক্রমে তার শিক্ষা লাভ করেছে। সুতরাং জ্যামিতি-শিক্ষাও যদি কার্যকরী করতে হয় তবে সেভাবেই শেখাতে হবে যেভাবে জ্যামিতি বিষয়টির ক্রমবিকাশ ইতিহাসে দেখা যায়।

জ্যামিতির সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম তথ্য ইজিপ্টের একখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেখানে জ্যামিতির যে জ্ঞানের আভাষ পাওয়া যায় তা হচ্ছে অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কৃত কতকগুলি নিয়ম।

একটি আয়তক্ষেত্রের তল দেওয়া আছে, তলটি মাপতে হবে। একটি একক নেওয়া হোলো, সেটিও একটি ক্ষুদ্র আয়তক্ষেত্র। এই ছোট আয়তক্ষেত্রটির সাহায্যে দেওয়া আয়তক্ষেত্রের তলটি মাপা যায়। দেখা গেল কয়েকবার ছোট আয়তক্ষেত্রটি বসালেই দেওয়া তলটি প্রায় মাপা হয়;

কিন্তু আরও একটু অংশ বাকী থাকে, অর্থাৎ দেওয়া তলটি সম্পূর্ণভাবে এ ছোট ক্ষেত্রটি দ্বারা মাপা যায় না। তখন মাপবার জন্য একক হিসাবে আরও ছোট একটি আয়তক্ষেত্র নেওয়া গেল। এইভাবে আয়তক্ষেত্রটি মাপবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এখন এভাবে অনেকগুলি আয়তক্ষেত্রের মাপ হয়তো মেপে বার করা হোলো। পাশে পাশে ক্ষেত্রগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপও দেওয়া আছে। হঠাৎ একজন আবিষ্কার করলো যে ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য × প্রস্থের সমান। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে যত বেশীসংখ্যক ক্ষেত্রের মাপ পরীক্ষা করা যাবে সিদ্ধান্তও তত বেশী নির্ভরযোগ্য হবে।

এই আবিষ্কার হয় যুক্তিশাস্ত্র অনুসারে (logically), কিন্তু এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোনও বিজ্ঞানসম্মত (scientific) জ্যামিতির অংশ হিসাবে একে ধরা যায় না।

কিন্তু যে নাকি বিজ্ঞানসম্মত জ্যামিতির ধারা সব জানে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি করে বার করা যায়, সে তখন সরল রেখা, সমান্তরাল রেখা প্রভৃতির নানা রকম সূত্র খাটিয়ে বার করে দেবে যে, একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের পরিমাণ তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফলের সমান। এই যে সূত্রটি—দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = ক্ষেত্রফল, এটি তত্ত্ব হিসাবে তার মনে রয়েছে। যখনই কোনও বাস্তব সমস্যা আসে তখনই সে এই সূত্রটি ব্যবহার করে।

এই দুইটি পদ্ধতির ভিতর পার্থক্য কি? অভিজ্ঞতা থেকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার ফলে যা আবিষ্কার করা যায় তার ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষার উপর, এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দৃষ্টান্ত থেকে একটি সাধারণ তথ্যে আসা। কিন্তু অন্য পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত ধারণা, সূত্র ইত্যাদি যা নাকি আগের সূত্র ইত্যাদি কতকগুলি কঠোর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি হচ্ছে পরীক্ষামূলক জ্যামিতি, আর একটি উদ্ভূত হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত জ্যামিতি থেকে। সুতরাং একটি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত নিয়ে এবং অন্যটি কতকগুলি সাধারণ উপপাদ্য নিয়ে কাজ করে।

ইজিপ্টের গ্রন্থে দেখা যায় যে তারা অধিকাংশ তথ্য আবিষ্কার করে নানা প্রকার মাপের ভিতর দিয়ে। তাদের জ্যামিতি ছিল ব্যবহারিক। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ তথ্য আবিষ্কার করাই ছিল তাদের

নিয়ম। যতদূর সম্ভব আসন্ন মাপ তারা বার করতে চেষ্টা করতো। কিন্তু গ্রীক্ জ্যামিতি যা নাকি পরে এসেছে তা হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত (scientific) উপায়ে। সাধারণ তথ্যের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ, একেবারে সঠিক মাপের উপর জোর দেওয়া, এই ছিল তাদের লক্ষ্য। Thales যে জ্যামিতি আবিষ্কার করলেন সে হচ্ছে বিমূর্ত জ্যামিতি। দুইটি উপপাদ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন বলে জানা যায়—একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ দুই সমকোণের সমান ; আর দুই সমান-কোণী ত্রিভুজের বাহুগুলি সমানুপাতিক। Thales-এর পরে পিথাগোরাসের স্কুলের উদ্ভব। তাঁরা জ্যামিতিকে একটি বিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত করিল এবং বিষয়টিকে একেবারে বিমূর্ত করে তুললেন।

তারপর ইউক্লিড বিষয়টিকে একেবারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে আরম্ভ করলেন ও বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। শত শত বর্ষ পরে প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের মনে যুক্তির ভিত্তিতে যে জ্যামিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সূত্র, স্বতঃসিদ্ধ, উপপাদ্য ইত্যাদি নিয়ে তা-ই শিশু-শিক্ষার্থীর জন্য তিনি লিপিবদ্ধ করলেন।

কিন্তু এই জ্যামিতি কি শিশু-শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজ্য ? ইতিহাসের উদ্ভব অনুসারে শিক্ষার্থী আগে হাতে-কলমে নানারকম পরীক্ষা ও মাপের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরে ধীরে ধীরে বিমূর্তভাবে বিষয়টি শিখলে, তা-ই স্বাভাবিক শিক্ষা হবে বলে অনেকের ধারণা।

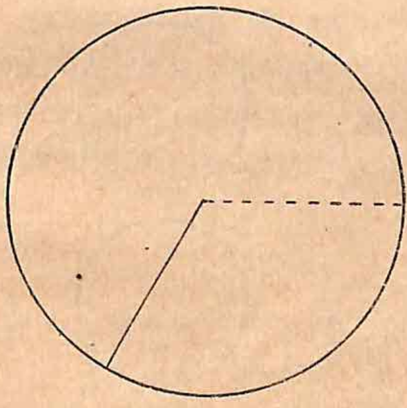
জ্যামিতি-শিক্ষার প্রথম সোপান

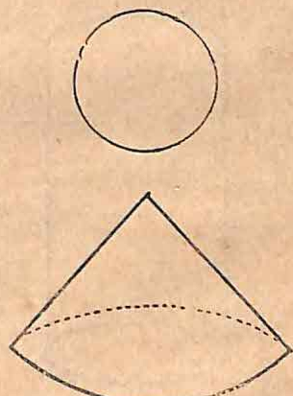
শিক্ষা তখনই কার্যকরী হয় যখন শিক্ষার্থী বিষয়টি শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। সেজন্য জ্যামিতি-শিক্ষার প্রথম সোপানে শিক্ষার্থীদের বুঝতে দেওয়া দরকার যে কেন তারা বিষয়টি শিখবে। কোন্ দেশে কিভাবে জ্যামিতির সৃষ্টি হয়েছে তা বয়সোপযোগী করে ও ছোট্ট করে শিক্ষার্থীদের কাছে বললে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতেই জ্যামিতির সৃষ্টি।

এইভাবে জ্যামিতির সৃষ্টির কথা শুনলে শিক্ষার্থীরা জ্যামিতি বিষয়টি জানবার জন্য আগ্রহান্বিত হবে। এখন যেভাবে জ্যামিতি শেখানো হয় তাতে

মনে হয় যে জ্যামিতি কতকগুলি বিন্দু ও রেখা নিয়ে খেলা। প্রতিদিনের নিত্য ব্যবহারে যে জ্যামিতির প্রয়োজন হয়, জগতের সৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে জ্যামিতির খেলা চলছে তা শিক্ষার্থীরা ধারণাই করতে পারে না। সেজন্য আরম্ভ করতে হবে চারপাশে যে-সব নিত্য ব্যবহার্য জিনিস আছে তার ভিতর দিয়ে।

যে-সব জিনিস চারপাশে দেখা যায় তাদের আকৃতি এক নয়,—কোনটি চৌকো, কোনটি গোলাকার, কোনটি ডিম্বাকার, কোনটি খানিকটা বাঁকা কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নয়, ইত্যাদি। প্রত্যেকটি জিনিসই খানিকটা জায়গা জুড়ে আছে। এই জন্যই জ্যামিতিতে এই বস্তুগুলিকে বলা হয় ঘনবস্তু। স্থান জুড়ে থাকাই এদের ধর্ম। টেবিল, চেয়ার, খাট, বিছানা, থালা, বাটি, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি সবই ঘনবস্তু। টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি, বাড়ী-ঘর, দরজা, জানালা ইত্যাদি আছে চারকোনা ; আবার বল, মার্বেল, ঘড়ি, রান্নার হাঁড়ি, কড়াই, হাতা, টেবিল প্রভৃতি কতক আছে গোলাকার। এই জিনিসগুলির কোনও কোনটির হয়তো একটি পিঠ—যেমন বল, মার্বেল। এদের বলা হয় গোলক। এদের পিঠটি বাঁকা। শিক্ষার্থীরা নানাপ্রকার উদাহরণ দেবে। মাটি দিয়ে বা প্লাস্টিসিন দিয়ে এরকম জিনিসের নমুনা তৈরি করবে।



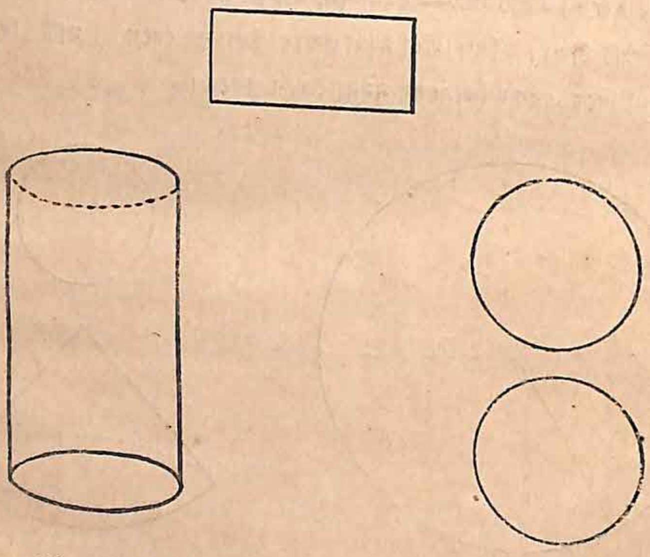


কোনও কোনও জিনিসের দুই পিঠ। শিক্ষক বা শিক্ষিকা দুই-পিঠ-যুক্ত জিনিসের উদাহরণ দেবেন। যেমন মোচাকে আড়াআড়ি ভাবে কাটলে নীচের

দিকে যে ভাগটি হয় সেটি কতকটা এই আকারের হয়। এই আকারের যে ঘনবস্তু, তাকে বলা হয় শঙ্কু বা কোন্ (cone)। এর দুই পিঠ—এক পিঠ বাঁকা, আর এক পিঠ সমতল। মাটি বা প্লাস্টিসিন দিয়ে শিক্ষার্থীরা এই আকারের জিনিস তৈরি করতে পারে। তা ছাড়া কাগজেও নক্‌শা এঁকে ও কেটে এই আকারের জিনিস পেতে পারে।

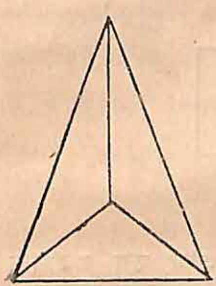
তারপর আসবে তিন-পিঠ-যুক্ত জিনিসের কথা। কতকগুলি জিনিস যেমন রোলার, জানালার সিক, পেন্সিল (কাটার আগে), অনেক বাড়ীর গোল থাম, মোমবাতি (মুখ বাদে), এই সব জিনিসের তিনটি পিঠ—একটি বাঁকা ও দুইটি সমতল। এই আকারের যে ঘনবস্তু তাদের বলা হয় বেলন (Cylinder)।

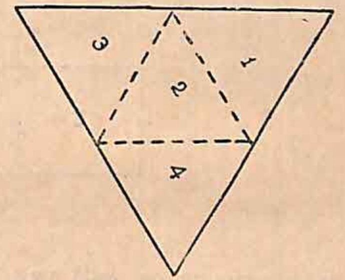
মাটি বা প্লাস্টিসিন দিয়ে এই ধরনের জিনিস শিক্ষার্থীরা নিজেরা তৈরি করতে পারে। তারপর কাগজের উপর নক্‌শা কেটে নিয়ে কি করে এই আকারের জিনিস তৈরি করতে হয় তার দৃষ্টান্ত দেখানো হোলো।

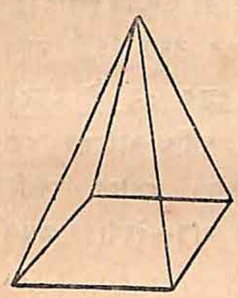


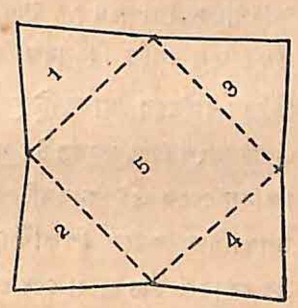
চার-পিঠ-যুক্ত জিনিসের কথা বললেই আসবে পিরামিডের কথা। কোনও কোনও পিরামিডের ৪টি তল, কোনও কোনও পিরামিডের ৫টি তল। ভিত্তি যেখানে ত্রিকোণাকার অর্থাৎ ত্রিভুজাকার সেখানে পিরামিডের ৪টি

তল। যে পিরামিডের ভিত্তি একটি চতুর্ভুজ সেখানে পিরামিডের ৫টি তল।

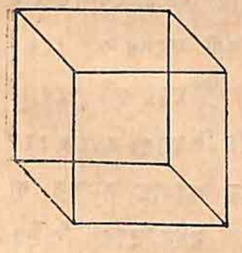


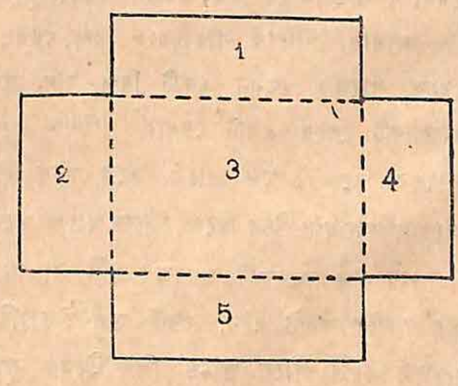




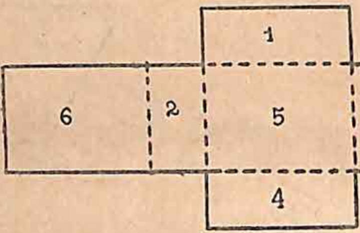


একটি খোলা বাক্সের ৫টি তল, একটি ঢাকা-দেওয়া বাক্সের ৬টি তল। নদীর ধারে বসবার জন্য অনেক সময় বাঁধানো জায়গা থাকে যার ৮টি তল শিক্ষার্থীরা এই সব ঘনবস্তুর মডেল মাটি বা প্লাস্টিসিন দিয়ে করতে পারে। আবার কাগজ দিয়েও এই রকম মডেল করা যায়।





এইভাবে ঘনবস্তুর নানাপ্রকার জ্যামিতিক আকারের ধারণা হবার পর বস্তুগুলির বিভিন্ন অংশের ধারণা দেওয়া যেতে পারে। আগেই আলোচনা



করা হয়েছে যে এক একটি বস্তুর বিভিন্ন সংখ্যক তল। এখন তল কতখানি জায়গাকে বলা হবে? যখন বলা হয় যে পিরামিডের ভিত্তির তল ত্রিভুজাকার, তখন তল বলতে কি সমস্ত ভিত্তিকেই বোঝা যায়? তল সমস্ত ভিত্তি নয়। ভিত্তির বাইরের আবরণটুকু তল। সুতরাং কোনও বস্তুর তল ঐ বস্তুরই একটি অংশ এবং ঘনবস্তুটির সীমা নির্দেশ করে দেয়, অর্থাৎ বাইরের অন্য জিনিস থেকে এই ঘনবস্তুটিকে আলাদা করে দেয় এই তল। এভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থী বুঝবে যে তলের শুধু দুইটি মাপ—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। এর কোনও উচ্চতা বা বেধ নেই।

এইভাবে রেখার ধারণাও দিতে হবে। দুই তলের সীমানা নির্দেশ করে দেয় রেখা। কাজেই রেখার মাপ হয় তার দৈর্ঘ্য দিয়ে। প্রস্থের কোনও কথা এখানে আসে না।

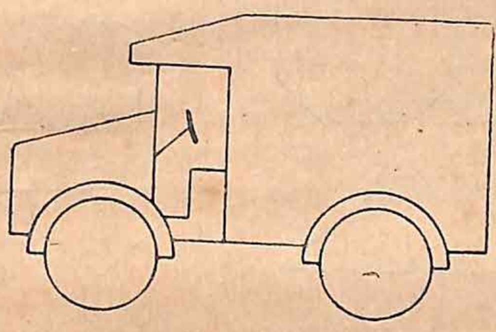
আবার দুইটি রেখা যেখানে মিলিত হয় সেই স্থানকে বিন্দু বলে। বিন্দুর দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ কিছুই নেই, কেবল অবস্থানটুকু আছে।

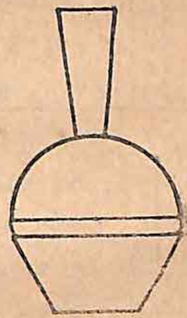
আবার 'গতি'র সাহায্যেও বিন্দু, রেখা, তল, ঘন ইত্যাদির ধারণা দেওয়া যেতে পারে। যেমন একটি বিন্দু যদি ক্রমশঃ চলতে থাকে তা হলে তার গতিপথটি শেষে একটি রেখায় পরিণত হবে। আবার একটি রেখাও যদি পাশের দিকে চলতে থাকে তবে তার গতিপথে একটি তলের সৃষ্টি হবে। আবার তল যদি উঁচুর দিকে উঠতে থাকে তবে ক্রমশঃ একটি ঘনর সৃষ্টি করে।

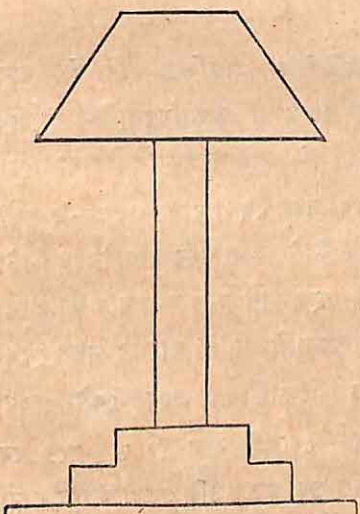
এর পর কয়েকটি ঘনবস্তুর ছবি বা মডেল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে প্রত্যেকটির কয়টি ধার, কয়টি তল ইত্যাদি। তল যে আবার সমতল বা বক্রতল হতে পারে তা-ও শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে। যখন তারা বিভিন্ন

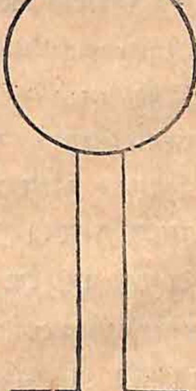
আকারের ঘনবস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করবে তখনই দেখবে ঘনবস্তুর পিঠ বা তল অনেক সময় বাঁকা হয়, যেমন—মার্বেল, বল, শঙ্কু ইত্যাদি।

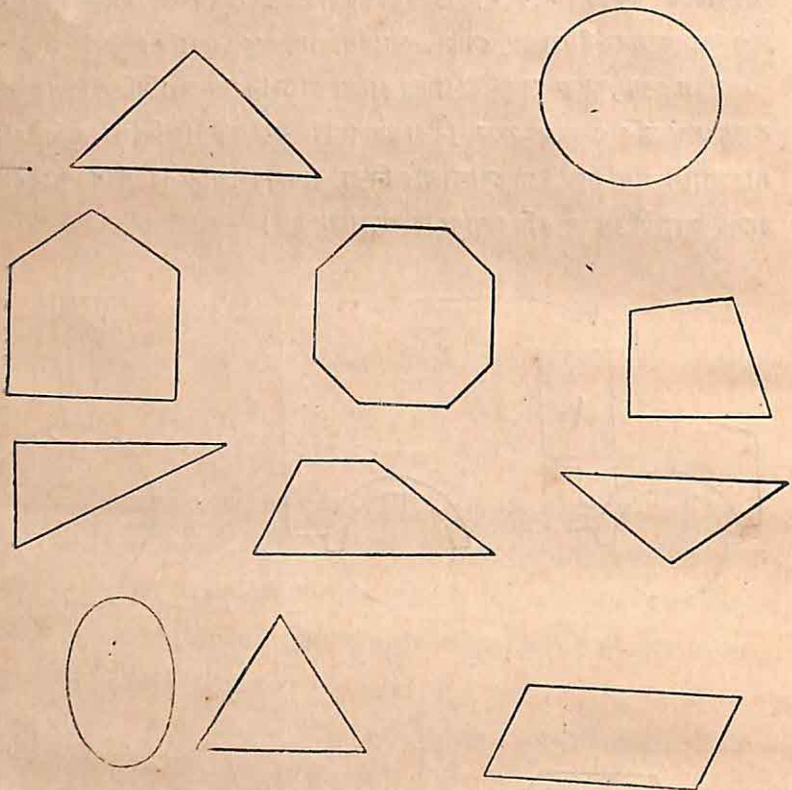
সরল রেখা, বক্র রেখা ইত্যাদির ধারণা পাওয়ার পর জ্যামিতিক আকৃতির কতকগুলি ছবি ও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য কয়েকটি জিনিসের ছবি যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে বোঝা যায় নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের ছবি আঁকতে হলেই জ্যামিতিক আকৃতির ব্যবহার প্রয়োজন হয়।







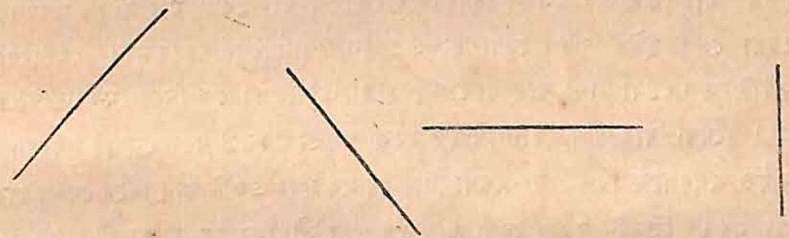


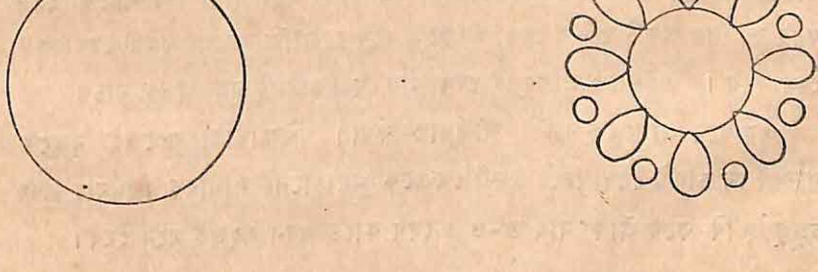


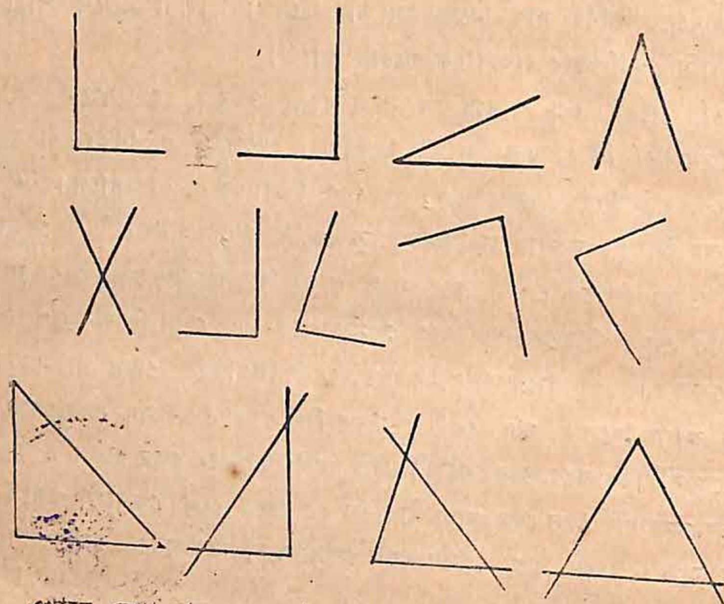
তারপর শিক্ষার্থীরা বুঝবে যে সঠিক জ্যামিতিক আকৃতির ছবি আঁকবার জন্য যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন হয়—শুধু হাতে তা হয় না। তখন যন্ত্রপাতির বাক্সের (Instrument Box) ব্যবহার তারা শিখবে। কি করে সরল মাপনীর সাহায্যে নির্দিষ্ট মাপের সরল রেখা আঁকতে হয় অথবা সরল রেখা মাপতে হয়—এ সবই তারা শিখবে। সরল রেখা মাপা সম্পর্কে কাঁটা কম্পাসের ব্যবহার ও কাঁটা কম্পাসের সাহায্যে যে সরল রেখার খুব সূক্ষ্ম মাপ বার করা যায় তা তারা বুঝতে পারবে। তারপর চর্চার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট মাপের সরল রেখা আঁকতে বলা যেতে পারে। মাপ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের এমন একটা ধারণা হওয়া দরকার যেন তারা কোনও সরল রেখা দেখেই বলে দিতে পারে যে রেখাটির মাপ কাছাকাছি কত। চর্চার জন্য শুধু কতকগুলি রেখা আঁকতে না দিয়ে যদি কতকগুলি বাক্স, টেবিল, চেয়ার, ঘর ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস

ও জিনিসের ছবির মাপ নিতে বলা যায় তবে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে যে জ্যামিতিক শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে।

তার পরেই প্রশ্ন আসবে যে সরল রেখা ও বক্র রেখা সম্বন্ধে শেখার প্রয়োজনীয়তা কি? এর আগেই শিক্ষার্থীরা দেখেছে যে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের ছবি আঁকতে সরল রেখা, বক্র রেখা ইত্যাদির ব্যবহার লাগে। এবং সে সব আঁকতে দরকার হয় ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি। সেজন্য এখন তারা শিখবে কেমন করে সরল রেখা দিয়ে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি ঋজুরেখ ক্ষেত্র আঁকতে হয় এবং কেমন করে বক্র রেখা দিয়ে বৃত্ত প্রভৃতি আঁকতে হয়। এর আগে তাদের বুঝতে হবে জ্যামিতিতে ক্ষেত্র বা সমতল ক্ষেত্র কাকে বলে। যদি একটি বা ততোধিক রেখা একটি সমতলের কোনও অংশকে সীমাবদ্ধ করে তবে সেই সীমাবদ্ধ অংশকে সমতল ক্ষেত্র বলে। কোনও সমতল ক্ষেত্র যদি সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তবে সেই ক্ষেত্রকে ঋজুরেখ ক্ষেত্র বলে। এখন প্রশ্ন এই যে একটি ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করতে কয়টি রেখার প্রয়োজন হয়?



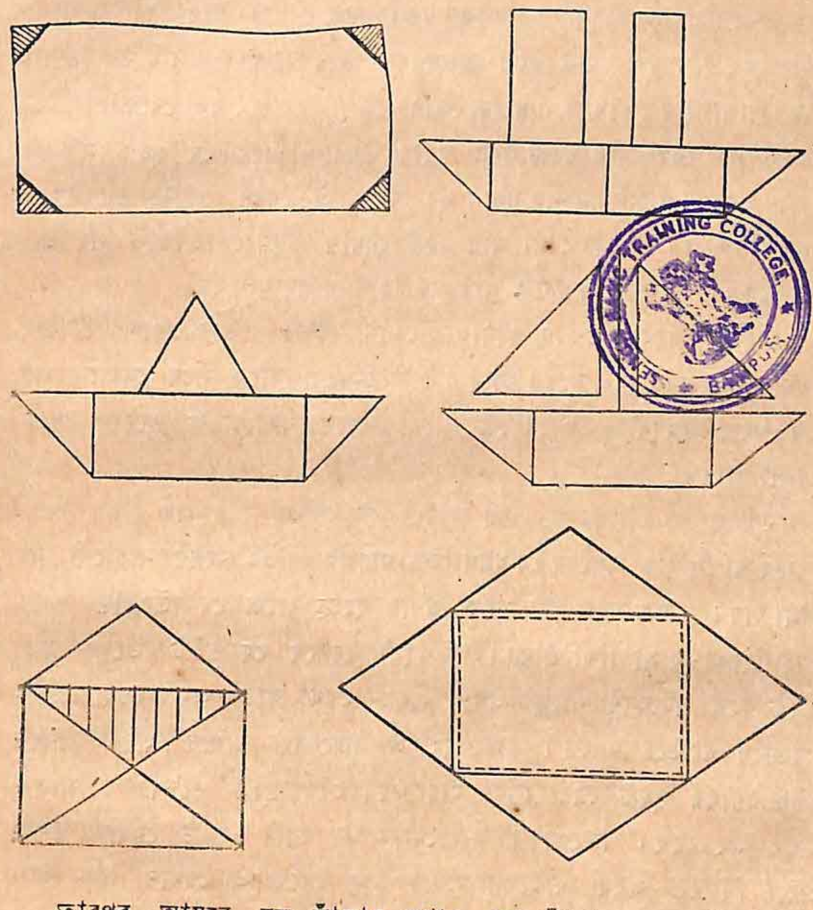




এখানে দেখা যায় যে একটি বক্র রেখা দিয়ে অনায়াসে একটি স্থান ঘিরে ফেলা যায় কিন্তু একটি সরল রেখা দিয়ে কোনও স্থান ঘেরা যায় না। তারপর দেখা গেল তুইটি সরল রেখা দিয়েও কোনও স্থান ঘেরা যায় না। যেভাবেই তুইটি সরল রেখা টানা যাক না কেন, তারা একটি স্থানকে ঘিরে ফেলতে পারে না। দেখা যায় একটি স্থান ঘিরতে হলে অন্ততঃ তিনটি সরল রেখার দরকার। যদিও অপরপক্ষে তিনটি সরলরেখা দিয়ে যে সব সময় একটি স্থান ঘিরে ফেলা যায় তা নয়। তিনটি সরল রেখা দ্বারা যে স্থান সীমাবদ্ধ হয় তা হয় তিনকোনা। মনে হয় একটি তিনকোনা জায়গাকে তিনটি বাহু বা ভুজ দিয়ে যেন ঘিরে রেখেছে আর সেই জন্যই এই তিনবাহু দ্বারা ঘেরা জায়গাকে ত্রিভুজ বলে। ত্রিভুজের এই ধারণা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসবে যে কিভাবে ত্রিভুজ আঁকা যায়। প্রথমে তুইটি রেখা এমনভাবে আঁকতে হবে যারা পরস্পরকে ছেদ করে তারপর একটি তৃতীয় রেখা আঁকতে হবে যা নাকি আগের তুইটি রেখাকেই ছেদ করে। এইভাবে আঁকলেই দেখা যায় যে একটি ত্রিভুজ পাওয়া যায়।

এর পরে আসবে চতুর্ভুজ আঁকবার কথা। শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারবে যে চারটি রেখা দিয়ে একটি ক্ষেত্রকে অনায়াসেই সীমাবদ্ধ করা যায় এবং চতুর্ভুজ কি করে আঁকা যায় তা-ও তাদের কাছে এখন সহজই মনে হবে।

কিন্তু এ পর্যন্ত যে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ আঁকা হয়েছে তার জন্য কোনও বিশেষ মাপ বা বিশেষ কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এখন চর্চা হিসাবে এমন কতকগুলি ছবি দেওয়া দরকার যা নাকি ব্যবহার্য ও পরিচিত জিনিসের ছবি হবে ও যার ভিতরে থাকবে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি। এরকম ছবির ভিতর দিয়ে চর্চা করলে তারা উৎসাহিত হবে ও জ্যামিতির ব্যবহারিক মূল্য বুঝবে।



তারপর আসবে বৃত্ত আঁকার কথা। বৃত্ত আঁকার সংস্পর্শে পেন্সিল কম্পাসের ব্যবহার শিক্ষার্থী বুঝবে। বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, চাপ ইত্যাদি আঁকতে শেখার পর বৃত্ত আঁকার চর্চার জন্য নানাবিধ ছবি যার ভিতর বৃত্ত রয়েছে আঁকতে দেওয়া যেতে পারে।

লম্ব—লম্ব প্রসঙ্গেই কতকগুলি উদাহরণ বার করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা লম্বের ব্যবহার দেখবে। তাতে তাদের ধারণা স্পষ্ট হবে ও বিষয়টিতে আগ্র বোধ করবে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ঘরের জানালার সিক। শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করবে যে সিকগুলি ফ্রেমের উপর ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া প্রত্যেক সিকের দুই পাশে দুইটি কোণের সৃষ্টি হয়েছে এবং কোণ দুইটি সব ক্ষেত্রেই পরস্পর সমান। এইরূপ একই সরল রেখার উপর অবস্থিত পাশাপাশি দুইটি কোণ সমান হলে তাদের সমকোণ বলে। জ্যামিতির ভাষায় এরূপ পাশাপাশি কোণকে সন্নিহিত কোণ বলে। সুতরাং বলা যেতে পারে-যে একটি সরল রেখা আর একটি সরল রেখার উপর দাঁড়ালে যে দুইটি সন্নিহিত কোণ হয় তারা যদি পরস্পর সমান হয় তবে ঐ কোণ দুইটির প্রত্যেককে সমকোণ বলে। একটি রেখা আর একটি রেখার উপর সোজাসুজি লম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেজন্য একটিকে আর একটির উপর লম্ব বলা হয়।

এইভাবে দরজার কোণ, জানালার কোণ, বইএর পাতার কোণ, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতির কোণ, ঘরের ছাদে যদি কড়ি-বরগা থাকে তবে সেখানে এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা লম্ব দেখতে পাবে ও লম্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে ধারণা পাবে।

তখনই শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন জাগবে যে কেমন করে লম্ব টানা যায়। শিক্ষক বা শিক্ষিকা বলবেন যে যন্ত্রপাতির বাক্সের বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে লম্ব টানা যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হচ্ছে বাক্সে যে ত্রিকোণী আছে সেই ত্রিকোণীর সাহায্যে আঁকা। শিক্ষার্থী দেখবে যে দুইটি ত্রিকোণীতেই একটি করে সমকোণ আছে অর্থাৎ একটি রেখা আর একটি রেখার উপর লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং ঐ ত্রিকোণী বসিয়ে যদি ঐ রেখা দুইটি বরাবর দুইটি রেখা টানা যায় তবে রেখা দুইটি পরস্পর পরস্পরের উপর লম্ব হবে। ত্রিকোণীর সাহায্যে নানা ভাবে একটি রেখার উপর একটি বিন্দুতে অথবা বাইরের একটি বিন্দু থেকে ঐ রেখার উপর লম্ব টানা যায়।

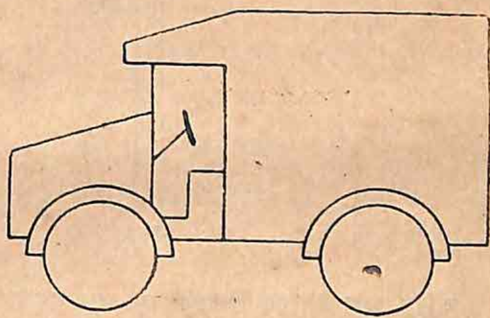
প্রথম সোপানে লম্ব আঁকা ত্রিকোণী দ্বারাই করা হবে, কম্পাসের ব্যবহার পরে করা হবে।

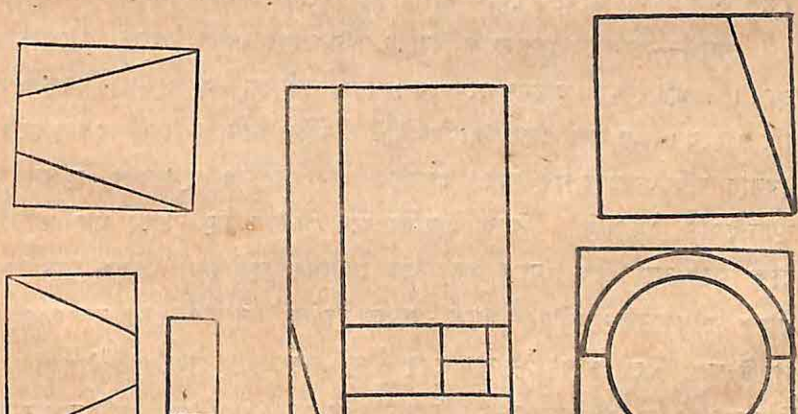
লম্ব আঁকা শেখা হলেই প্রশ্ন হবে যে লম্ব আঁকা শিখে কি হবে? তখনই

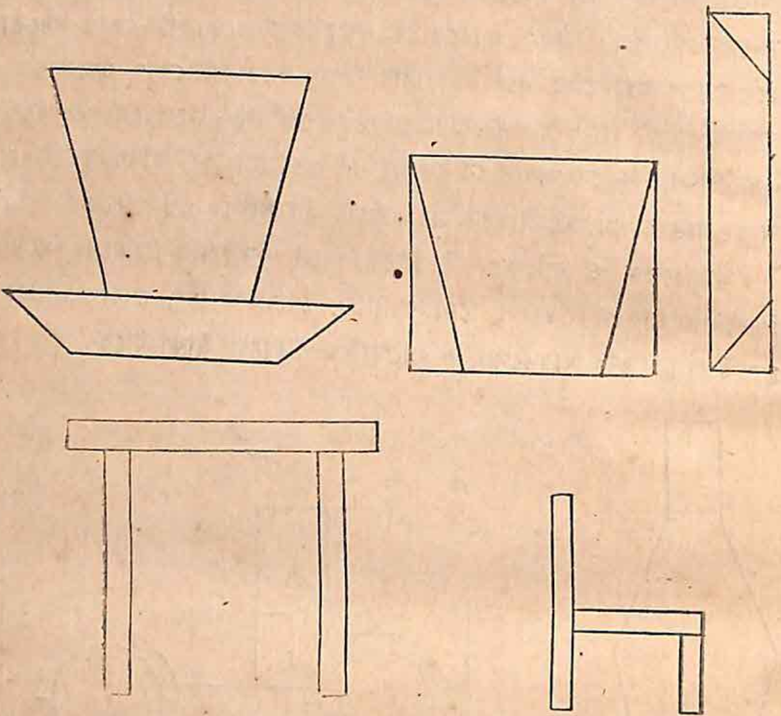
আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র ইত্যাদির প্রশ্ন আসবে। শিক্ষার্থীরা চতুর্ভুজের কথা আগেই জেনেছে। এখন জানবে যে চতুর্ভুজের প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ হলে তাকে আয়তক্ষেত্র বলে। আবার যখন প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ হয় আবার চারিটি বাহুও পরস্পর সমান হয় তখন সেই চতুর্ভুজকে বর্গক্ষেত্র বলে। এখন শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে যে লম্ব আঁকার প্রয়োজন হয়, কারণ যখনই সে আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্র আঁকতে যাবে.তখনই লম্ব আঁকার প্রশ্ন আসবে।

আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্র আঁকতে শিখলে কতকগুলি জিনিসের মডেল শিক্ষার্থীরা আঁকতে পারবে। মোটর গাড়ি, টেবিল ল্যাম্প, পেয়ালা, পিরিচ, গ্লাস ইত্যাদির ছবি আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের সাহায্যে আঁকা যাবে।









আয়তক্ষেত্র আঁকতে শিখলে স্কেল করে নক্‌শা শিক্ষার্থীরা আঁকতে পারবে। স্কেল করে আঁকা ভূগোলে দরকার হয়, জরিপের কাজে দরকার হয়। সুতরাং স্কেল করে নক্‌শা আঁকতে গেলে জ্যামিতির ব্যবহার বোঝা যাবে।

কোণ—সরল রেখা সংক্রান্ত বিষয়ের চর্চার পর কোণ সম্বন্ধে আলোচনা হবে। একটি রেখার ঘূর্ণনের ফলে যে কোণের সৃষ্টি হয় সে ধারণা শিক্ষার্থীকে দিতে হবে। এর জন্য প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঘড়ি। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে (দরকার হলে খেলার ঘড়ি ব্যবহার করা যায়) দেখানো যায় সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ, সরল কোণ ইত্যাদি। কিংবা একদিক ধরে কেউ যাচ্ছে—তখন যদি তাকে বাঁক ফিরে অন্য দিকে যেতে হয় তবে কোণের সৃষ্টি হয়। দরজা যখন বন্ধ থাকে চৌকাঠের সঙ্গে মিশে থাকে; দরজা খানিকটা খুললেই দেখা যায় দরজার ধারটি ঘুরে গিয়ে চৌকাঠের সঙ্গে কোণ তৈরি করে। আবার একটি বাঁশ পুঁতে দিয়ে তার ছায়া পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে ছায়া-নির্দেশক রেখাটি ঘুরে যায় ও এইভাবে পূর্বের ছায়া ও পরের ছায়ার ভিতরে কোণের সৃষ্টি হয়।

মাপবার সুবিধার জন্য একটি সমকোণকে ৯০টি সমান কোণে ভাগ করা হয় আর ঐ সমান কোণের প্রত্যেকটি কোণের মাপ ১° ডিগ্রী ধরা হয়। সেজন্য ১ সমকোণ=৯০° ডিগ্রী। একটি রেখা AB থেকে রওনা হয়ে একদিক ধরে গিয়ে আবার যদি সেই AB রেখায় ফিরে আসা যায় তবে মোট ৪ সমকোণ অর্থাৎ ৩৬০° ডিগ্রী ঘুরে আসতে হয়।

ঘূর্ণন দুইভাবে হতে পারে। যেমন ঘড়ির কাঁটা যেদিকে যায় সেদিকে ঘূর্ণনের ফলে হতে পারে আবার ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকেও ঘূর্ণনের ফলে কোণের সৃষ্টি হতে পারে।

তারপরেই প্রশ্ন আসবে যে এই কোণ কত ডিগ্রী হয়েছে তা মাপা যাবে কি করে? এই কোণ মাপবার জন্য জ্যামিতির যন্ত্রের বাক্সে যে কোণমান্ যন্ত্র বা চাঁদা রয়েছে তার ব্যবহার শিক্ষার্থী শিখবে।

এই কোণ সম্বন্ধে ধারণা দিতে হলে নানারূপ প্রশ্নের সমাধান শিক্ষার্থীদের করতে হবে। এই প্রশ্ন সংখ্যামূলক হতে পারে। যেমন বোর্ডে কোণ এঁকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে কত ডিগ্রীর কোণ। অথবা ৩টার সময়, ৫টার সময় বা ৯টার সময় ঘড়ির কাঁটা দুইটির ভিতর কত ডিগ্রীর কোণ হয়। কিংবা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—১৫ মিনিট, ২০ মিনিট বা ৩০ মিনিটে ঘড়ির কাঁটা কত ডিগ্রী কোণের উপর দিয়ে যায়।

তারপর সন্নিহিত কোণ, দুই বা ততোধিক কোণের যোগফল ইত্যাদি নিয়ে কিছু চর্চা করা যায়।

সরল কোণ, সম্পূরক কোণ, পূরক কোণ ইত্যাদিও এর পর আনা যায়। কয়েকটি কোণ একত্রে যুক্ত এরূপ চিত্র এঁকে এবং তার দু-একটি কোণের মাপ দিয়ে বাকী কোণগুলির মাপ বার করতে বলা যেতে পারে।

ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ ইত্যাদি এঁকে তাদের কোণগুলি মেপে যোগ করতে বলা যেতে পারে। তার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা জ্যামিতিক তথ্য আবিষ্কার করে চমৎকৃত হবে। তারপর নানা মাপের কোণ তাদের আঁকতে বলা যেতে পারে। নানা মাপের কোণ আঁকা ও মাপার ভিতর দিয়ে কোণের চর্চা চলতে পারে। তারপর ত্রিভুজ আঁকবার চেষ্টা করা যেতে পারে। একটি বা দুইটি দেওয়া কোণ থাকতে পারে ও সেই মাপ অনুসারে ত্রিভুজ আঁকতে পারে। ত্রিভুজ আঁকতে গিয়ে দেখবে যে ত্রিভুজের তিনটি

কোণ ও তিনটি বাহু থাকে এবং কোণ হিসাবে ও বাহু হিসাবে ত্রিভুজের শ্রেণী-বিভাগ করা যেতে পারে।

কোণ মাপতে শেখায় এখন শিক্ষার্থীরা দুইটি সন্নিহিত কোণের যোগফল যে দুই সমকোণের সমান তা পরীক্ষা করে দেখতে পারবে। তা ছাড়া বিপ্রতীপ কোণ যে সমান হয় তা-ও তারা মেপে অভিজ্ঞতা থেকে বার করবে।

এর পরে সমান্তরাল রেখা সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। এর জন্য তার পরিবেশের বিষয়বস্তু থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে। যেমন অনেক কাঠের গেট থাকে যেখানে গেটের দরজার সমান্তরাল ভাবে সাজানো কাঠের তক্তা থাকে। জানালায় যে লোহার সিক থাকে তা সমান্তরাল। রুল করা খাতার রেখাগুলি সমান্তরাল। মইএর বাঁধা বাঁশ সমান্তরাল। টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি নানা আসবাবপত্রে, ঘর, দরজা, জানালা ইত্যাদি পরিবেশে সমান্তরাল রেখা দেখা যায়।

সমান্তরাল রেখা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়ার পরই প্রশ্ন উঠবে—কি করে সমান্তরাল রেখা আঁকা যায়। জ্যামিতির যন্ত্রপাতির বাক্সে যে ত্রিকোণী রয়েছে তার সাহায্যে ও মাপনীর সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সমান্তরাল রেখা আঁকতে পারবে।

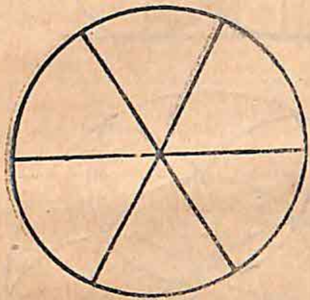
তারপর একখানা লাইন টানা খাতার পৃষ্ঠা নিয়ে কয়েকটি রেখার ভিতর দিয়ে একটি হেলানো রেখা টানলে শিক্ষার্থী জানবে যে ঐ রেখাটিকে ভেদক বলা হয়। এইভাবে বহিঃকোণ, অন্তঃকোণ, একান্তর কোণ, বিপরীত অন্তঃকোণ, অনুরূপ কোণ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

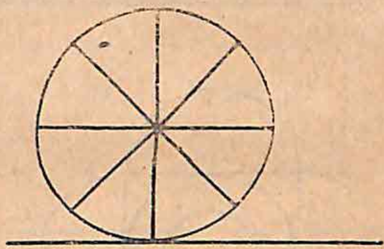
এখন নানাভাবে সমান্তরাল রেখা এঁকে কোণগুলি মেপে শিক্ষার্থীরা আবিষ্কার করবে যে একান্তর কোণ সমান হয়। বহিঃকোণ বিপরীত অন্তঃকোণের সমান হয় অর্থাৎ অনুরূপ কোণ সমান হয় এবং একই পার্শ্বস্থ অন্তঃকোণ দুইটির যোগফল দুই সমকোণের সমান হয়।

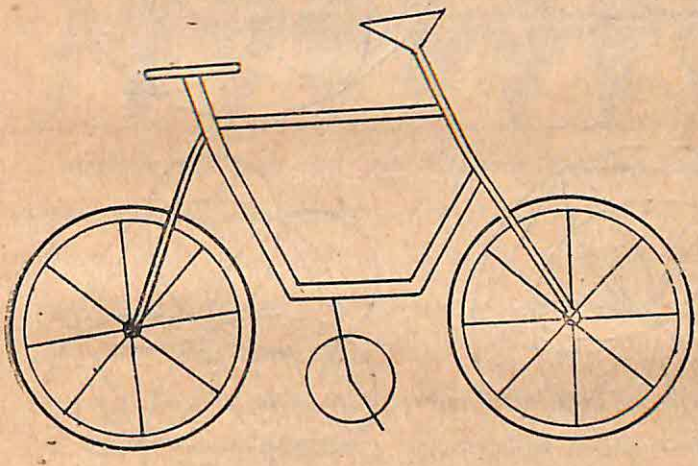
সমান্তরাল রেখা আঁকতে শিখে এখন সামান্তরিক আঁকতে পারবে।

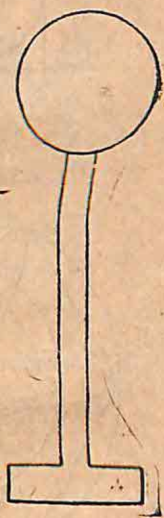
তারপর প্রশ্ন আসবে একটি কোণকে ও একটি সরল রেখাকে কিভাবে দ্বিখণ্ডিত করা যায়। চাঁদার সাহায্যে কোণ দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে। সরল রেখা দ্বিখণ্ডিত করতে মাপনী ব্যবহার করতে পারে এবং কম্পাসও ব্যবহার করতে পারে।

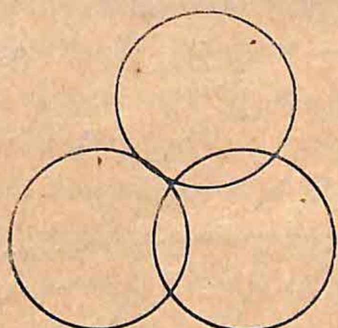
এইসব শেখার পর জ্যামিতি প্রয়োগস্বরূপ শিক্ষার্থীকে কতকগুলি নক্শা আঁকতে বলা যেতে পারে। প্রথমে সহজ নক্শা দিয়ে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে একটু কঠিন ও জটিলতর নক্শা আঁকতে চেষ্টা করবে।

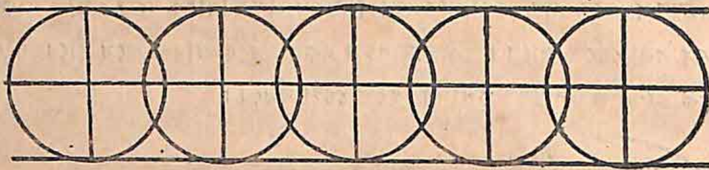


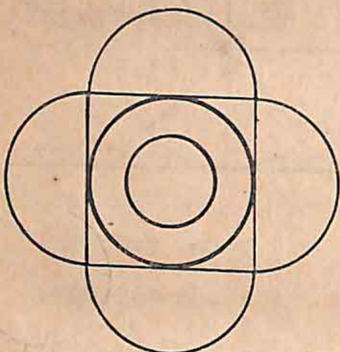


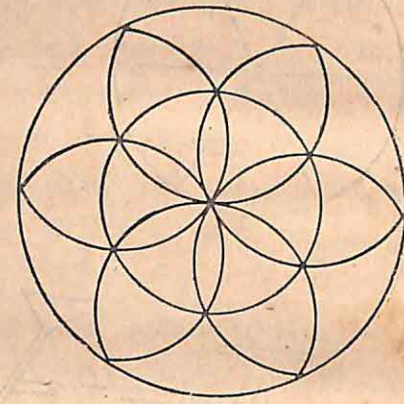


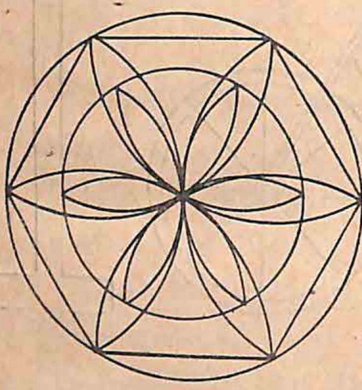


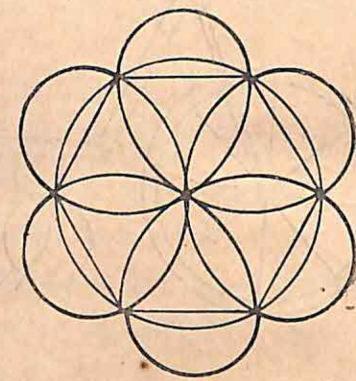


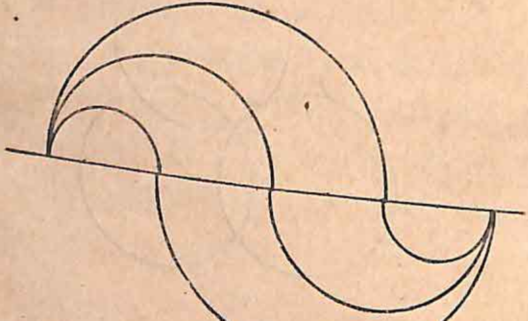


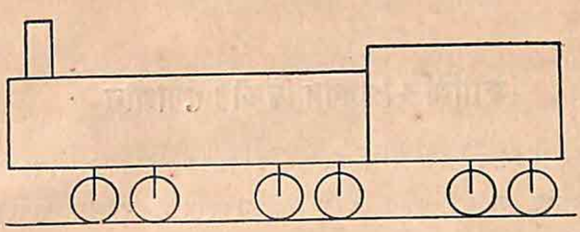


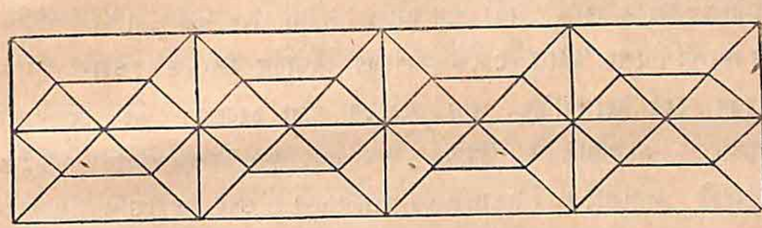


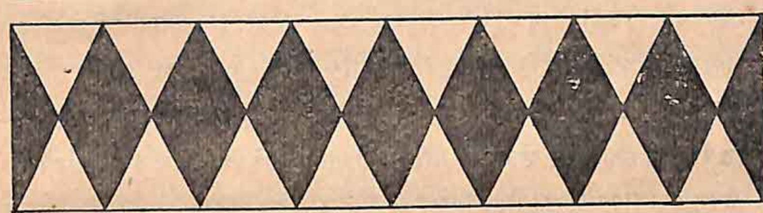












জ্যামিতি-শিক্ষার প্রথম সোপানে জ্যামিতিক শব্দগুলির সংজ্ঞাই বিশেষ ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা দরকার। পূর্বে অন্যের লিখিত কতকগুলি সংজ্ঞা মুখস্থ করতে হোতো। এইখানে যে পদ্ধতি আলোচিত হোলো তাতে বোঝা যায় যে নিজের হাতে পরীক্ষা করে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থী এইসব সূত্র নিজেই তৈরি করবে।

জ্যামিতি-শিক্ষার প্রথম সোপানে জ্যামিতিক তথ্য সব বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে শেখানো দরকার। তার জন্য চাই মানচিত্র, মডেল, নানাবিধ মাপ ইত্যাদি। ধীরে ধীরে জ্যামিতির সঙ্গে কিছু পরিচয় হলে জ্যামিতিক চিত্রগুলির ভিতর শিক্ষার্থীরা সৌন্দর্যের আভাস পায় এবং তার জন্য ঐ চিত্রগুলিতে চিত্র হিসাবেই আগ্রহ বোধ করে। এর উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে বৃত্তের কোণ সম্বন্ধীয় ধর্মগুলি।

এইজন্য এই বিষয়টির প্রথম উপস্থাপন হাতে-কলমে কাজের ভিতর দিয়ে করা বাঞ্ছনীয়। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বিমূর্ত চিত্রগুলিতে যাবে। হঠাৎ যে এ পরিবর্তন আসবে তা নয়। কাজেই হাতে-কলমে কাজ সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন চলা ভাল।

জ্যামিতি-শিক্ষার দ্বিতীয় সোপান

আগেই বলা হয়েছে যে জ্যামিতির ইতিহাসের আরম্ভে দেখা যায় স্বজ্ঞা অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান (intuition)-এর ব্যবহার। স্বজ্ঞার ব্যবহারের পর জ্যামিতির উন্নতি হয় আরোহী প্রণালীতে (inductive method)। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্যামিতির তথ্য আহরণ করা হয়েছে। এই আরোহী প্রণালীতে কতকগুলি জ্যামিতিক তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইউক্লিড অবরোহী প্রণালীতে (deductive method) সেই তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং স্বজ্ঞার প্রয়োগ ও আরোহী প্রণালীকে বাদ দিয়ে যদি অবরোহী প্রণালীতেই প্রথমে শিক্ষার্থীকে জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তবে সে চেষ্টা সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা কম। সুতরাং জ্যামিতি-শিক্ষার দ্বিতীয় সোপানে স্বজ্ঞা ও আরোহী প্রণালীরই অনুসরণ করা শ্রেয়।

প্রথম সোপানে শিক্ষার্থীরা বিন্দু, রেখা ইত্যাদির ধারণা পেয়েছে। ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি আঁকতে শিখেছে। এখন এইসব ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদির কোণ, বাহু প্রভৃতির বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে জানতে হবে।

প্রথমেই ত্রিভুজ নিয়ে আরম্ভ করা ভাল। কারণ ত্রিভুজের সাহায্যে অনেক কাজ করা যায়। কোনও নগরের বা গ্রামের নক্শা আঁকতে হলে ত্রিভুজের সাহায্যে সহজে পারা যায়। একটি বাড়ী বা উঁচু পাহাড়ের উচ্চতা মাপতে কিংবা নদীর একধারে দাঁড়িয়ে নদী কতটা চওড়া তা বার করতে গেলে ত্রিভুজের সাহায্যেই পারা যায়। এরকম অনেক সমস্যাই ত্রিভুজ দ্বারা সমাধান করা যায়।

যে-কোনও ঋজুরেখ ক্ষেত্র কয়েকটি ত্রিভুজে ভাগ করা যায়। সুতরাং ত্রিভুজের বাহু, কোণ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা থাকলে যে-কোনও ঋজুরেখ ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়।

প্রথমে সমকোণী ত্রিভুজের কোণের যোগফল বার করা সহজ হয়। কারণ একটি কোণ সমকোণ হলে আর দুইটি কোণ মেপে যোগ করে দেখা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা দেখবে সমকোণটি ছাড়া আর দুইটি কোণের যোগফল ৯০° হয়। সুতরাং একটি সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০°

হয়। এই সিদ্ধান্তে আসতে হলে কেবল একটি ত্রিভুজের কোণ মাপলেই চলবে না। নানাভাবে সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে তবে বিভিন্ন ত্রিভুজের কোণ মাপতে হবে। তারপর শিক্ষার্থীদের নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। যেমন একটি কোণ ৯০° ও আর একটি কোণের মাপ ৪০°; তৃতীয় কোণটির মাপ কত? এরকম অনেক প্রশ্নের উত্তর বার করলে তখন শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে যে একটি সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান।

তারপর দেখতে হবে যে যেসব ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ নয় সেইসব ত্রিভুজের কোণ তিনটি যোগ করলে যোগফল কত হয়। সুতরাং তখন কতকগুলি ত্রিভুজ আঁকতে হবে যার একটি কোণও সমকোণ নয়। তারপর প্রত্যেকটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ মেপে যোগ করতে হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যোগ করে শিক্ষার্থীরা দেখবে যোগফল ১৮০° হয়। পরে নানাবিধ প্রশ্নের ভিতর দিয়ে এ ধারণা সুদৃঢ় করতে হবে। যেমন একটি সমকোণী ত্রিভুজে কি কোনও স্থূলকোণ থাকতে পারে? অথবা একটি ত্রিভুজে কয়টি সমকোণ থাকতে পারে ইত্যাদি। পরে ত্রিভুজের কয়েকটি চিত্র এঁকে তাদের কয়েকটি কোণের মাপ দিয়ে অজানা কোণগুলির মাপ বার করতে বলা হবে। এইভাবে আরোহী প্রণালী ও স্বজ্ঞার প্রয়োগ করে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সম্পর্কে যথেষ্ট চর্চা করা যেতে পারে।

এইভাবে পরীক্ষামূলক কাজের ভিতর দিয়েই অর্থাৎ নানা প্রকার মাপের ভিতর দিয়েই শিক্ষার্থীরা ত্রিভুজের বহিঃকোণ ও বিপরীত অন্তঃস্থ কোণের ভিতর সম্বন্ধ বুঝতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কতকগুলি ত্রিভুজ এঁকে ও তাদের বিভিন্ন বাহুগুলি বর্ধিত করে ও মেপে তারা একটি তালিকা তৈরি করবে। যেমন—

বহিঃকোণ	বিপরীত অন্তঃকোণ (১)	বিপরীত অন্তঃকোণ (২)	বিপরীত অন্তঃকোণ। (১+২)

এইভাবে অনেকগুলি ক্ষেত্রে মেপে ও তালিকায় বসিয়ে তারা দেখবে যে বহিঃস্থ কোণ বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ দুইটির যোগফলের সমান হয়। তবে এই কথা মনে রাখতে হবে যে একটি কি দুইটি ত্রিভুজের বাহু বর্ধিত করলেই চলবে না,—যথেষ্ট সংখ্যক ত্রিভুজ মেপে তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

এইরূপে পরীক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা আরও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে একটি ত্রিভুজের একটি বাহু বর্ধিত করলে বহিঃস্থ কোণ যে-কোনও অন্তঃকোণ থেকে বড় হবে।

এর পরে আসবে একটি চতুর্ভুজের কোণগুলির যোগফলের কথা। একটি ত্রিভুজের কোণের যোগফল যখন শিক্ষার্থীরা জানে তখন একটি চতুর্ভুজের কোণের যোগফল বার করতে আর অসুবিধা হবে না। কারণ একটি চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত কৌণিক বিন্দু যোগ করলে চতুর্ভুজটি দুইটি ত্রিভুজে বিভক্ত হয়। এখন নানা রকম চতুর্ভুজ আঁকতে হবে ও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মেপে দেখতে হবে চতুর্ভুজের অন্তঃকোণগুলির যোগফল কত। এইভাবে পঞ্চভুজের কোণের সমষ্টিও বার করা যায়। পঞ্চভুজের পর ষড়ভুজ, সপ্তভুজ, অষ্টভুজ ইত্যাদি এঁকেও শিক্ষার্থীরা দেখতে পারে যে অন্তঃস্থ কোণগুলি কত সমকোণের সমান।

তারপর শিক্ষার্থীরা হিসাব করে দেখবে যে একটি

ত্রিভুজের	বাহুসংখ্যা	৩,	কোণের সমষ্টি	২	সমকোণ	=২ × ৩ − ৪
চতুর্ভুজের	”	৪,	”	৪	”	=২ × ৪ − ৪
পঞ্চভুজের	”	৫,	”	৬	”	=২ × ৫ − ৪
ষড়ভুজের	”	৬,	”	৮	”	=২ × ৬ − ৪
সপ্তভুজের	”	৭,	”	১০	”	=২ × ৭ − ৪
অষ্টভুজের	”	৮,	”	১২	”	=২ × ৮ − ৪

এই সব উদাহরণ থেকে তারা এই সিদ্ধান্তে আসবে যে n বাহুবিশিষ্ট ঋজুরেখ ক্ষেত্রের অন্তঃকোণগুলি = ২ × n − ৪ = ২n − ৪ সমকোণ। তারপর এই অন্তঃকোণের সমষ্টি সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্নের সমাধান করতে দিতে হবে।

ত্রিভুজের কোণ সম্বন্ধে জানা হলে কোণ ও বাহুর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা—সে বিষয়ে শিক্ষার্থী পরীক্ষা করবে।

ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু, সমবাহু ও বিষমবাহু হতে পারে। প্রথমে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এঁকে সমান বাহু দুইটির বিপরীত দিকের কোণ দুইটি মেপে শিক্ষার্থীরা দেখবে যে এই কোণ দুইটি সব সময় সমান হয়। আবার এও দেখবে যে একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ সমান আঁকা হলে, ঐ সমান কোণ দুইটির বিপরীত বাহু দুইটিও সমান হয়।

যেখানে ত্রিভুজের বাহুগুলি পরস্পর সমান ন অর্থাৎ বিষম বাহু, সেখানে দেখা যাবে বড় থেকে ছোট অনুসারে কোণগুলি লিখে গেলে ও প্রত্যেকটি কোণের বিপরীত বাহু মেপে যদি পাশে পাশে লে যায় তবে প্রত্যেক ত্রিভুজেই সবচেয়ে বড় কোণের বিপরীত বাহু সবচেয়ে বড়, তার পরের কোণের বিপরীত দিকে ত্রিভুজের দ্বিতীয় বড় বাহু, আর সবচেয়ে ছোট কোণের বিপরীত দিকে সবচেয়ে ছোট বাহু। অর্থাৎ কোনও ত্রিভুজের একটি কোণ অপর একটি কোণ থেকে বৃহত্তর হলে বৃহত্তর কোণটির বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর কোণটির বিপরীত বাহু থেকে বৃহত্তর হয়।

এর পরে ত্রিভুজের বাহু ও কোণ সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্নের সমাধান শিক্ষার্থীদের করতে দিতে হবে। প্রশ্নগুলি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যে বাস্তব ক্ষেত্রে যে এই তথ্যগুলির প্রয়োজন হয় তা যেন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে।

কোনও বিন্দু থেকে কোনও রেখার ক্ষুদ্রতম দূরত্ব মাপতে হলে কিভাবে মাপা যায়, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রেও উদাহরণগুলি বাস্তব ক্ষেত্র থেকে নেওয়া দরকার। যেমন কেউ গাড়ি করে যাচ্ছে, দূরে তার বন্ধুর বাড়ী দেখা যায়, সোজা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কোন্ সময় সে বাড়ীর সবচেয়ে কাছে থাকবে? রাস্তার এ পাশের একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে অন্য পাশে যেতে হবে; কোন্ পথ দিয়ে গেলে পথ সবচেয়ে ছোট হবে? রাস্তার একদিকে দূরে একটি মন্দির আছে—সেই মন্দির থেকে রাস্তায় এসে পড়তে হলে কোন্ পথ গিয়ে এলে সবচেয়ে কম সময় লাগবে? একটি বিন্দু থেকে একটি রেখা পর্যন্ত অনেকগুলি রেখা টানা হোলো। তারপর একটি সুতোর একপ্রান্ত বিন্দুটির উপর রেখে সুতোটি দিয়ে বিভিন্ন রেখাগুলি মাপতে হোলো। সব রেখা কি একই মাপের সুতো দিয়ে মাপা যাবে? সবচেয়ে ছোট সুতো কোন্ রেখাটি মাপতে দরকার হবে? এই রকম নানাবিধ প্রশ্নের সমাধানের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থী ধারণা পাবে যে কোনও সরল রেখার বহিঃস্থ কোনও বিন্দু থেকে একটি রেখা পর্যন্ত যত সরল রেখা টানা যায় তাদের মধ্যে লম্বই সর্বাপেক্ষা ছোট। পরে নানাবিধ প্রশ্নের সমাধানের ভিতর দিয়ে এ বিষয়ে তারা চর্চা করবে।

তারপর আসবে ত্রিভুজের দুই বাহুর যোগফলের কথা। নানা বাস্তব

সমস্যা সমাধানের ভিতর দিয়ে ত্রিভুজের দুই বাহুর যোগফল যে তৃতীয় বাহু থেকে বড় হয় সে ধারণা শিক্ষার্থীরা পাবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে একটি ছাত্র ও তার বন্ধুরা তার বাড়ী A থেকে তাদের স্কুল Bতে যেতে চায়। সে সোজা A থেকে Bতে একটি সরল রেখায় চলে গেল। কিন্তু সে রাস্তা ভাল ছিল না বলে তার এক বন্ধু ঘুরে C বিন্দু হয়ে Eতে গেল। আবার আর এক বন্ধু অন্য দিক দিয়ে P বিন্দু হয়ে Bতে গেল। আবার তৃতীয় বন্ধু D বিন্দু হয়ে Bতে গেল। এখন শিক্ষার্থীরা মেপে দেখবে—AC+CB, AD+DB, AP+PB, এই যোগফলগুলি বড় কিংবা AB বড়।

তারপর আসে ত্রিভুজ অঙ্কনের কথা। এমন কতকগুলি উদাহরণ দিতে হবে যেখানে শিক্ষার্থী দেখবে যে ত্রিভুজ অঙ্কন সমস্যাটির বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার ও প্রয়োগ আছে।

ত্রিভুজের সর্বসমতা প্রমাণ করতে এ পর্যন্ত উপরিপাতন পদ্ধতি (Superposition) অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই উপরিপাতনে অনেকের আপত্তি আছে। তাঁদের মতে উপরিপাতন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়। তাঁরা বলেন, জ্যামিতির কাজ হচ্ছে শূন্য স্থান নিয়ে। সমতার সংজ্ঞার জন্য এবং অচল স্থানের ধর্ম সম্বন্ধে জানবার জন্য যদি কোনও বস্তুকে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নড়াতে হয়, তবে এ খুবই অদ্ভুত সন্দেহ নেই। যদি বলা হয় যে দুইটি বস্তু তখনই সমান হবে যখন একটিকে আর একটির উপর এমনভাবে ফেলা যায়, অর্থাৎ উপরিপাতন করা যায় যাতে বস্তুটিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেবার দরুন কোনওরূপ অঙ্গহানি হবে না তাতে দেখা যায়, যা প্রমাণ করতে হবে, তা-ই ধরে নেওয়া হচ্ছে। কারণ বস্তুর কাঠিন্য (rigidity) অর্থই হচ্ছে যে বস্তুটি যে স্থান অধিকার করে থাকে সব সময় সেই একই মাপের স্থান অধিকার করে থাকে। সুতরাং উপরিপাতনের সাহায্যে যদি সমতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয় তবে বোঝা যাবে যে একটি গোলকধাঁধার চাকায় ঘোরা হচ্ছে, অর্থাৎ যা প্রমাণ করতে হবে তা-ই সত্য বলে ধরে নিয়ে প্রমাণের চেষ্টা চলছে।

স্থান সম্বন্ধে বিমূর্ত ধারণা এবং যেসব বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে এই ধারণা করা হয় এই দুইএর ভিতরের যে সম্পর্ক সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের বিভিন্ন

মত দেখা যায়। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার জন্য এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ত্রিভুজের সর্বসমতার যে নীতি, যার ভিতর রয়েছে স্থানের সমরূপতার ইঙ্গিত, তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। এদের ধর্মের থেকে কোনও সিদ্ধান্তে আসার প্রশ্ন এখানে ওঠে না। যুক্তির দিক থেকে বলা যেতে পারে যে এ সত্যি বলে ধরে নেওয়া জিনিস। সুতরাং যা প্রমাণ করা যায় না তা প্রমাণ করার চেষ্টায় অযথা শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে তুলতে হবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল এক জায়গায় বলেছেন যে 'দুইটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু ও তাদের অন্তর্বর্তী কোণ সমান হলে ত্রিভুজ দুইটি যে সর্বসম হয়' এই উপপাদ্যটি একেবারে অবান্তর বাজে জিনিস।' তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন যে উপরিপাতনের জন্য আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয় গতি তা হচ্ছে ভ্রান্তিজনক। জ্যামিতিতে যাকে আমরা গতি বলি—তা হচ্ছে যে আমাদের দৃষ্টি আমরা এক চিত্র থেকে আর এক চিত্রের দিকে স্থানান্তরিত করি। যে উপরিপাতন ইউক্লিড ব্যবহার করেছেন তার কোনও প্রয়োজনই নেই।

উপরিপাতনের পরিবর্তে শিক্ষার্থী নির্দেশ অনুসারে চিত্র আঁকবে। সে দেখবে যে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া থাকলে তা থেকে সে এমন চিত্র অঙ্কন করতে পারে যা দ্ব্যর্থবোধক হবে না। তা ছাড়া সেই নির্দেশ নিয়ে সেরকম চিত্র কাগজের যে-কোনও জায়গায় আঁকা যাবে। সেই একই নির্দেশ নিয়ে কাগজে যেখানে যে চিত্র আঁকবে সেই সব চিত্রই এক হবে।

ত্রিভুজের সর্বসমতার এই ধারণা নিয়েই শিক্ষার্থীরা আরম্ভ করবে। নির্দেশ অনুযায়ী চিত্র আঁকলে শুধু যে চিত্রগুলি এক হবে তা নয়—এই চিত্রগুলিতে আভ্যন্তরীণ কোনও পার্থক্যও থাকে না।

সুতরাং ইউক্লিড যে উপপাদ্য উপরিপাতন দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন সে উপপাদ্য একই রকম সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যদি উপপাদ্যটি এমন ভাবে পুনরুক্তি করা যায় যে একটি বিশেষ নির্দেশ অনুসারে চিত্রটি আঁকতে হবে। কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া থাকবে আর সেই নির্দেশ অনুসারে চিত্র আঁকবে। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুজের সর্বসমতার যেসব ধর্ম তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিমূর্ত চিত্রের ভিতর দিয়ে এই সর্বসমতার ধারণা দেওয়া যেতে পারে, আবার কতকগুলি বাস্তব ও মূর্ত উদাহরণের ভিতর দিয়েও এর প্রয়োগ দেখানো যেতে পারে। যেমন একটি ঘড়ির বড় কাঁটা ২'২" লম্বা ও ছোট কাঁটা

১.৬'' লম্বা। কাঁটা দুইটির অন্তর্ভূত কোণ যখন ৮০° তখন কাঁটা দুইটির অগ্রভাগ একটির থেকে আর একটি কত দূরে? অথবা একটি সাইকেলের চাকায় যে লোহার সিক আছে তার দৈর্ঘ্য ২ ফুট। চাকায় সবশুদ্ধ ১৫টি সিক আছে। পাশাপাশি দুইটি সিকের শেষ বিন্দুর দূরত্ব বার করতে হবে। অথবা একটি খামের নমুনায় অনেকগুলি খাম তৈরি করতে হবে। খামটি খোলা হোলো ও ভিতরের আয়তক্ষেত্রটির বাহুগুলির মাপ, সেই বাহুসংলগ্ন ত্রিভুজের প্রত্যেকটির আয়তক্ষেত্রের বাহুসংলগ্ন দুইটি কোণের মাপ পেলে ঐ নমুনার খাম সহজেই করা যায়। যারা একেবারেই বিমূর্ত চিত্র নিয়ে কাজ করতে পারে তারা তা-ই করতে পারে কিন্তু যারা তা সহজে বোঝে না বা তাতে উৎসাহ বোধ করে না তাদের জন্য মূর্ত বা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে চর্চা করাই ভাল।

জ্যামিতি-শিক্ষার তৃতীয় সোপান

জ্যামিতি-শিক্ষার দ্বিতীয় সোপানে কতকগুলি জ্যামিতিক তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয় কিন্তু তৃতীয় সোপানে একটি যৌক্তিক ধারাবাহিকতা রেখে সেইগুলিকে একত্র করা হয়। কিছু কিছু যৌক্তিক ধারাবাহিকতার জ্ঞান ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। কয়েকটি উপপাদ্যকে একত্র একটি দলভূত করে তার মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ উপপাদ্যটি যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় বা সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহজনক তা নয়। কিন্তু এই উপপাদ্যটি জানলে অন্যান্য উপপাদ্যের প্রমাণে সাহায্য পাওয়া যায়। এই উপপাদ্যটির উপর জোর দিলে শিক্ষার্থীরা যুক্তির ধারা বুঝতে পারে। আবার বিপরীত প্রতিজ্ঞাগুলির ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার ফলেও যুক্তির ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিপরীত প্রতিজ্ঞাগুলির ধর্ম পরে পরে কয়েকটি পাঠের ভিতর দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যুক্তির ধারার দিক দিয়ে দুটি জিনিস শেখানো যেতে পারে—এক হচ্ছে সমস্ত বিপরীত প্রতিজ্ঞাই সত্য নয়। দ্বিতীয়তঃ ক যে সত্য তা প্রমাণ করতে গেলে যদি খ'র সত্যতা ধরে নিতে হয় তবে খ'র সত্যতা প্রমাণ করতে গেলে যে ক'র সত্যতা ধরে নিতে হবে তার কিছু মানে নেই। এইভাবে অগ্রসর হলে যুক্তির ধারা তাদের কিছু কিছু বোধগম্য হয়।

তৃতীয় সোপানের আরম্ভেই আবার জ্যামিতির উপপাদ্যগুলিকে দলভূত করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আসল উপপাদ্যটি জানলে কেমন করে অন্যান্য উপপাদ্যগুলি তার থেকে বার করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এর পর শিক্ষার্থী লক্ষ্য করবে যে যে-কোনও উপপাদ্যের গোড়াতেই দেখা যাবে সমান্তরাল রেখার ধর্ম অথবা ত্রিভুজের সর্বসমতার ধর্ম বিদ্যমান।

পূর্বের সোপানে কতকগুলি উপপাদ্যের প্রমাণ হয় নাই। এখন সেইগুলি প্রমাণের চেষ্টা হবে। এইভাবে সমস্ত জ্যামিতি বিষয়টির ভিতর ধারাবাহিক যুক্তির ধারা আনতে হবে।

সমস্ত বিষয়টির যুক্তির ধারা এখন এই রকম হবে—যদি ক সত্য হয় তবে খ'র সত্যতা প্রমাণ করা যাবে, যদি গ সত্য হয় তবে ক'র সত্যতা প্রমাণ করা যাবে, যদি ঘ সত্য হয় তবে গ'র সত্যতা প্রমাণ করা যাবে। এইভাবে চলতে চলতে দেখা যাবে যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত উপপাদ্যেরই মূলে রয়েছে সমান্তরাল রেখার ধর্ম ও ত্রিভুজের সর্বসমতা।

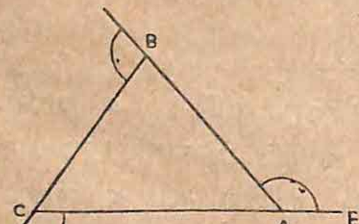
তারপর প্রশ্ন আসবে যে সমান্তরাল সরল রেখার ধর্ম ও ত্রিভুজের সর্বসমতা এই সব প্রমাণ কি করে করা যায়। তখনই উত্তর হবে যে আমরা যদি কতকগুলি তথ্য সত্য বলে ধরে নিই তবেই তার উপর ভিত্তি করে এই প্রমাণ পাওয়া যাবে। এইভাবে শিক্ষার্থীরা স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধে ধারণা পাবে। তারা দেখবে যে শেষ পর্যন্ত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করতে হয়। এখন কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিতে হবে, তা ঠিক করতে হবে। এ সম্বন্ধে কেউ বলবেন—সমান্তরালের দুইটি উপপাদ্য ও সর্বসম ত্রিভুজের তিনটি ধর্মই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া যাক্; কিন্তু আবার একদল বলেন যে সমান্তরালের একটি উপপাদ্য ও সর্বসম ত্রিভুজের দুইটি উপপাদ্য স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া যাক্। যাই হোক, শিক্ষার্থী এটা বুঝবে যে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিতে হবে।

এই দলের জ্যামিতিকদের 'নন্-ইউক্লিডিয়ান' জ্যামিতিক বলা হয় এবং এঁদের লিখিত জ্যামিতিই হচ্ছে নন্-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি। এই জ্যামিতি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে এ হচ্ছে জ্যামিতি সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম ধরনের কথাবার্তা। এ আলোচনা সাধারণের বোধগম্য নয়। এ একপ্রকার যৌক্তিক অনুসন্ধিৎসা বলা চলে। সত্যিকার গণিত হিসাবে এর বিশেষ

কোনও মূল্যই নেই। অবশ্য বাস্তব জগতের জ্ঞানের বিষয় ভাবতে গেলে এই উক্তি সত্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অপর দিকে এইভাবে বিষয়টিকে নাড়াচাড়া করায় কতকগুলি উপকার হয়েছে তা ঠিক। ইউক্লিডের স্বীকার্য যে—দুইটি পরস্পর ছেদকারী সরল রেখা একটি সরল রেখার সঙ্গে উভয়েই সমান্তরাল হতে পারে না। এখন স্থির নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে এই স্বীকার্যটির উৎপত্তি অন্য কোনও স্বতঃসিদ্ধ থেকে নয়। দ্বিতীয়তঃ জ্যামিতির ভিত্তি বিশেষ করে স্বতঃসিদ্ধগুলির রূপ অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইউক্লিড যখন তাঁর বিবৃতিটিকে স্বতঃসিদ্ধ না বলে স্বীকার্য (postulate) আখ্যা দিয়েছেন তখনই বোঝা যায় যে এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনেও খুব প্রত্যয় ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর গণিতজ্ঞরা আবিষ্কার করলেন যে যুক্তির দিক দিয়ে এরকম একটি স্বীকার্য ধরে নেওয়ার কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এই স্বীকার্যটিকে বাদ দিয়েও যুক্তিযুক্ত ভাবে জ্যামিতি তৈরি করা যায়। এই মতবাদীদেরই নন্-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিক বলা হয়। কিন্তু যে বাস্তব পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেখানে ইউক্লিডের স্বীকার্য বেশ মেনে নেওয়া যায়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ইউক্লিডের জ্যামিতিতে বেশ কাজ চলে। সেজন্য বিদ্যালয়েও ইউক্লিডের জ্যামিতি বেশ চলবে। নানা প্রকার অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে-সব আলোচনা চলছে তাতে বিদ্যালয়ের জ্যামিতির কিছু ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং ইউক্লিডের এই স্বীকার্যটি কিভাবে গ্রহণ করতে হবে তা এখন বোঝা যায়। ইহা একটি নিছক অনুমান—কতকগুলি অভিজ্ঞতা থেকে এই অনুমানের সৃষ্টি।

একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ যে ২ সমকোণের সমান তা সমান্তরাল রেখার সাহায্য ছাড়াও বেশ প্রমাণ করা যায়। কারণ জানা আছে যে কোনও একটি শীর্ষবিন্দুতে দুইটি পাশাপাশি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ। সেজন্য তিনটি শীর্ষবিন্দুতে তিনটি বহিঃকোণ ও তিনটি অন্তঃ-কোণের সমষ্টি ৬ সমকোণ হবে।



এখন বহিঃকোণগুলি যোগ করলে ৪ সমকোণ হবে। কারণ একটি লোক যদি A বিন্দুতে দাঁড়িয়ে F বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকে এবং পরে বাঁদিকে ফিরে B বিন্দু পর্যন্ত যায়, তারপর B বিন্দু থেকে আবার বাঁয়ে ফিরে C বিন্দু পর্যন্ত যায় এবং C বিন্দু থেকে বাঁয়ে ঘুরে Fএর দিকে যায় তবে সে মোট মত কোণ ঘুরলো? সে ৪ সমকোণ ঘুরলো। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে বহিঃকোণগুলির সমষ্টি ৪ সমকোণ। সুতরাং অন্তঃকোণ কয়টির সমষ্টি হবে ২ সমকোণ। এই প্রমাণ শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে এবং এর জন্য কোনও সমান্তরাল রেখা টানার দরকার হয় না। এবং সেজন্য পাঠ্যসূচীতে অনেক আগেই এই উপপাদ্যটি রাখা যেতে পারে।

সুতরাং দেখা যায় যে, বর্তমানে জ্যামিতি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। এখনকার ধারণা যে ইউক্লিডের জ্যামিতি দ্বারা স্থানের মাপ ঠিকমত পাওয়া যায় না। তবে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে ইউক্লিডের জ্যামিতির কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। ইহা চিরকালই কাজে লেগেছে ও লাগবে। নূতন আবিষ্কারের ফলে শুধু এই বলা যায় যে এই জ্যামিতির গণ্ডি সীমাবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে এই গ্রীক্ জ্যামিতিই সর্বোৎকৃষ্ট জ্যামিতি। গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য সূক্ষ্ম ওষুধ মাপার নিক্তি থেকে মুদীর দাঁড়িপাল্লাই কাজে বেশী লাগে। ঐ সব নিক্তিতে অণু-পরমাণুই মাপা চলে, গার্হস্থ্য ব্যবহারে তা কোনও কাজে আসে না। আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ গণ্ডির জন্য ইউক্লিডের জ্যামিতিই শেখানো হবে। কিন্তু যদি সর্বাপেক্ষা দূরে যে নীহারিকা আছে তার অবস্থান জানতে চাওয়া যায়, তবে এই জ্যামিতিতে কাজ চলবে না। গ্রীক্ জ্যামিতির দোষ এই যে, তাঁরা 'সময়' জিনিসটির সম্বন্ধে মোটেই বিবেচনা করেন নি। এঁদের মতে সরল রেখা, কোণ বা কোনও চিত্র হচ্ছে অপরিবর্তনীয় স্থির, কিন্তু আমাদের মাপতে হচ্ছে একটি পরিবর্তনশীল পৃথিবী। সুতরাং অপরিবর্তনীয় স্থির চিত্রের সাহায্যে যদি পরিবর্তনশীল জগৎ মাপা যায় তবে অনেক ফাঁক থেকে যাবে সন্দেহ নেই।

কোনও জিনিসই এমন কঠিন হতে পারে না যে সব সময় একই রকম কঠিন থাকবেই। পৃথিবী যত ঠাণ্ডা হচ্ছে দিন দিন তত ছোট হয়ে যাচ্ছে। বেশ কয়েক শতাব্দী গেলে পৃথিবী অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

ইউক্লিড সমান্তরাল সরল রেখার যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে সরল রেখাগুলি যত বাড়ানোই যাক্ না কেন, রেখাগুলি কখনও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে না। কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগে এমন কোন স্থান পাওয়া সম্ভব নয়, যেখানে যতদূর ইচ্ছা রেখা টানলে রেখাগুলি সরল থাকে। সাধারণতঃ একটি ক্ষুদ্র পরিসরের উপর রেখা টানা হয় এবং মনে করা হয় যেন পৃথিবীর উপরিস্থিত স্থান সমতল। বর্তমানে জ্যোতিবিদ্যা আমাদের বলে দেয় যে ইউক্লিডের সংজ্ঞা অনুসারে যে রেখা সমান্তরাল রেখা হিসাবে টানা হয়, সেইরূপ রেখার সাহায্যে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী তারা পর্যন্ত পৌছানো সম্ভব নয়।

জ্যামিতিতে সূত্র

জ্যামিতির বই খুললেই দেখা যায় কতকগুলি সূত্র দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। বিন্দু, রেখা, তল, ঘন, কোণ, বৃত্ত ইত্যাদির সূত্র বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে আর শিক্ষার্থীরা এই সূত্রগুলিকে মুখস্থ করতে চেষ্টা করে। যেমন বিন্দুর সূত্র হচ্ছে যার অবস্থিতি আছে কিন্তু কোনও আয়তন নেই তাকে বিন্দু বলে। রেখার সূত্র হচ্ছে যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নেই তাকে রেখা বলে। আবার যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে কিন্তু বেধ নেই তাকে তল বলে।

এই যে সব সূত্র যার দ্বারা এই শব্দগুলির অর্থ ও প্রকৃতি বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে এই সূত্রগুলি বোঝা কি সত্যিকারের এই শব্দগুলি থেকে কঠিন নয়? যার অর্থ বোঝানো হচ্ছে সেই অর্থ যদি তার থেকে সহজ কোনও শব্দ বা ভাষা দ্বারা না বোঝাতে পারা যায় তবে এইরূপ বোঝাবার বা এইরূপ লিখবার প্রয়োজন কি? 'যে রেখা সর্বদা একই দিকে চলে তাকে সরল রেখা বলে'—এই একই দিক কথাটি বোঝা কি সরল রেখা শব্দটি থেকে সহজ?

কোণের সূত্র দেওয়া হয়—'দুইটি সরল রেখা এক বিন্দুতে মিলিত হলে রেখা দুইটির মধ্যের অবনতিকে কোণ বলে।' রেখা দুইটির মধ্যের অবনতি বোঝা সহজ নয়। সুতরাং কোনও রকম সূত্র দেওয়ার চেষ্টা না করে জিনিসটি নানা ভাবে বুঝিয়ে দিলেই ভাল হয়। নানা ভাবে চিত্র এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে কোণ কাকে বলে। এই যে কতকগুলি ধরাবাঁধা সূত্র মুখস্থ করা এতে যে জ্ঞানের

অথবা $DB = = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}AC = EC$

$AD = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}BC = FC$

তারপরেই DF, EF ও ED যোগ করে যখন DEF ত্রিভুজটি পাবে তখনই সে দেখবে যে DEF ত্রিভুজটি সমবাহু ত্রিভুজ প্রমাণ করতে হলে তার প্রমাণ করতে হবে DF=FE=ED। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হবে DF, EF দুইটি বাহু সমান দেখাতে হলে দুইটি ত্রিভুজ সমান দেখানো দরকার যে দুইটি ত্রিভুজের DF, EF দুইটি বাহু। আঁকবার সময় সে যে যে বিষয় লক্ষ্য করেছে সে দেখবে তাই দিয়েই সহজেই প্রমাণ হয়ে যাবে, কারণ DBF ও EFC ত্রিভুজে—

$$DB = EC$$
$$BF = FC$$
$$\angle DBF = \angle ECF \text{ (প্রত্যেকটি } 60^\circ \text{)}$$

সুতরাং ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম ও DF=EF এইভাবে অগ্রসর হলে আঁকবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থী সমাধান খুঁজে বার করবে।

জ্যামিতিতে কতকগুলি বিষয়ের ভিতর পরস্পর সংযোগ (association) রয়েছে। যেমন সমকোণ বললে মনে হয় সরল কোণ, ত্রিভুজ বা বহুভুজের কোণের সমষ্টি ; পীথাগোরাসের উপপাদ্য, ক্ষুদ্রতম দূরত্ব ; বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ, বৃত্তের স্পর্শক, বৃত্তের কেন্দ্রের সঙ্গে জ্যার মধ্যবিন্দু সংযোগকারী রেখা ইত্যাদির কথা।

আবার দুইটি বাহু সমান প্রমাণ করার কথা হলেই মনে আসে সর্বসম ত্রিভুজ ; ত্রিভুজের সমান কোণের বিপরীত বাহু, সামান্তরিকের বিপরীত বাহু ; সামান্তরিকের কর্ণের অর্ধেক ; কেন্দ্র থেকে সমান দূরের জ্যা, বহিঃস্থ কোনও বিন্দু থেকে দুইটি স্পর্শক ইত্যাদির কথা।

সেই রকম যদি দুইটি কোণ সমান দেখাবার প্রশ্ন আসে অথবা দুইটি রেখা সমান্তরাল কিনা তা প্রমাণের প্রশ্ন আসে তবেই এদের সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় মনে থাকে।

দুইটি ত্রিভুজ সর্বসম কখন হয় তা শিক্ষার্থীর কণ্ঠস্থ থাকা দরকার। সেজন্য সংক্ষেপে এইভাবে চর্চা মাঝে মাঝে করতে পারে—

বাহু, অন্তর্ভূত কোণ, বাহু	বা, কো, বা
বাহু, বাহু, বাহু	বা, বা, বা
কোণ, কোণ, বাহু	কো, কো, বা
সমকোণ, অতিভুজ, বাহু	সম, অতি, বা

সমান্তরাল রেখার জন্য মনে রাখতে হবে একান্তর কোণ, অনুরূপ কোণ, ও ভেদকের একই পার্শ্বে স্থিত দুই অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি।

যদি কোনও চিত্র আঁকতে হয় এবং আঁকবার জন্য কতকগুলি শর্ত দেওয়া থাকে, তবে বিনা যন্ত্রপাতিতে খালি হাতে প্রথমে এঁকে, তার থেকে কি কি তথ্য পাওয়া যায় তা বার করবার চেষ্টা শিক্ষার্থী করতে পারে। কি রকম আকার, কি মাপের চিত্র হবে এই সব সম্বন্ধে একটা ধারণা এইভাবে সে পাবে। তার পর খালি হাতে যে চিত্রটি এঁকেছে সেই চিত্রটি দেখে ঠিক করবে কোথায় আরম্ভ করবে, কিভাবে অগ্রসর হবে ইত্যাদি। যেমন নাকি একটি সামান্তরিক ABCD যদি আঁকতে হয় যার AB বাহু DC বাহুর সঙ্গে সমান্তরাল আর A ও B কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে যে রেখা দুইটি তারা DC রেখায় এক বিন্দুতে মিলিত হয় তবে চিত্রটি আঁকতে হলে আগেই একটি সামান্তরিক ABCD যদি আঁকা যায় তারপর ∠A ও ∠Bর সমদ্বিখণ্ডক দুইটি আঁকলে হয়তো তারা এক বিন্দুতে মিললেও CD রেখায় মিলবে না। সেজন্য AD, BC দুইটি সমান্তারাল রেখা আগে এঁকে, AB যোগ করে পরে যদি ∠A ও ∠B কে সমদ্বিখণ্ডিত করা যায় ও পরে এই সমদ্বিখণ্ডক দুইটি যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেই বিন্দু দিয়ে যদি AB রেখার সঙ্গে সমান্তরাল কোনও রেখা টানা যায় তবেই নির্দিষ্ট সামান্তরিকটি পাওয়া যায়।

জ্যামিতিতে সমস্যা সমাধানের উপর যথেষ্ট জোর দিতে হবে। কয়েকটি কঠিন সমস্যা সমাধান করার চেয়ে বেশীসংখ্যক সহজ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। জ্যামিতিতে নানাবিধ চিত্রের অঙ্কন খুবই প্রয়োজন। এই অঙ্কনের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার। অনেক জায়গায় এই অঙ্কনের জন্য ত্রিকোণী ব্যবহার করা যায়। একটি সরল রেখার উপর একটি লম্ব টানতে অথবা একটি সরল রেখার সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে

ত্রিকোণীর সাহায্যেই পারা যায়। কিন্তু একটি রেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করা বা একটি কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে হলে তখন মাপনী বা চাঁদার সাহায্যে করা ঠিক নয়। মাপনী ও কম্পাসের সাহায্যে করলে মাপ ঠিক হতে পারে। তবে অবশ্য জায়গা বুঝে, যেমন একটি ৪″ রেখা এঁকে যদি তার মধ্যবিন্দু বার করতে হয় তবে তখন মাপনী ও কম্পাস না নিয়ে মাপনীর এক প্রান্ত থেকে ২″ দূরে একটি বিন্দু মেপে বার করলেই মধ্যবিন্দু পাওয়া যাবে।

যেখানে নাকি একটি রেখাকে কতকগুলি সমান অংশে ভাগ করার প্রশ্ন আসে সেখানে যে সমান্তরালগুলি টানা দরকার সেগুলি ত্রিকোণী দিয়ে টানা যেতে পারে।

নানা রকমারি অঙ্কন শিক্ষার্থীদের দিয়ে করানো দরকার। একই ভূমির উপর অবস্থিত ও একই সমান্তরাল সরল রেখার মধ্যে অবস্থিত ত্রিভুজসমূহ যে সমান হয় সে ধারণা শিক্ষার্থীকে দিতে হলে নানাবিধ অঙ্কনের—যথা একটি চতুর্ভুজের সমান করে একটি ত্রিভুজ আঁকা, একটি পঞ্চভুজের সমান করে একটি চতুর্ভুজ আঁকা ইত্যাদি অভ্যাস করানো দরকার। এতে শিক্ষার্থীরা দেখবে কেমন করে কোনও রেখার সঙ্গে সমান্তরাল টানলে তবে একটি চতুর্ভুজের সঙ্গে সমান করে একটি ত্রিভুজ আঁকা যায় অথবা একটি পঞ্চভুজের সমান করে একটি চতুর্ভুজ আঁকা যায়। এই রকম নানাবিধ অঙ্কনের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থী যুক্তির ধারা ধীরে ধীরে বুঝে নেবে।

একটি ত্রিভুজের একটি বাহুর এক বিন্দু দিয়ে একটি রেখা টেনে একটি ত্রিভুজকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা, একটি চতুর্ভুজের একটি কৌণিক বিন্দু দিয়ে একটি রেখা টেনে একটি চতুর্ভুজকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা, একটি সরল রেখার উপর একটি সামন্তরিকের সমান করে আর একটি সামান্তরিক আঁকা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জ্যামিতির যুক্তিগুলি তারা সহজেই বুঝবে।

তারপর আসবে নানাবিধ বৃত্ত অঙ্কন। একটি ত্রিভুজের পরিবৃত্ত, অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত অঙ্কন। বিভিন্ন আকারের ত্রিভুজ নিয়ে যদি এরকম বৃত্ত আঁকার চর্চা করা যায় তবে শিক্ষার্থীর 'সর্বসম ত্রিভুজ' বা 'সঞ্চারপথ' ও সর্বসম ত্রিভুজের সম্বন্ধ এবং এদের ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আরও দৃঢ় হবে।

তারপর আসে স্পর্শক আঁকার কথা। একটি ত্রিকোণীর সাহায্যে সহজেই বৃত্তের পরিধির কোনও বিন্দুতে স্পর্শক টানা যায়। কিন্তু বৃত্তের বহিঃস্থ

কোনও বিন্দু থেকে একটি বৃত্তে স্পর্শক টানতে হলে তখন ত্রিকোণীর সাহায্যে চলে না, বরং মাপনী বসিয়ে দুইটি বৃত্তকে স্পর্শ করে এরূপ ভাবে রেখা টানা চলে। বহিঃস্থ কোনও বিন্দু থেকে একটি বৃত্তে স্পর্শক টানতে হলে অর্ধবৃত্ত এঁকে স্পর্শক টানাই সবচেয়ে সহজ নিয়ম।

সম্পাদ্য বা উপপাদ্য প্রমাণের জন্য যেসব অঙ্কনের কাজ করতে হয় সেইগুলি কেন করতে হয় তা যদি প্রথমে বিশ্লেষণ করে নেওয়া যায় তবে শিক্ষার্থী অঙ্কনের প্রত্যেকটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। এই ভাবে অভ্যাস করলে পরে নূতন সমস্যা (rider) সমাধান করা ও তার জন্য অঙ্কনের কাজ করা তাদের পক্ষে সহজই হয়ে উঠবে।

এখন কথা হচ্ছে যে উপ .াদ্যগুলির প্রমাণ অথবা সমস্যা সমাধান এই দুই-এর ভিতর কিসের উপর বেশী জোর দেওয়া দরকার? এ সম্বন্ধে সনাতনপন্থী-দের মত হচ্ছে যে উপপাদ্যগুলির প্রমাণ শেখাই বেশী আবশ্যকীয়। সমস্যা (rider) সমাধান বিলাসিতা-বিশেষ। কারণ উপপাদ্য না জানা থাকলে সেই সম্পর্কে সমস্যা সমাধানের প্রশ্নই অবান্তর। যারা নিতান্ত কাঁচা তাদের পক্ষে উপপাদ্যের প্রমাণ শেখা সম্ভব কিন্তু সমস্যা সমাধান অসম্ভব। সেজন্য পরীক্ষা পাসের জন্য উপপাদ্যের প্রমাণই শেখা তাদের পক্ষে শ্রেয়।

অনেকে আছেন যাঁরা এর বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করেন। তাঁদের মতে যারা সত্যিকারের ভাল তারাই বইএর লেখা উপপাদ্য শিখবে এবং যারা কাঁচা তারা সমস্যা সমাধানের উপরই বেশী মনোযোগ দেবে।

উপপাদ্যগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কারণ এই হাতিয়ার নিয়েই শিক্ষার্থীরা কাজ করবে। কিন্তু প্রথমেই এই উপপাদ্যগুলির বিশদ ভাবে প্রমাণ ইত্যাদির কোনও প্রয়োজন হয় না। শুধু উপপাদ্যগুলির বিষয়-বস্তু জানা থাকলেই এবং তা প্রয়োগ করতে পারলেই যথেষ্ট হয়। শ্রেণীতে উপপাদ্যগুলি বোর্ডে এঁকে শিক্ষার্থীদের সাহায্যে প্রমাণ করা হবে। কিন্তু সেই প্রমাণগুলি পুনরুক্তি করবার জন্য পুনঃ পুনঃ চর্চার চেষ্টায় সময় অযথা নষ্ট করা সমীচীন নয়।

শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান দিয়ে নিযুক্ত রাখার অর্থ নয় যে বোর্ডে শিক্ষক সারা ঘণ্টা ধরে শুধু সমস্যা সমাধান করে যাবেন। বীজগণিত ও অঙ্কে শিক্ষার্থীরা যেমন অঙ্কের পর অঙ্ক নিজে নিজে কষে যায়, জ্যামিতিতেও শিক্ষার্থী